www.banglabookpdf.blogspot.com

# তাফহীমুল কুরআন

PART- 08

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com



# মার্‌য়াম

## ১৯

### নামকরণ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ আয়াত থেকে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সূরা যার মধ্যে হযরত মার্‌য়ামের কথা বলা হয়েছে।

### নাযিলের সময়-কাল

হাবশায় হিজরাতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলিম মুহাজিরদেরকে যখন হাবশার শাসক নাজ্জাশীর দরবারে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরাটি তেলাওয়াত করেন।

### ঐতিহাসিক পটভূমি

যে যুগে এ সূরাটি নাযিল হয় সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে সূরা কাহফের ভূমিকায় আমি কিছুটা ইংগিত করেছি। কিন্তু এ সূরাটি এবং এ যুগের অন্যান্য সূরাগুলো বুঝার জন্য এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইংগিত যথেষ্ট নয়। তাই আমি সে সময়ের অবস্থা একটু বেশী বিস্তারিত আকারে তুলে ধরছি।

কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে এবং ভয়-ভীতি ও মিথ্যা অপবাদের ব্যাপক প্রচার করে ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারলো না তখন তারা জুলুম-নিপীড়ন, মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতে থাকলো। তাদেরকে বন্দী করে, তাদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে, তাদেরকে অনাহারে রেখে এমনকি কঠোর শারীরিক নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকলো। এ নির্যাতনে ভয়ংকরভাবে পিষ্ট হলো বিশেষ করে গরীব লোকেরা এবং দাস ও দাসত্বের বন্ধনমুক্ত ভৃত্যরা। এসব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম কুরাইশদের আশ্রিত ও অধীনস্থ ছিল। যেমন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমের ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উম্মে 'উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিন্নীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পিতামাতা প্রমুখ সাহাবীগণ। এদেরকে মেরে মেরে আধমরা করা হলো। কক্ষে আবদ্ধ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হলো। মক্কার প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর তাদেরকে শুইয়ে দেয়া হতে থাকলো। বুকের ওপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা অবস্থায় সেখানে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতরাতে থাকলো। যারা

www.banglabookpdf.blogspot.com



পেশাজীবী ছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যাপারে পেরেশান করা হতে থাকলো। বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইবনে ওয়ায়েল আমার থেকে কাজ করিয়ে নিল। তারপর যখন আমি তার কাছে মুজরী আনতে গেলাম, সে বললো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করবে না ততক্ষণ আমি তোমার মুজরী দেবো না।"

এভাবে যারা ব্যবসা করতো তাদের ব্যবসা নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হতো। যারা সমাজে কিছু মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে সর্বপ্রকারে অপমানিত ও হেয় করা হতো। এ যুগের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রসূল ! এখন তো জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না ?" একথা শুনে তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদের ওপর এর চেয়ে বেশী জুলুম নিপীড়ন হয়েছে। তাদের হাড়ের ওপর লোহার চিরুনী চালানো হতো। তাদেরকে মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। তারপরও তারা নিজেদের দীন ত্যাগ করতো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এ কাজটি সম্পন্ন করে ছাড়বেন, এমনকি এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"—বুখারী

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন ৪৫ হস্তী বর্ষে (৫ নববী সন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ -

"তোমরা হাবশায় চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজ্যে কারো প্রতি জুলুম হয় না। সেটি কল্যাণের দেশ। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দূর করে দেন ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করবে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যের পর প্রথমে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশদের লোকেরা সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শু'আইবা বন্দরে তাঁরা যথাসময়ে হাবশায় যাওয়ার নৌকা পেয়ে যান। এভাবে তারা গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর কয়েক মাস পরে আরো কিছু লোক হিজরত করেন। এভাবে ৮৩জন পুরুষ, ১১জন মহিলা ও ৭জন অ-কুরাইশী মুসলমান হাবশায় একত্র হয়ে যায়। এ সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ৪০জন মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কারণ কুরাইশদের ছোট বড় পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কোনো পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন এ মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিল না। কারোর ছেলে, কারোর জামাতা, কারোর মেয়ে, কারোর ভাই এবং কারোর বোন এ দলে ছিল। এ দলে ছিল আবু জেহেলের ভাই সালামাহ ইবনে হিশাম, তার চাচাত ভাই হিশাম ইবনে আবী হুযাইফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আহ এবং তার চাচাত বোন হযরত উম্মে সালামাহ, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ, উত্‌বার ছেলে ও কলিজা ভক্ষণকারিণী হিন্দার সহোদর ভাই আবু হুযাইফা এবং সোহাইল ইবনে আমেরের মেয়ে সাহ্‌লাহ। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও ইসলামের সুপরিচিত শত্রুদের ছেলে মেয়েরা ইসলামের জন্য স্বগৃহ ও আত্মীয় স্বজনদের ত্যাগ করে বিদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। তাই এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গৃহও ছিল না। এ ঘটনার ফলে অনেক লোকের ইসলাম বৈরিতা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। আবার অনেককে এ ঘটনা এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম বৈরিতার ওপর এ ঘটনাটিই প্রথম আঘাত হানে। তাঁর একজন নিকটাত্মীয় লাইলা বিনতে হাশ্‌মাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হিজরত করার জন্য নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম এবং আমার স্বামী আমের ইবনে রাবী'আহ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় উমর এলেন এবং দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "আবদুল্লাহর মা! চলে যাচ্ছো ?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছো। আল্লাহর পৃথিবী চারদিকে উন্মুক্ত, এখন আমরা এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তি ও স্থিরতা দান করবেন।" একথা শুনে উমরের চেহারায় এমন কান্নার ভাব ফুটে উঠলো, যা আমি তার মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি কেবল এতটুকু বলেই চলে গেলেন যে, "আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

হিজরতের পরে কুরাইশ সরদাররা এক জোট হয়ে পরামর্শ করতে বসলো। তারা স্থির করলো, আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ (আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই) এবং আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠাতে হবে। এরা সেখানে গিয়ে এ মুসলমান মুহাজিদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার জন্য হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীকে সম্মত করাবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নিজেই হাবশার মুহাজিরদের দলভুক্ত ছিলেন) এ ঘটনাটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কুরাইশদের এ দু'জন কূটনীতি বিশারদ দূত হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় পৌঁছে গেলো। প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদদের মধ্যে ব্যাপকহারে উপঢৌকন বিতরণ করলো। তাদেরকে এ মর্মে রাযী করালো যে, তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে মহামূল্যবান নযরানা পেশ করার পর বললো, "আমাদের শহরের কয়েকজন অবিবেচক ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে চলে এসেছে। জাতির প্রধানগণ তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাবার জন্য আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এ ছেলেগুলো আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে এবং এরা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি বরং তারা একটি অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে।" তাদের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরবারের চারদিক থেকে একযোগে আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো,

www.banglabookpdf.blogspot.com



"এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে এদের জাতির লোকেরাই ভালো জানে। এদেরকে এখানে রাখা ঠিক নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, "এভাবে এদেরকে আমি ওদের হাতে সোপর্দ করে দেবো না। যারা অন্যদেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থাস্থাপন করেছে এবং এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি এদেরকে ডেকে এ মর্মে অনুসন্ধান করবো যে, ওরা এদের ব্যাপারে যা কিছু বলছে সে ব্যাপারে আসল সত্য ঘটনা কি!" অতপর নাজ্জাশী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর বার্তা পেয়ে মুহাজিরগণ একত্র হলেন। বাদশাহর সামনে কি বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে তারা পরামর্শ করলেন। শেষে সবাই একজোট হয়ে ফায়সালা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই হুবহু কোনো প্রকার কমবেশী না করে তাঁর সামনে পেশ করবো, তাতে নাজ্জাশী আমাদের থাকতে দেন বা বের করে দেন তার পরোয়া করা হবে না। দরবারে পৌঁছার সাথে সাথেই নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এটা কি করলে, নিজেদের জাতির ধর্মও ত্যাগ করলে আবার আমার ধর্মেও প্রবেশ করলে না, অন্যদিকে দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না ?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি প্রথমে আরবীয় জাহেলিয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দুষ্কৃতির বর্ণনা দেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি কি শিক্ষা দিয়ে চলেছেন তা ব্যক্ত করেন। তারপর কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণকারীদের ওপর যেসব জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো বর্ণনা করেন এবং সবশেষে একথা বলে নিজের বক্তব্যের উপসংহার টানেন যে, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো জুলুম হবে না এ আশায় আমরা অন্য দেশের পরিবর্তে আপনার দেশে এসেছি।" নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর ওপর যে কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী করছো তা একটু আমাকে শুনাও তো দেখি। জবাবে হযরত জাফর সূরা মারয়ামের গোড়ার দিকের হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু শুনালেন। নাজ্জাশী তা শুনছিলেন এবং কেঁদে চলছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। যখন হযরত জাফর তেলাওয়াত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, "নিশ্চিতভাবেই এ কালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যা কিছু এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে ওদের হাতে তুলে দেবো না।"

পরদিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললো, "ওদেরকে ডেকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ওরা কি আকীদা পোষণ করে ? তাঁর সম্পর্কে ওরা একটা মারাত্মক কথা বলে ? নাজ্জাশী আবার মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরের চালবাজীর কথা মুহাজিররা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তারা আবার একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে তার কি জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। এজন্য সবাই পেরেশান ছিলেন। কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এ

www.banglabookpdf.blogspot.com



ফায়সালাই করলেন যে, যা হয় হোক, আমরা তো সেই কথাই বলবো যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়েছেন। কাজেই যখন তারা দরবারে গেলেন এবং নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাদের সামনে রাখলেন তখন জাফর ইবনে আবু তালেব উঠে দাঁড়িয়ে নির্দ্ধিধায় বললেন ঃ

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَرُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُوْلِ

"তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী মার্‌য়ামের নিকট পাঠান।"

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বললে, হযরত ঈসা তার থেকে এ তৃণখণ্ডের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন না।" এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের পাঠানো সমস্ত উপঢৌকন এই বলে ফেরত দিয়ে দিলেন যে, "আমি ঘুষ নিই না এবং মুহাজিরদেরকে বলে দিলেন, তোমরা পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাকো।"

**আলোচ্য বিষয় ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু**

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন আমরা এ সূরাটি দেখি তখন এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে আসে সেটি হচ্ছে এই যে, যদিও মুসলমানরা একটি মযলুম শরণার্থী দল হিসেবে নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল তবু এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম আপোস করার শিক্ষা দেননি। বরং চলার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরাটি তাদের সাথে দেন, যাতে ঈসায়ীদের দেশে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের একেবারে সঠিক মর্যাদা তুলে ধরেন এবং তাঁর আল্লাহর পুত্র হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

প্রথম দু' রুকূ'তে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনাবার পর আবার তৃতীয় রুকূ'তে সমকালীন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী শুনানো হয়েছে। কারণ এ একই ধরনের অবস্থায় তিনিও নিজের পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আজ হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীমের পর্যায়ে রয়েছে এবং তোমরা রয়েছো সেই জালেমদের পর্যায়ে যারা তোমাদের পিতা ও নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে গৃহত্যাগী করেছিল। অন্যদিকে মুহাজিরদের এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন স্বদেশ ত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি বরং আরো অধিকতর মর্যাদাশালী হয়েছিলেন তেমনি শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর চতুর্থ রুকূ'তে অন্যান্য নবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের বার্তা বহন করে এনেছেন সকল নবীই সেই একই দীনের বার্তাবহ ছিলেন। কিন্তু নবীদের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতগণ বিকৃতির শিকার হতে থেকেছে। আজ বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে যেসব গোমরাহী দেখা যাচ্ছে এগুলো সে বিকৃতিরই ফসল।

www.banglabookpdf.blogspot.com



শেষ দু' রুকূ'তে মক্কার কাফেরদের ভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং কথা শেষ করতে গিয়ে মু'মিনদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সত্যের শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের প্রিয়ভাজন হবেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com



كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧

*কা-ফ্ হা-ইয়া—আই-ন্ সা-দ। এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ,[১] যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার[২] প্রতি করেছিলেন, যখন সে চুপে চুপে নিজের রবকে ডাকলো।*

*সে বললো, "হে আমার রব! আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; হে পরওয়ারদিগার ! আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি। আমি আমার পর নিজের স্বজন-স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি[৩] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তথাপি) তুমি নিজের বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে।[৪] আর হে পরোয়ারদিগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষে পরিণত করো।"*

*(জবাব দেয়া হলো) "হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে কোনো লোক আমি এর আগে সৃষ্টি করিনি।"[৫]*

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

*সে বললো, "হে আমার রব ! আমার ছেলে হবে কেমন করে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেছি ?"*

*জবাব এলো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র, এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"*[৬]

*যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব ! আমার জন্য নিদর্শন স্থির করে দাও।*

*বললেন, "তোমার জন্য নিদর্শন হচ্ছে, তুমি পরপর তিনদিন লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"*

*কাজেই সে মিহ্‌রাব*[৭] *থেকে বের হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের সামনে এলো এবং ইশারায় তাদেরকে সকাল-সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিল।*[৮]

১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আলে ইমরানের ৪ রুকূ' সামনে রাখুন। সেখানে এ ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, ২৪৬-২৫০ পৃষ্ঠা)

২. এখানে যে হযরত যাকারিয়ার কথা আলোচনা করা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত হারুনের বংশধর। তাঁর মর্যাদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বনী ইসরাঈলের যাজক ব্যবস্থা (Priesthood) সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। ফিলিস্তিন দখল করার পর বনী ইসরাঈল দেশের শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করেছিল যার ফলে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের ১২টি গোত্রের মধ্যে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ১৩তম গোত্রটি (অর্থাৎ লাভী ইবনে ইয়াকুবের গোত্র) ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আবার বনী লাভীর মধ্যেও যে পরিবারটি বাইতুল মাকদিসে খোদাবন্দের সামনে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন এবং পবিত্রতম জিনিসসমূহের পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ করতো তারা ছিল হযরত হারুনের বংশধর। বনী লাভীর অন্যান্য

www.banglabookpdf.blogspot.com



লোকেরা বাইতুল মাকদিসের মধ্যে যেতে পারতো না বরং আল্লাহর গৃহের পরিচর্যার সময় আঙ্গিনায় ও বিভিন্ন কক্ষে কাজ করতো। শনিবার ও ঈদের সময় কুরবানী করতো এবং বাইতুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বনী হারুনকে সাহায্য করতো।

বনী হারুনের চব্বিশটি শাখা ছিল। তারা পালাক্রমে বাইতুল মাকদিসের সেবায় হাযির হতো। এই শাখাগুলোর মধ্যে একটি ছিল আবৃইয়াহর শাখা। এর সরদার ছিলেন হযরত যাকারিয়া। নিজের গোত্রের পালার দিন তিনিই মাকদিসে যেতেন এবং আল্লাহর সমীপে ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন করতেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাইবেলের বংশাবলী-১ পুস্তক ২৩ ও ২৪ অধ্যায়)

৩. এর অর্থ হচ্ছে, আবৃইয়াহর পরিবারে আমার পরে এমন কাউকে দেখা যায় না, যে ব্যক্তি দীনি ও নৈতিক দিক দিয়ে আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তার যোগ্য হতে পারে। তারপর সামনের দিকে যে প্রজন্ম এগিয়ে আসছে তাদের চালচলন বিকৃত দেখা যাচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই।

৫. এ ক্ষেত্রে লূকের সুসমাচারে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে : "আপনার গোষ্ঠীতে তো এ নামের কোনো লোক নেই।" (১ : ৬১)

৬. হযরত যাকারিয়ার এই প্রশ্ন এবং ফেরেশতাদের জবাব সামনে রাখুন। কারণ সামনের দিকে হযরত মারয়ামের কাহিনীতে এ বিষয়বস্তু আবার আসছে এবং এখানে এর যে অর্থ সেখানেও সেই একই অর্থ হওয়া উচিত। হযরত যাকারিয়া বলেন, আমি একজন বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আমার ছেলে হতে পারে কেমন করে ! ফেরেশতারা জবাব দেন, "এমনিই হবে।" অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। তারপর ফেরেশেতা আল্লাহর কুদরাতের বরাত দিয়ে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমার মত খুনখুনে বুড়োর ঔরসে আজীবন বন্ধ্যা এক বৃদ্ধার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়া তাঁর কুদরাতের অসাধ্য নয়।

৭. মিহরাবের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৬ টীকা।

৮. লূক লিখিত সুসমাচারে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এভাবে পাঠকের সামনে কুরআনের পাশাপাশি খৃস্টীয় বর্ণনাও রাখা যাবে এবং মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে থাকছে আমাদের বক্তব্য :

"যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৯ টীকা) অবিয়ের পালার মধ্যে সখরীয় (যাকারিয়া) নামক একজন যাজক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী হারোণ বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ (Elizabeth) তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলিতেন। তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা, ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল। একদা যখন সখরীয় (যাকারিয়া) নিজ পালার অনুক্রমে

www.banglabookpdf.blogspot.com



يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

*"হে ইয়াহ্‌ইয়া ! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।"[৯]*

*আমি তাকে শৈশবেই "হুকুম"[১০] দান করেছি এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা[১১] ও পবিত্রতা দান করেছি, আর সে ছিল খুবই আল্লাহভীরু এবং নিজের পিতামাতার অধিকার সচেতন, সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিলো না। শান্তি তার প্রতি যেদিন সে জন্ম লাভ করে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করে আর যেদিন তাকে জীবিত করে উঠানো হবে।[১২]*

ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় (যাকারিয়া) ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয় ভয় করিও না। কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, [বাইবেলের কোথাও হযরত সখরিয়ার (যাকারিয়ার) দোয়ার উল্লেখ নেই] তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন (অর্থাৎ ইয়াহ্‌ইয়া) রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, (এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য সূরা আলে ইমরানে سَيِّدًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না, (تَقِيًّا) আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে ; (وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। সে তাহার সম্মুখে এলিয়ের (ইলিয়াস আলাইহিস সালাম) আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে।

তখন সখরিয় (যাকারিয়া) দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব ? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল (জিব্রীল) ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এ সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না ; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস

www.banglabookpdf.blogspot.com



করিলে না। (এ বর্ণনাটি কুরআন থেকে ভিন্নতর। কুরআন একে নিদর্শন গণ্য করে এবং লূকের বর্ণনা একে বলে শাস্তি। তাছাড়া কুরআন কেবলমাত্র তিন দিন কথা না বলার কথা বলে এবং লূক বলেন, সেই সময় থেকে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হওয়া পর্যন্ত হযরত যাকারিয়া নীরব থাকেন)। আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল ; এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোনো দর্শন পাইয়াছেন আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সংকেত করিতে থাকিলেন এবং বোবা হইয়া রহিলেন।" (লূক ১ঃ ৫-২২)

৯. মাঝখানে এই বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি যে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্ম হয় এবং শৈশব থেকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এখন বলা হচ্ছে, যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁর ওপর কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে মাত্র একটি বাক্যে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাঈলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন।

১০. "হুকুম" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, ইজতিহাদ করার শক্তি, দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার ক্ষমতা।

১১. আসলে حَنَانًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মমতার প্রায় সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল।

১২. বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জীবনের যে ঘটনাবলী ছড়িয়ে আছে সেগুলো একত্র করে আমি এখানে তাঁর পূতপবিত্র জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরছি। এর সাহায্যে সূরা আলে ইমরান এবং এ সূরাটির সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিতগুলোর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।

লূকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) ছিলেন, হযরত ইসা (আ)-এর চেয়ে ৬ মাসের বড়। তাঁর মাতা হযরত ঈসা (আ)-এর মাতার নিকটাত্মীয়া ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি কার্যকরভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। যোহনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ট্রান্স জর্ডন এলাকায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন ঃ

"আমি প্রান্তরে এক জনের রব যে ঘোষণা করিতেছে তোমর প্রভূর সরল পথ ধর।" (যোহন ১ ঃ ২৩)

মার্কের বর্ণনা মতে তিনি লোকদের পাপের জন্য তাদের তাওবা করাতেন এবং তাওবাকারীদেরকে বাপ্তাইজ করতেন। অর্থাৎ তাওবা করার পর তাদেরকে গোসল করাতেন, যাতে আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যায়। ইয়াহুদিয়া (যিহূদা) ও জেরুসালেমের অধিকাংশ লোক তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হচ্ছিল। (মার্ক ১ ঃ ৪-৫) এজন্য তিনি বাপ্তাইজক ইয়াহ্‌ইয়া (Jhon the Baptist) নামে

www.banglabookpdf.blogspot.com



পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণভাবে বনী ইসরাঈল তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল। (মথি ২১ ঃ ২৬ ) ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি ছিল, "স্ত্রী লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই।" (মথি ১১ঃ ১১)

তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন, চর্মপটুকা কোমরে বাঁধতেন এবং তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বনমধু। (মথি ৩ ঃ ৪) এই ফকিরী জীবন যাপনের সাথে সাথে তিনি প্রচার করে বেড়াতেন ঃ "মন ফিরাও (অর্থাৎ তাওবা কর) কেননা, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল।" (মথি ৩ ঃ ২) অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের দওয়াতের সূচনা হতে যাচ্ছে। এ কারণে তাঁকে সাধারণত হযরত ঈসার (আ) 'আরহাস' বলা হতো। কুরআন মজীদেও তাঁর সম্পর্কে এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

"সে আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী" (আলে ইমরান ৩৯)

তিনি লোকদের নামায পড়ার ও রোযা রাখার উপদেশ দিতেন (মথি ৯ ঃ ১৪, লূক ৫ ঃ ৩৩, লূক ১১ঃ ১)

তিনি লোকদের বলতেন, "যাহার দুইটি আঙরাখা আছে, সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিউক ; আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে সেও তদ্রূপ করুক।" কর গ্রাহীরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো, গুরু আমরা কি করবো ? তাতে তিনি জবাব দেন, "তোমাদের জন্য যাহা নিরূপিত তাহার অধিক আদায় করিও না।" সৈনিকরা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ ? জবাব দেন, "কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, অন্যায় পূর্বক কিছু আদায়ও করিও না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও।" (লূক ৩ ঃ ১০-১৪) বনী ইসরাঈলদের বিপথগামী উলামা, ফরীশী ও সদ্দূকীরা তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হবার জন্য এলে তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, "হে সর্পের বংশেরা আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল ?...... আর ভাবিওনা যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার আব্রাহাম আমাদের পিতা, .... আর এখন গাছগুলোর মূলে কুড়াল লাগান আছে, অতএব যে কোনো গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।" (মথি ৩ ঃ ৭-১০)

তাঁর যুগের ইহুদী শাসনকর্তা হীরোদ এন্টিপাসের রাজ্যে তিনি সত্যের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই শাসনকর্তা ছিল আপাদমস্তক রোমীয় সভ্যতার প্রতিভূ। তারই কারণে সারা দেশে দুষ্কৃতি, নৈতিকতা বিরোধী ও আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ প্রসার লাভ করছিল। সে নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হিরোদিয়াসকে নিজের গৃহে রক্ষিতা রেখেছিল। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া এ জন্য হিরোদকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ অপরাধে হিরোদ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। তবুও সে তাঁকে একজন পবিত্রাত্মা ও সৎকর্মশীল মনে করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো এবং জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাবের কারণে তাঁকে ভয়ও করতো। কিন্তু হিরোদিয়াস মনে করতো, ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম জনগণের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা সঞ্চার করছেন তার ফলে জনগণের দৃষ্টিতে তার মতো মেয়েরা ঘৃণিত হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর

www.banglabookpdf.blogspot.com



২ রুকূ'

আর (হে মুহাম্মাদ!) এ কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো।[১৩] যখন সে নিজের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিল এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল।[১৪] এ অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে অর্থাৎ (ফেরেশতাকে) পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণ মানবিক কায়া নিয়ে হাযির হলো।

মারয়াম অকস্মাত বলে উঠলো, "তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো তাহলে আমি তোমার হাত থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি।"

সে বললো, "আমি তো তোমার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।"

মারয়াম বললো, "আমার পুত্র হবে কেমন করে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই ?"

ফেরেশতা বললো, "এমনটিই হবে, তোমার রব বলেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এজন্য করবো যে, এই ছেলেকে আমি লোকদের জন্য একটি নিদর্শন[১৫] ও নিজের পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহে পরিণত করবো এবং এ কাজটি হবেই।"

মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।[১৬]

www.banglabookpdf.blogspot.com



প্রাণ সংহারের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হিরোদের জন্ম বার্ষিকী উৎসবে সে তার কাংখিত সুযোগ পেয়ে যায়। উৎসবে তার মেয়ে মনোমুগ্ধকর নৃত্য প্রদর্শন করে হিরোদের চিত্ত জয় করে। হিরোদ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলে, কি পুরস্কার চাও বলো। মেয়ে তার ব্যভিচারী মাকে জিজ্ঞেস করে, কি চাইবো ? মা বলে, ইয়াহ্ইয়ার মস্তক চাও। তাই সে হিরোদের সামনে হাতজোড় করে বলে, জাহাঁপনা! আমাকে এখনি ইয়াহ্ইয়া বাপ্তাইজকের মাথা একটি থালায় করে আনিয়ে দিন। হিরোদ একথা শুনে বড়ই বিষণ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রিয়ার মেয়ের দাবী না মেনে উপায় ছিল না। সে তৎক্ষণাত কারাগার থেকে ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের মাথা কেটে আনালো এবং তা একটি থালায় রেখে নর্তকীকে নজরানা দিল।(মথি ১৪ ঃ ৩-১২, মার্ক ৬ ঃ ১৭-১৯ ও লূক ৩ ঃ ১৯-২০)

১৩. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৪২ ও ৫৫ টীকা এবং সূরা নিসা ১৯০-১৯১ টীকা দেখুন।

১৪. সূরা আলে ইমরানে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত মার্‌য়ামের মা তাঁর মানত অনুযায়ী তাঁকে বাইতুল মাকদিসে ইবাদাতের জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যাকারিয়া তাঁর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত মার্‌য়াম বাইতুল মাকদিসের একটি মিহ্‌রাবে ই'তিকাফ করছিলেন। এখন এখানে বলা হচ্ছে, যে মিহ্‌রাবটিতে হযরত মার্‌য়াম ই'তিকাফরত ছিলেন সেটি বাইতুল মাকদিসের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনি ই'তিকাফকারীদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজেকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। যারা বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্বাংশ অর্থে "নাসেরাহ" নিয়েছেন তারা ভুল করেছেন কারণ নাসেরাহ জেরুসালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত, পূর্বদিকে নয়।

১৫. ইতোপূর্বে ৬ টীকায় আমরা ইংগিত করেছি, হযরত মার্‌য়ামের বিস্ময়ের জবাবে ফেরেশতার "এমনটিই হবে" একথা বলার কোনোক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো মানুষ তোমাকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও তোমার ছেলে হবে। উপরে এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে হযরত যাকারিয়ার বিস্ময়ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেখানেও ফেরেশতা সেই একই জবাব দিয়েছে। একথা পরিষ্কার, সেখানে এ জবাবটির যে অর্থ এখানেও তাই। অনুরূপভাবে সূরা যারিয়াত ২৮-৩০ আয়াতে যখন ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্রের সুসংবাদ দেন এবং হযরত সারাহ বলেন, আমার মতো বুড়ী বন্ধ্যা মেয়েলোকের আবার ছেলে হবে কেমন করে ? তখন ফেরেশতা তাঁকে জবাব দেন, كَذٰلِكَ "এমনটি হবে।" একথা সুস্পষ্ট যে, এর অর্থ হচ্ছে, বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তাদের ছেলে হবেই। তাছাড়া যদি كَذٰلِكَ অর্থ এই নেয়া হয় যে, মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার ছেলে হবে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন সারা দুনিয়ার মেয়েদের ছেলে হয়, তাহলে তো পরবর্তী বাক্য দুটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একথা বলার কি প্রয়োজন থাকে যে, তোমার রব বলছেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ এবং আমি ছেলেটিকে একটি নিদর্শন করতে চাই ? নিদর্শন শব্দটি এখানে সুস্পষ্টভাবে মুজিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ বাক্যটি একথাই প্রকাশ করে যে, "এমনটি করা আমার জন্য বড়ই সহজ।" কাজেই এ উক্তির অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি এ

www.banglabookpdf.blogspot.com



فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

*তারপর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলে পৌঁছে দিল। সে বলতে থাকলো, "হায়! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।"[১৭] ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, "দুঃখ করো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তুমি এ গাছের কাণ্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে। তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও। তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারোর সাথে কথা বলবো না।[১৮]*

*তারপর সে এ শিশুটিকে নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, "হে মার্‌য়াম! তুমি তো মহা পাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন![১৯] না তোমার বাপ কোনো খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোনো ব্যভিচারিণী।"*

ছেলেটির সত্তাকে বনী ইসরাঈলের সামনে একটি মুজিযা হিসেবে পেশ করতে চাই। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তাকে কিভাবে বনী ইরাঈলের সামনে মু'জিযা হিসেবে পেশ করা হয় পরবর্তী বিবরণ নিজেই তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৬. দূরবর্তী স্থান মানে বাইতুল লাহম। ই'তিকাফ থেকে উঠে সেখানে যাওয়া হযরত মার্‌য়ামের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন গোত্রের মেয়ে, তিনি আবার বাইতুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য উৎসর্গীত

www.banglabookpdf.blogspot.com



হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর নীরবে নিজের ই'তিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে তাঁর সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তার শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।

১৭. এ শব্দগুলো থেকে হযরত মার্য়ামের সে সময়কার পেরেশানীও অনুমান করা যেতে পারে। পরিস্থিতির নাজুকতা সামনে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রসব বেদনার কষ্টজনিত কারণে তাঁর মুখ থেকে একথাগুলো বের হয়নি বরং আল্লাহ তাঁকে যে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন তাতে কিভাবে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবেন এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। গর্ভাবস্থাকে এ পর্যন্ত যে কোনো ভাবে গোপন করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এখন শিশুটিকে কোথায় নিয়ে যাবেন ? এ পরবর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, "দুঃখ করো না" মার্য়ামের বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলেছেন যে, তিনি কেন একথা বলেছিলেন। বিবাহিত মেয়ের প্রথম সন্তান জন্মের সময় সে যতই কষ্ট পাক না কেন তার মনে কখনো দুখ ও বেদনাবোধ জাগে না।

১৮. অর্থাৎ শিশুর ব্যাপারে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার জন্মের ব্যাপারে যে কেউ আপত্তি তুলবে তার জবাব দেবার দায়িত্ব এখন আমার। (উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মৌনতা অবলম্বনের রোযা রাখার রীতি ছিল) হযরত মার্য়ামের আসল পেরেশানী কি ছিল এ শব্দাবলীও তা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বিবাহিতা মেয়ের প্রথম সন্তান যদি দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেই জন্মলাভ করে তাহলে তার মৌন ব্রত অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেবে কেন ?

১৯. এ শব্দগুলোর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখানে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং এ কথা মনে করা যায় যে, হযরত মার্য়ামের হারুন নামে কোনো ভাই ছিল। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আরবী বাগধারা অনুযায়ী أُخْتَ هَارُوْنَ মানে হচ্ছে "হারুন পরিবারের মেয়ে।" কারণ আরবীতে এটি একটি প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি। যেমন মুদার গোত্রের লোককে يَا أَخَا مُضَرَ (হে মুদারের ভাই) এবং হামদান গোত্রের লোককে يَا أَخَا هَمَدَانَ (হে হামাদানের ভাই) বলে ডাকা হয়, প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই এ অর্থটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এই অর্থটিই দাবী করে। কারণ এ ঘটনার কারণে জাতির মধ্যে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাহ্যত জানা যায় না যে, হারুন নামের এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কুমারী বোন শিশু সন্তান কোলে নিয়ে চলে এসেছিল। বরং যে জিনিসটি বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে হযরত মারয়ামের চারদিকে সমবেত করে দিয়েছিল সেটি এ হতে পারতো যে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

*মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো।*

*লোকেরা বললো, "কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?*[২০]

*শিশু বলে উঠলো, "আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।*[২১]

*এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।*[২২]

বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন বংশের একটি মেয়েকে এ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও একটি মারফূ হাদীসের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা ও অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে সঠিক হতে পারে না তবুও মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযীতে এ হাদীসটি যে সব শব্দসহকারে উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এ অর্থ বের হয় না যে, এ শব্দগুলোর অর্থ অবশ্যই "হারুনের বোন"ই হবে। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নাজরানের খৃষ্টানরা হযরত মুগীরার সামনে আপত্তি উত্থাপন করে বলে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



কুরআনে হযরত মারয়ামকে হারুনের বোন বলা হয়েছে, অথচ হযরত হারুন তাঁর শত শত বছর আগে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। হযরত মুগীরা তাদের এ আপত্তির জবাব দিতে পারেননি এবং তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ ঘটনাটি বলেন। তাঁর কথা শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তুমি এ জবাব দাওনি কেন যে, বনী ইসরাঈলরা নবী ও সৎ লোকদের সাথে যুক্ত করে নিজেদের নাম রাখতো ?" নবীর (স) এ উক্তি থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই বক্তব্য পাওয়া যায় যে, লা জওয়াব হওয়ার চাইতে অন্তত এ জওয়াবটি দিয়ে আপত্তি দূর করা যেতে পারতো।

১৯(ক). যারা হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করে তাঁরা একথার কি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, হযরত মারয়ামকে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসতে দেখে তার জাতির লোকেরা তাঁকে এক নাগাড়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো কেন ?

২০. কুরআনের অর্থ বিকৃতকারীরা এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছে, "কালকের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?" অর্থাৎ তাদের মতে এ কথাবার্তা হয়েছিল হযরত ঈসার যৌবন কালে। তখন বনী ইসরাঈলের নেতৃ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরা বলেছিল, আমরা এ ছেলেটির সাথে কি কথা বলবো যে কালই আমাদের সামনে দোলনায় শুয়েছিল ? কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর আলোচনার প্রতি লক্ষ রেখে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি নিছক একটি বাজে ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র অলৌকিকতাকে এড়িয়ে চলার জন্য এ পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কিছু না হলেও এই জালেমরা অন্তত এতটুকু চিন্তা করতো যে, তারা যে বিষয়টির ওপর আপত্তি জানাতে এসেছিল তাতো শিশুর জন্মের সময়কার ব্যাপার, তার কৈশোর বা যৌবনকালের ব্যাপার নয়। তাছাড়া সূরা আলে ইমরানের ৪৬ এবং সূরা মায়েদার ১১০ আয়াত দুটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, হযরত ঈসা তাঁর যৌবনে নয় বরং মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন। প্রথম আয়াতে ফেরেশতা হযরত মারয়ামকে শিশু জন্মের সুসংবাদ দান করে বলছেন সে দোলনায় শায়িত অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং যৌবনে পদার্পণ করেও। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজেই হযরত ঈসাকে বলছেন, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলতে এবং যৌবনকালেও।

২০(ক). পিতামাতার হক আদায়কারী বলেননি, শুধুমাত্র মাতার হক আদায়কারী বলেছেন। একথাটিও হযরত ঈসার কোনো পিতা ছিল না একথাই প্রমাণ করে। আর কুরআনের সর্বত্র তাঁকে মারয়াম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে, এও এরি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২১. এটিই সেই নিদর্শন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মাধ্যমে যা বনী ইসরাঈলদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আগে তাদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে পেশ করতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, হারুন গোত্রের এমন এক মুত্তাকী, ধর্মনিষ্ঠ ও ইবাদাতগুজার মেয়েকে, যিনি বাইতুলমাকদিসে ই'তিকাফরত এবং হযরত যাকারিয়ার প্রশিক্ষণাধীন ছিলেন, তাঁর কুমারী

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

*আর (ঈসা বলেছিল) "আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।"[২৩] কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল[২৪] পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে। যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এ যালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। হে মুহাম্মাদ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং এ সবকিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[২৫]*

অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। এটা এ জন্য করলেন যে, যখন সে শিশু সন্তান কোলে করে নিয়ে আসবে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আকস্মিকভাবে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারপর এ কৌশল অবলম্বন করার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক যখন হযরত মারয়ামের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো তখন আল্লাহ্ এই নবজাত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলালেন, যাতে এ শিশু বড় হয়ে যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে তখন জাতির হাজার হাজার লোক এ মর্মে সাক্ষ দেয়ার জন্য উপস্থিত থাকে যে, এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা আল্লাহর একটি বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব দেখেছিল। এরপরও এ জাতি যখন তার নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তার আনুগত্য করার পরিবর্তে তাকে অপরাধী সাজিয়ে শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যা দুনিয়ার কোনো জাতিকে দেয়া হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল

www.banglabookpdf.blogspot.com



কুরআন, আলে ইমরান ৪৪ ও ৫৩, আন নিসা ২১২ ও ২১৩, আল আম্বিয়া ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এবং আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা)।

২২. এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করার যে আকীদা তারা অবলম্বন করছে তা মিথ্যা । যেভাবে একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মের কারণে তা তাঁকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্মও এমন কোনো জিনিস নয় যে জন্য তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করতে হবে। খৃষ্টানদের নিজেদের বর্ণনাসমূহেও একথা রয়েছে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা উভয়েই এক এক ধরনের মু'জিযার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিলেন। লূক লিখিত সুসমাচারে কুরআনের মতো এ উভয়বিধ মু'জিযার উল্লেখ একই বর্ণনা পরম্পরায় করা হয়েছে। কিন্তু এটি খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি যে, তারা একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা বলে এবং অন্য একটি মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিকে বলে আল্লাহর পুত্র।

২৩. এখানে খৃষ্টানদেরকে জানানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। এখন তোমরা যে তাঁকে বান্দার পরিবর্তে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছো এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে ইবাদাতে শরীক করছো এসব তোমাদের নিজেদের উদ্ভট আবিষ্কার। তোমাদের নেতা কখনোই তোমাদের একথা শেখাননি। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৬৮, মায়েদাহ ১০০, ১০১ ও ১৩০ এবং আয যুখরুফ ৫৭ ও ৫৮ টীকা)

২৪. অর্থাৎ খৃষ্টানদের দল।

২৫. খৃষ্টানদের শুনাবার জন্য যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছিল তা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভাষণের মাহাত্ম্য একমাত্র তখনই অনুধাবন করা যেতে পারে যখন এ সূরার ভূমিকায় আমি যে ঐতিহাসিক পটভূমির অবতারণা করেছি তা পাঠকের দৃষ্টি সমক্ষে থাকবে। এ ভাষণ এমন এক সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মক্কার মজলুম মুসলমানরা একটি ঈসায়ী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল। তখন এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সেখানে যখন ঈসা সম্পর্কে ইসলামী আকীদার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখন এই "সরকারী" বিজ্ঞপ্তি ঈসায়ীদেরকে শুনিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম যে সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কোনো অবস্থায়ও তোষামোদী নীতি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেনি, এর সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? তারপর যেসব সাচ্চা মুসলমান হাবশায় হিজরত করে গিয়েছিলেন তাদের ঈমানী শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। তারা রাজদরবারে এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এ বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়েছিলেন যখন নাজ্জাশীর দরবারে সভাসদরা উৎকোচ গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তখন পূর্ণ আশংকা ছিল, খৃষ্টবাদের বুনিয়াদী আকীদার ওপর ইসলামের এ নিরপেক্ষ আলোচনা শুনে নাজ্জাশীও বিরূপ হয়ে উঠবেন এবং এই মজলুম মুসলমানদেরকে কুরাইশ কসাইদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সত্য কথা বলতে একটুও ইতস্তত করেননি।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿۴۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ﴿۴۲﴾ يٰۤاَبَتِ
اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ﴿۴۳﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۴۴﴾
يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۴۵﴾

৩ রুকূ'

*আর এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করো।[২৬] নিসন্দেহে সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী ছিল (এদেরকে সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে নিজের বাপকে বললো, "আব্বাজান! আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদাত করেন, যা শোনেও না, দেখেও না এবং আপনার কোনো কাজও করতে পারে না? আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সোজাপথ দেখিয়ে দেবো। আব্বাজান! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না।[২৭] শয়তান তো করুণাময়ের অবাধ্য। আব্বাজান! আমার ভয় হয় আপনি করুণাময়ের আযাবের শিকার হন কি না এবং শয়তানের সাথী হয়ে যান কি না।"*

২৬. এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। তারা তাদের যুবক পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর বাপ-ভাইয়েরা দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা হযরত ইবরাহীমকে নিজেদের নেতা বলে মানতো এবং তাঁর আওলাদ হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে গর্ব করে বেড়াতো, এ কারণে অন্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে হযরত ইবরাহীমের কথা বলার জন্য এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে।

২৭. মূল শব্দ হচ্ছে, لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ "শয়তানের ইবাদাত করো না।" যদিও হযরত ইবরাহীমের পিতা এবং তাঁর জাতির অন্যান্য লোকেরা মূর্তি পূজা করতো কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের আনুগত্য করছিল তাই হযরত ইবরাহীম তাদের এ শয়তানের আনুগত্যকেও শয়তানের ইবাদাত গণ্য করেন। এ থেকে জানা যায়, ইবাদাত নিছক পূজা

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

*বাপ বললো, "ইবরাহীম! তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ হয়েছো ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমাকে শেষ করে দেবো। ব্যাস; তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও।"*

*ইবরাহীম বললো, "আপনাকে সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেয়ার জন্য দোয়া করবো।*[২৭(ক)] *আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করছি এবং আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও, আমি তো আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি নিজের রবকে ডেকে ব্যর্থ হবো না।"*

*অতপর যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো এবং তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আর তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদেরকে দিলাম যথার্থ নাম-যশ।*[২৮]

ও উপাসনা আরাধনারই নাম নয় বরং আনুগত্যের নামও। তাছাড়া এ থেকে এও জানা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষণরত থেকেও তার আনুগত্য করে তাহলে সে তার ইবাদাত করার অপরাধে অপরাধী হয়। কারণ শয়তান কোনো কালেও মানুষের মাবুদ (প্রচলিত অর্থে) ছিল না বরং তার নামে প্রতি যুগে মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহফ, ৪৯-৫০)

২৭(ক) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, ১১২ টীকা।

২৮ যেসব মুহাজির গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এগুলো তাদের জন্য সান্ত্বনাবাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন তাঁর পরিবারবর্গ থেকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى ؗ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

*৪ রুকূ'*

*আর এ কিতাবে মূসার কথা স্মরণ করো। সে ছিল এক বাছাই করা ব্যক্তি[২৯] এবং ছিল রাসূল-নবী।[৩০] আমি তাকে তূরের ডান দিক থেকে ডাকলাম[৩১] এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম।[৩২] আর নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে সাহায্যকারী হিসেবে দিলাম।*

*আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রাসূল-নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পসন্দনীয় ব্যক্তি।*

*আর এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ করো।[৩৩] সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং একজন নবী। আর তাকে আমি উঠিয়েছিলাম উন্নত স্থানে।[৩৪]*

বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যান নি বরং উলটা উন্নতশির ও সফলকাম হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে না বরং তোমরা এমন মর্যাদা লাভ করবে, জাহেলিয়াতের অন্ধকার আবর্তে মুখ গুজে পড়ে থাকা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা যার কল্পনাই করতে পারে না।

২৯. মূলে مُخْلَص শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে "একান্ত করে নেয়া।" অর্থাৎ হযরত মূসা এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন।

৩০. "রসূল" মানে প্রেরিত। এই মানের দিক দিয়ে আরবী ভাষায় দূত, পয়গম্বর, বার্তাবাহক ও রাজদূতের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর কুরআনে এ শব্দটি এমন সব ফেরেশতার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ

www.banglabookpdf.blogspot.com



কাজে নিযুক্ত করা হয় অথবা এমনসব মানুষকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টির কাছে নিজের বাণী পৌছানোর জন্য নিযুক্ত করেন।

"নবী" শব্দটি অর্থের ব্যাপারে অভিধানবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ একে نَبَأ শব্দ থেকে গঠিত বলেন। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় খবর। এই মূল অর্থের দিকে দিয়ে নবী মানে হয় "খবর প্রদানকারী।" আবার কেউ কেউ বলেন, نُبُو ধাতু থেকে নবী শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ উন্নতি ও উচ্চতা। এ অর্থের দিক দিয়ে এর মানে হয় "উন্নত মর্যাদা" ও "সুউচ্চ অবস্থান"। আযহারী কিসায়ী থেকে তৃতীয় একটি উক্তি উদ্বৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, এ শব্দটি মূলত نَبِى থেকে এসেছে। এর মানে হচ্ছে পথ। আর নবীদেরকে নবী এজন্য বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর দিকে যাবার পথ।

কাজেই কোনো ব্যক্তিকে "রসূল নবী" বলার অর্থ হবে "উন্নত মর্যাদাশালী পয়গম্বর অথবা "আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দানকারী পয়গম্বর" কিংবা "এমন পয়গম্বর যিনি আল্লাহর পথ বাতলে দেন।"

কুরআন মজীদে এ দু'টি শব্দ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমরা দেখি একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু নবী বলা হয়েছে এবং কোথাও শুধু রসূল বলা হয়েছে আবার কোথাও রসূল ও নবী এক সাথে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় রসূল ও নবী শব্দ দু'টি এমনভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে প্রকাশ হয় যে, এ উভয়ের মধ্যে মর্যাদা বা কাজের ধরনের দিক দিয়ে কোনো পারিভাষিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন সূরা হজ্জের ৭ রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ ........ .... ....

"আমি তোমার আগে এমন কোনো রসূলও পাঠাইনি এবং এমন কোনো নবীও পাঠাইনি, যে, ........." একথাগুলো পরিষ্কার প্রকাশ করছে যে, রসূল ও নবী দুটি আলাদা পরিভাষা এবং এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো আভ্যন্তরীণ পার্থক্য আছে। এরি ভিত্তিতে এ পার্থক্যের ধরনটা কি এ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু আসলে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত দলীল প্রমাণের সাহায্যে কেউই রসূল ও নবীর পৃথক মর্যাদা চিহ্নিত করতে পারেননি। বড়জোর এখানে এতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, রসূল শব্দটি নবীর তুলনায় বিশিষ্টতা সম্পন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক রসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। অন্য কথায় নবীদের মধ্যে রসূল শব্দটি এমন সব নবীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে সাধারণ নবীদের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। একটি হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম আহমদ হযরত আবু উমামাহ থেকে এবং হাকেম হযরত আবু যার (রা) থেকে। এতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূলদের সংখ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, ৩১৩ বা ৩১৫ এবং নবীদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। যদিও হাদীসটির সনদ দুর্বল কিন্তু কয়েকটি সনদের মাধ্যমে একই কথার বর্ণনা কথাটির দুর্বলতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৩১. তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে বলতে পূর্ব পাদদেশ বুঝানো হয়েছে। যেহেতু হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে মিসর যাবার পথে এ তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন এবং দক্ষিণ দিক থেকে কোনো ব্যক্তি তূরকে দেখলে তার ডান দিক হবে পূর্ব এবং বাম দিক হবে পশ্চিম, তাই হযরত মূসার সাথে সম্পর্কিত করে তূরের পূর্ব পাদদেশকে "ডান দিক" বলা হয়েছে। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, পাহাড়ের কোনো ডানদিক বা বাম দিক হয় না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা ২০৬ টীকা।

৩৩. হযরত ইদরীস (আ)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারোর মতে তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি নূহের (আ)-ও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনো সহীহ হাদীস আমরা পাইনি যা তাঁর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে। তবে হ্যাঁ, কুরআনের একটি ইংগিত এ ধারণার প্রতি সমর্থন যোগায় যে, তিনি নূহ (আ)-এর পূর্বগামী ছিলেন। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এ নবীগণ (উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে।) আদমের সন্তান, নূহের সন্তান, ইবরাহীমের সন্তান এবং ইসরাঈলের সন্তান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত ঈসা ও হযরত মূসা আলাইহিমুস সালাম বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ইবরাহীমের সন্তানদের অন্তরভুক্ত এবং হযরত ইবরাহীম (আ) নূহের সন্তানদের অন্তরভুক্ত। এরপর থেকে যান কেবলমাত্র হযরত ইদরীস (আ)। তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি আদমের (আ) সন্তানদের অন্তরভুক্ত।

মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে একথা মনে করেন যে, বাইবেলে যে মনীষীকে হনোক (Enoch) বলা হয়েছে তিনিই হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম। তাঁর সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে ঃ

> "আর হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথুশেলহের জন্ম দিলেন। মথুশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন।....পরে তিনি আর রহিলেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" (আদি পুস্তক ৫ ঃ ২১-২৪)

তালমূদের ইসরাঈলী বর্ণনায় তাঁর অবস্থা আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত নূহের পূর্বে যখন আদম সন্তানদের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হলো তখন আল্লাহর ফেরেশতারা হনোককে, যিনি জনসমাজ ত্যাগ করে নির্জনে ইবাদাত বন্দেগী করে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, ডেকে বললেন, "হে হনোক! ওঠো, নির্জনবাস থেকে বের হও এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে চলাফেরা এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করে যে পথে তাদের চলা উচিত এবং যেভাবে তাদের কাজ করতে হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দাও।" এ হুকুম পেয়ে তিনি বের হলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে একত্র করে নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন এবং মানব সন্তানরা তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করলো। হনোক ৩৫৩ বছর পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালান। তাঁর শাসন ছিল ইনসাফ ও সত্যপ্রীতির শাসন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে।" (The Talmud Salections, pp. 18-21)

www.banglabookpdf.blogspot.com



أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

*এরা হচ্ছে এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।*

*তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো[৩৫] এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো।[৩৬] তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে। তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের সামান্যতম অধিকারও ক্ষুণ্ন হবে না।*

৩৪. এর সোজা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে একথা আমাদের এখানেও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নিয়েছিলেন, বাইবেলে তো শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন কারণ "আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।" কিন্তু তালমুদে তার সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনীটি এভাবে শেষ করা হয়েছে যে, "হনোক একটি ঘূর্ণির মধ্যে অগ্নিরথ ও অশ্বসহ আকাশে আরোহণ করলেন।"

৩৫. অর্থাৎ নামায পড়া ত্যাগ করলো অথবা নামায থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে গেলো। এটি প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। নামায আল্লাহর সাথে

www.banglabookpdf.blogspot.com



جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۞

*তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় নিজের বান্দাদের কাছে অদৃশ্য পন্থায় দিয়ে রেখেছেন।[৩৭] আর অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতি পালিত হবেই। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না, যা কিছুই শুনবে ঠিকই শুনবে।[৩৮] আর সকাল-সন্ধ্যায় তারা অনবরত নিজেদের রিযিক লাভ করতে থাকবে। এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীদেরকে।*

*হে মুহাম্মাদ![৩৯] আমি আপনার রবের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না। যাকিছু আমাদের সামনে ও যাকিছু পেছনে এবং যাকিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং আপনার রব ভুলে যান না। তিনি আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝখানে যাকিছু আছে সবকিছুর রব। কাজেই আপনি তার বন্দেগী করুন এবং তার বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকুন।[৪০] আপনার জানামতে তাঁর সমকক্ষ কোনো সত্তা আছে কি?[৪১]*

মু'মিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে। এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এ বাঁধন ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায়। এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে নামায নষ্ট করার পর।

৩৬. এটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অভাব ও এর শূন্যতার অনিবার্য ফল। নামায ছেড়ে দেয়ার পর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে মন গাফেল হয়ে যেতে থাকে তখন যতই এ

www.banglabookpdf.blogspot.com



গাফলতি বাড়তে থাকে ততই প্রবৃত্তির কামনার পূজাও বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে নিজের মনগড়া পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যায়।

৩৭. অর্থাৎ যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় এমন অবস্থায় দিয়েছেন যখন ঐ জান্নাতসমূহ তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে।

৩৮. মূলে "সালাম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে দোষ-ত্রুটিমুক্ত। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোনো আজেবাজে, অর্থহীন ও কটু কথা শোনা যাবে না। সেখানকার সমগ্র সমাজ হবে পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিই হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানকার বাসিন্দারা পরনিন্দা, পরচর্চা, গালিগালাজ, অশ্লীল গান ও অন্যান্য অশালীন ধ্বনি একেবারেই শুনবে না। সেখানে মানুষ শুধুমাত্র ভালো, ন্যায়সংগত ও যথার্থ কথাই শুনবে। এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও শালীন রুচির অধিকারী একমাত্র সে-ই এ নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে। কারণ একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারে যে, মানুষের জন্য এমন একটি পূতিগন্ধময় সমাজে বাস করা কত বড় বিপদ যেখানে কোনো মুহূর্তেই তার কান মিথ্যা, পরনিন্দা, ফিতনা, ফাসাদ, অশ্লীল, অশালীন ও যৌন উত্তেজক কথাবার্তা থেকে সংরক্ষিত থাকে না।

৩৯. এ সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শেষ করে অন্য একটি ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু করার আগে এটি বলা হয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ সূরাটি দীর্ঘকাল পরে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তাঁরা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিব্রীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। প্রথমে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত ফরমান শুনালেন তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হবার আগে আল্লাহর ইংগিতে নিজের পক্ষ থেকে একথা ক'টি বললেন। এ কথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

বক্তব্যের অভ্যন্তর থেকেই শুধু এ সাক্ষের প্রকাশ হচ্ছে না বরং বিভিন্ন হাদীসও এর সমর্থন করছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও রূহুল মা'আনী ইত্যাদির লেখকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

৪০. অর্থাৎ তাঁর বন্দেগীর পথে মজবুতভাবে এগিয়ে চলো এবং এ পথে যেসব সংকট সমস্যা ও বিপদ আসে সবরের সাথে সেসবের মোকাবিলা করো। যদি তাঁর পক্ষ থেকে স্মরণ করা এবং সাহায্য ও সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারে কখনো বিলম্ব হয় তাহলে তাতে ভীত হয়ো না। একজন অনুগত বান্দার মতো সব অবস্থায় তাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৫ রুকূ'

*মানুষ বলে, সত্যিই কি যখন আমি মরে যাবো তখন আবার আমাকে জীবিত করে বের করে আনা হবে ? মানুষের কি স্মরণ হয় না, আমি আগেই তাকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না ? তোমার রবের কসম, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে এবং তাদের সাথে শয়তানদেরকেও ঘেরাও করে আনবো,[৪২] তারপর তাদেরকে এনে জাহান্নামের চারদিকে নতজানু করে ফেলে দেবো। তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে ব্যক্তি করুণাময়ের বেশী অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাকে ছেঁটে বের করে আনবো।[৪৩] তারপর আমি জানি তাদের মধ্য থেকে কারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার বেশী হকদার। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নাম অতিক্রম করবে না।[৪৪] এতো একটা স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব। তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।*

থাকো এবং একজন বান্দা ও রসূল হিসেবে তোমার ওপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে দৃঢ় সংকল্প সহকারে তা পালন করতে থাকো।

৪১. মূলে سَمِىّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। অর্থাৎ আল্লাহ তো হচ্ছেন ইলাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি ? যদি না থেকে থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে কি ?

৪২. অর্থাৎ সেসব শয়তানকে, যাদের এরা চেলা হয়ে গেছে, যাদের প্ররোচনায় পড়ে এরা মনে করে নিয়েছে এ জীবনে যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সব শেষ,

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ
هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ
مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ
الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

*এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারদেরকে বলে, "বলো, আমাদের দু' দলের মধ্যে কে ভালো অবস্থায় আছে এবং কার মজলিসগুলো বেশী জাঁকালো ?"[৪৫] অথচ এদের আগে আমি এমন কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে বেশী সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক শান-শওকতের দিক দিয়েও ছিল এদের চেয়ে বেশী অগ্রসর। এদেরকে বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত হয় করুণাময় তাকে ঢিল দিতে থাকেন, এমনকি এ ধরনের লোকেরা যখন এমন জিনিস দেখে নেয় যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়—তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামতের সময়—তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দল দুর্বল! বিপরীত পক্ষে যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন[৪৬] এবং স্থায়িত্বলাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের প্রতিদান ও পরিণামের দিক দিয়ে ভালো।*

*তারপর তুমি কি দেখেছো সে লোককে যে আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হতে থাকবেই ?[৪৭] সে কি গায়েবের খবর জেনে গেছে অথবা সে রহমানের থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে ?*

www.banglabookpdf.blogspot.com



—কখ্খনো নয়, সে যাকিছু বলছে তা আমি লিখে নেবো[৪৮] এবং তার জন্য আযাবের পসরা আরো বাড়িয়ে দেবো। যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এ ব্যক্তি বলছে তা সব আমার কাছেই থেকে যাবে এবং সে একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে যাবে।

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের কিছু খোদা বানিয়ে রেখেছে, যাতে তারা এদের পৃষ্ঠপোষক হয়।[৪৯] কেউ পৃষ্ঠপোষক হবে না। তারা সবাই এদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে[৫০] এবং উল্‌টো এদের বিরোধী হয়ে পড়বে।

এরপর আর দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই যেখানে আমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসেবে দিতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ অবাধ্য ও বিদ্রোহী দলের নেতা।

৪৪. অতিক্রম করা মানে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে প্রবেশ করা বলা হয়েছে। কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলোর কোনোটির সনদও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় পৌঁছেনি। আবার একথাটি কুরআন মজীদ এবং বিপুল সংখ্যক সহী হাদীসেরও বিরোধী, যেগুলোতে সৎকর্মশীল মু'মিনদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার কথা চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ ورود এর আভিধানিক অর্থও প্রবেশ করা নয়। তাই এটিই এর সঠিক অর্থ যে, সবাইকেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং জালেমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ তাদের যুক্তি ছিল এ রকম ঃ দেখে নাও দুনিয়ায় কার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে ? কার গৃহ বেশী জমকালো ? কার জীবন যাত্রার মান বেশী উন্নত ? কার মজলিসগুলো বেশী আড়ম্বরপূর্ণ ? যদি আমরা এসব কিছুর অধিকারী হয়ে থাকি এবং তোমরা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরই চিন্তা করে দেখো, এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, আমরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও এভাবে দুনিয়ার মজা লুটে যেতে থাকবো আর তোমরা হকের পথে অগ্রসর হয়েও এ ধরনের ক্লান্তিকর জীবন যাপন করে যেতে থাকবে ? আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ ৩৭-৩৮ টীকা।

www.banglabookpdf.blogspot.com



أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৬ রুকূ'

*তুমি কি দেখো না আমি এ সত্য অস্বীকারকারীদের উপর শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা এদেরকে (সত্য বিরোধিতায়) খুব বেশী করে প্ররোচনা দিচ্ছে ? বেশ, তাহলে এখন এদের উপর আযাব নাযিল করার জন্য অস্থির হয়ো না, আমি এদের দিন গণনা করছি।*[৫১] *সে দিনটি অচিরেই আসবে যেদিন মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে রহমানের সামনে পেশ করবো। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। সে সময় যে রহমানের কাছ থেকে পরোয়ানা হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।*[৫২]

৪৬. অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষার সময় আল্লাহ তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার এবং সঠিক পথে চলার সুযোগ দান করেন। তাদেরকে অসৎ কাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে তারা অনবরত সত্য-সঠিক পথে এগিয়ে চলে।

৪৭. অর্থাৎ সে বলে, তোমরা আমাকে যতই পথভ্রষ্ট ও দুরাচার বলতে এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকো না কেন আমি তো আজো তোমাদের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছল এবং আগামীতেও আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকবে। আমার ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বৈষয়িক ক্ষমতা এবং আমার খ্যাতিমান সন্তানদেরকে দেখো। আমার জীবনের কোথায় তোমরা আমার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো ?—এটা মক্কার কোনো একজন মাত্র লোকের চিন্তাধারা ছিল না; বরং মক্কার কাফেরদের প্রত্যেক সরদার ও মাতব্বর এ বিকৃত চিন্তায় ভুগছিল।

৪৮. অর্থাৎ তার অপরাধের ফিরিস্তিতে তার এ দাম্ভিক উক্তিও শামিল করা হবে এবং এর মজাও তাকে টের পাইয়ে দেয়া হবে।

৪৯. মূলে عِزًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এদের জন্য ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ হবে। কিন্তু আরবী ভাষায় "ইজ্জত" মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তির এত বেশী শক্তিশালী ও জবরদস্ত হয়ে যাওয়া যার ফলে তার গায়ে কেউ হাত দিতে না পারে। আর এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির জন্য ইজ্জতের কারণে পরিণত হওয়ার অর্থ এ হয় যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির এমন সহায়ক হবে যার ফলে তার কোনো বিরোধী তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে না পারে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ
السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

*তারা বলে, রহমান কাউকে পুত্র গ্রহণ করেছেন—মারাত্মক বাজে কথা যা তোমরা তৈরি করে এনেছো। আকাশ ফেটে পড়ার, পৃথিবী বিদীর্ণ হবার এবং পাহাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এজন্য যে, লোকেরা রহমানের জন্য সন্তান থাকার দাবী করেছে ! কাউকে সন্তান গ্রহণ করা রহমানের জন্য শোভন নয়। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যাকিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে। সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। সবাই কিয়ামতের দিন একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।*

*নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে শীঘ্রই রহমান তাদের জন্য অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।*[৫৩]

৫০. অর্থাৎ তারা বলবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি আমাদের ইবাদাত করো এবং এ আহম্মকের দল যে আমাদের ইবাদাত করছে তাও তো আমরা জানতাম না।

৫১. এর মানে হচ্ছে, এদের বাড়াবাড়ির কারণে তোমরা বে-সবর হয়ো না। এদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। পাত্র প্রায় ভরে উঠেছে। আল্লাহর দেয়া অবকাশের মাত্র আর কদিন বাকি আছে। এ দিনগুলো পূর্ণ হতে দাও।

৫২. অর্থাৎ যে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে তার পক্ষেই সুপারিশ হবে এবং যে পরোয়ানা পেয়েছে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। আয়াতের শব্দগুলো দু'দিকেই সমানভাবে আলোকপাত করে।

সুপারিশ কেবলমাত্র তার পক্ষেই হতে পারবে, যে রহমান থেকে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমান এনে এবং আল্লাহর সাথে কিছু সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে আল্লাহর ক্ষমার হকদার বানিয়ে নিয়েছে একমাত্র তার পক্ষেই

www.banglabookpdf.blogspot.com



*বস্তুত হে মুহাম্মাদ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি মুত্তাকীদেরকে সুখবর দিতে ও হঠকারীদেরকে ভয় দেখাতে পারো। এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ কি কোথাও তাদের নাম-নিশানা দেখতে পাও অথবা কোথাও শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ ?*

সুপারিশ হবে। আর সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে যে পরোয়ানা লাভ করবে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে তাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না ; বরং আল্লাহ নিজেই যাদেরকে অনুমতি দেবেন একমাত্র তারাই সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবেন।

৫৩. অর্থাৎ আজ মক্কার পথেঘাটে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সে সময় নিকটবর্তী যখন তারা সৎকাজ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠবেই। মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দুনিয়াবাসী তাদের পথে ফুল বিছিয়ে দেবে। আল্লাহদ্রোহিতা, পাপ, অশ্লীলতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের ভিত্তিতে যে নেতৃত্ব এগিয়ে চলে তা মানুষের মাথা নত করাতে পারে কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারে না। অপরদিকে যারা সত্য, ন্যায়নীতি, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও সদাচার সহকারে সত্য-সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে, দুনিয়াবাসী প্রথম প্রথম তাদের প্রতি যতই বিরূপ থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মন জয় করে নেয় এবং অবিশ্বস্ত ও পাপাচারীদের মিথ্যা বেশীক্ষণ তাদের পথ রোধ করতে পারে না।

❑

www.banglabookpdf.blogspot.com



# ত্বা-হা

## ২০

**নাযিলের সময়-কাল**

সূরা মারয়াম যে সময় নাযিল হয় এ সূরাটি তার কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়। সম্ভবত হাবশায় হিজরতকালে অথবা তার পরবর্তীকালে এটি নাযিল হয়। তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যে এটি নাযিল হয় তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসটি হচ্ছে ঃ যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হলেন তখন পথে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার নিজের বোন ও ভগিনীপতি এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। একথা শুনে হযরত উমর সোজা নিজের বোনের বাড়িতে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে খাত্তাব ও ভগিনীপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বসেছিলেন। তাঁরা হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুরআনের কোনো একটি অংশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন। হযরত উমরের আসার সাথে সাথেই তার ভগিনী ঐ অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর তা পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর ভগিনীপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মারতে শুরু করলেন। বোন তাঁকে বাঁচাতে চাইলেন। ফলে তাঁকেও মারলেন। এমনকি তার মাথা ফেটে গেলো। শেষে বোন ও ভগিনীপতি দুজনই বললেন, হাঁ আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, তুমি যা করতে পারো করো। নিজের বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। বোন প্রথমে তা ছিঁড়ে না ফেলার জন্য শপথ নিলেন তারপর বললেন, তুমি গোসল না করা পর্যন্ত এ পবিত্র সহীফায় হাত লাগাতে পারবে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করলেন তারপর সে সহীফা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। সেখানে এ সূরা ত্বা-হা লেখা ছিল। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়লো, "বড় চমৎকার কথা।" একথা শুনতেই হযরত খাব্বাব ইবনে আরত বের হয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি হযরত উমরের আগমনের শব্দ শুনেই লুকিয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর নবীর দাওয়াত ছড়াবার ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যে বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। গতকালই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ ! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, এ দু' জনের মধ্য থেকে কোনো একজনকে ইসলামের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। কাজেই হে উমর ! আল্লাহর দিকে চলো, আল্লাহর দিকে চলো।" ওমরের মনে পরিবর্তন ঘটতে যেটুকু বাকি ছিল খাব্বাবের এ উক্তি তাও পূর্ণ করে দিল। তখনই হযরত

www.banglabookpdf.blogspot.com



উমর খাত্তাবের সাথে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এটি হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠানের কিছুকাল পরের ঘটনা।

**বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়**

সূরাটি এভাবে শুরু হয়েছে, হে মুহাম্মাদ! অযথা তোমাকে একটি বিপদের সম্মুখীন করার জন্য তোমার ওপর এ কুরআন নাযিল হয়নি। তোমার কাছে এ দাবী করা হয়নি যে, পাথরের বুক চিরে দুধের নহর বের করে আনো, অস্বীকারকারীদেরকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ো এবং হঠকারীদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেখিয়ে দাও। এটি তো শুধুমাত্র একটি উপদেশ ও স্মারক, যার ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগবে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে যে নিষ্কৃতি পেতে চায় সে এটি শুনে সংশোধিত হয়ে যাবে। এটি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের কালাম এবং তিনি ছাড়া আর কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। কেউ মানুক না মানুক এ দু'টি কথা চিরন্তন ও অমোঘ সত্য।

এ ভূমিকার পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু করা হয়েছে। বাহ্যত একটি কাহিনী আকারে এটি বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন অবস্থার প্রতি কোনো ইংগিতও এতে নেই। কিন্তু যে পরিবেশে এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার অবস্থার সাথে মিলেমিশে এটি মক্কাবাসীদের সাথে কিছু ভিন্নতর কথা বলছে বলে মনে হয়। এর শব্দ ও বাক্যগুলো থেকে নয় বরং দুই বাক্যের মধ্যস্থিত অনুচ্চারিত ভাবার্থ থেকেই সে কথা প্রকাশিত হচ্ছে। সে কথা প্রকাশের আগে আর একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদীদের উপস্থিতি এবং আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, তাছাড়া রোমের ও হাবশার খৃস্টীয় শাসনের প্রভাবেও আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করা হতো। এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পর এখন আসুন এ কাহিনীর মধ্যে যে অব্যক্ত কথাগুলো মক্কাবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করি ঃ

এক ঃ কাউকে নবুওয়াত দান করার জন্য আল্লাহ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিপুল সংখ্যক জনতাকে একত্র করে যথারীতি একটি উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণাবাণী শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননি যে, আজ থেকে অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাদের জন্য নবী নিযুক্ত করেছি। নবুওয়াত যাকেই দেয়া হয়েছে হযরত মূসার মতো গোপনীয়তা রক্ষা করেই দেয়া হয়েছে। কাজেই আজ তোমরা অবাক হচ্ছো কেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাত তোমাদের সামনে নবী হিসেবে হাযির হয়ে গেছেন, আকাশ থেকেও এর ঘোষণাবাণী উচ্চারিত হলো না। আর ফেরেশতারাও পৃথিবীতে এসে ঢাকঢোল পিটিয়ে একথা ঘোষণা করলেন না ? ইতিপূর্বে যাদেরকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের নিযুক্তিকালে কবে এ ধরনের ঘোষণা হয়েছিল যে, আজ তা হবে ?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ যে কথা পেশ করছেন (অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত) ঠিক একই কথা নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করার সময় আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছিলেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



তিন ঃ তারপর আজ যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রকার সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত ছাড়াই কুরাইশদের মুকাবিলায় সত্যের দাওয়াতের পতাকাবাহী করে একাকী দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালামকেও ফেরাউনের মতো মহাপরাক্রমশালী বাদশাহকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করার আহ্বান জানাবার গুরুদায়িত্বে আকস্মিকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সাথেও কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হয়নি। আল্লাহর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনি অদ্ভূত ও বিস্ময়কর। তিনি মাদ্য়ান থেকে মিসর গমনকারী একজন পথিককে পথ চলাকালে ধরে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন, যাও, সমকালের সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও জালেম শাসকের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও। কিছু সাহায্য করে থাকলে এতটুকু করেছেন যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে দিয়েছেন। কোনো দুর্দান্ত সেনাবাহিনী এবং হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে এ কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করা হয়নি।

চার ঃ মক্কাবাসীরা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সংশয়-সন্দেহ, অপবাদ-দোষারোপ, প্রতারণা ও জুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করছে ফেরাউন এসব অস্ত্র আরো অনেক বেশী করে মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দেখো কিভাবে তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত কে বিজয়ী হলো ? আল্লাহর সেই সাজসরঞ্জামহীন নবী, না সৈন্য বলে বলীয়ান ফেরাউন ? এ প্রসংগে মুসলমানদেরকেও একটি অব্যক্ত সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাজসরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের দৈন্য ও কাফেরদের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ করো না, বরং যে কাজের পেছনে আল্লাহর হাত থাকে শেষ পর্যন্ত তারই বিজয় সূচিত হয়। এ সংগে মুসলমানদের সামনে মিসরের যাদুকরদের দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। যখন সত্য তাদের কাছে আবরণমুক্ত হয়ে গেলো তখন তারা নির্দ্বিধায় তার প্রতি ঈমান আনলো। তারপর ফেরাউনের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে এক চুল পরিমাণও সরিয়ে আনতে পারলো না।

পাঁচ ঃ শেষে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে একটি সাক্ষ পেশ করতে গিয়ে দেবতা ও উপাস্য তৈরির সূচনা কেমন হাস্যকর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী কখনো এ ধরনের ঘৃণ্য জিনিসের নামগন্ধও বাকি রাখার পক্ষপাতি হন না। কাজেই আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিরক ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করছেন তা নবুওয়াতের ইতিহাসের কোনো নতুন ঘটনা নয়।

এভাবে মূসার কাহিনীর মোড়কে এমন সমস্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যা সে সময় তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাতের সাথে সম্পর্ক রাখতো। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ এ কুরআন একটি উপদেশ ও স্মারক। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদের বুঝাবার জন্য এটি পাঠানো হয়েছে। এর বক্তব্য শুনলে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর এর কথা না মানলে তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



তারপর আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো এটা হচ্ছে শয়তানের পদাংক অনুসরণ। কখনো সখনো শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া অবশ্যি একটি সাময়িক দুর্বলতা। মানুষের পক্ষে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মানুষের জন্য সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখনই তার সামনে তার ভুল সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে তখনই সে তার পিতা আদমের মতো পরিষ্কার ভাষায় তা স্বীকার করে নেবে, তাওবা করবে এবং আবার আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসবে। ভুল করা ও তার ওপর অবিচল থাকা এবং একের পর এক উপদেশ দেবার পরও তা থেকে বিরত না হওয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। এর পরিণাম নিজেকে ভুগতে হবে, অন্যের এতে কোনো ক্ষতি নেই।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে এ মর্মে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো জাতিকে তার কুফরী ও অস্বীকারের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না বরং তাকে সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কাজেই ভীত হবেন না। ধৈর্য সহকারে এদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম অত্যাচার বরদাশত করতে এবং উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে থাকুন।

প্রসংগক্রমে নামাযের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে সবর, সংযম, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি এবং আত্মপর্যালোচনার এমন গুণাবলী সৃষ্টি হয় যা সত্যের দাওয়াত দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন।

❐

www.banglabookpdf.blogspot.com



পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰهٰ ۞ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۞ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۞ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۞ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۞ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۞ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۞ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۞

*ত্বা–হা। আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে। এ তো একটি স্মারক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে।[১] যে সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশজগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে। তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[২] যাকিছু পৃথিবীতে ও আকাশে আছে, যাকিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন।[৩] তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।[৪]*

১. এ বাক্যটি নিজেই পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থের ওপর আলোকপাত করছে। উভয় বাক্য মিলিয়ে পড়লে এ পরিষ্কার অর্থটি বুঝা যায় যে, কুরআন নাযিল করে আমি তোমার দ্বারা এমন কোনো কাজ করাতে চাই না যা তোমার পক্ষে করা অসম্ভব। তোমাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে, যারা মেনে নিতে চায় না তাদেরকে মানাতেই হবে এবং যাদের অন্তরের দুয়ার ঈমানের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এটা তো একটা স্মরণ করা ও স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এটা এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে এটা শুনে সজাগ হবে। এখন যদি কিছু লোকের মনে আল্লাহর ভয় একদম না থেকে থাকে এবং তাদের হক ও বাতিলের

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ۞ إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓا إِنِّيٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ اٰتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُودِيَ يٰمُوسٰى ۞ إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ۞ إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۞

*আর তোমার কাছে কি মূসার খবর কিছু পৌঁছেছে ? যখন সে একটি আগুন দেখলো[৫] এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকে বললো, "একটু দাঁড়াও, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটি অংগার আনতে পারবো অথবা এ আগুনের নিকট আমি কোনো পথের দিশা পাবো।"[৬]*

*সেখানে পৌঁছলে তাকে ডেকে বলা হলো, "হে মূসা! আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো,[৭] তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছো[৮] এবং আমি তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যাকিছু অহী করা হয়। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।[৯] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে।[১০]*

কোনো পরোয়াই না থাকে তাহলে তাদের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই তোমার নেই।

২. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর তিনি কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েননি। বরং সৃষ্টিজগতে সমস্ত ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করছেন। এই সীমাহীন রাজ্যে তিনি নিজেই রাজত্ব করছেন। তিনি কেবল স্রষ্টাই নন, কার্যত শাসকও।

৩. অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের ওপর যেসব জুলুম নিপিড়ন চলছে এবং যেসব দুষ্কৃতি ও শয়তানী কার্যকলাপের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলোর জন্য তোমার উচ্চ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানানোর তেমন কোনো দরকার নেই। তুমি কোন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছো তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। তিনি তোমাদের অন্তরের ডাকও শুনছেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৪. অর্থাৎ তিনি সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী।

৫. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত মূসা মাদইয়ানে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যার সাথে মাদইয়ানে বিয়ে হয়েছিল) নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এর আগের ঘটনা সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হযরত মূসার হাতে একজন মিসরীয় মারা পড়ার ফলে তিনি নিজের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এ সময় তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদয়ানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৬. মনে হচ্ছে তখন সময়টা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে আখেরাতের পথ।

৭. সম্ভবত এ ঘটনার কারণে ইহুদীরা তাদের শরীয়াতের এ বিধান তৈরি করে নিয়েছে যে, জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিভ্রান্তিটি দূর করার জন্য বলেন ঃ

خالفوا اليهود فانهم لايصلون فى نعالهم ولا خفافهم

"ইহুদীদের বিপরীত কাজ করো। কারণ তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরে নামায পড়ে না।" (আবু দাউদ)

এর অর্থ এ নয় যে, জুতা পরেই নামায পড়তে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এমনটি করা জায়েয। কাজেই উভয়বিধ কাজ করো। আবু দাউদে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী (স) বলেছেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে, সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে দেখে নেয়। যদি কোনো নাপাকী লেগে থাকে। তাহলে মাটিতে ঘসে পরিষ্কার করো এবং সে জুতা পরে নামায পড়ে নাও।" আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাগুলো আছে ঃ "যদি তোমাদের কেউ জুতা দিয়ে নাপাকী মাড়িয়ে থাকে তাহলে মাটি তাকে পাক করে দেবার জন্য যথেষ্ট।" আর হযরত উম্মে সালমাহ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে يطهره ما بعده অর্থাৎ "এক জায়গায় নাপাকী লেগে থাকলে অন্য জায়গায় যেতে যেতে মাটি নিজেই তাকে পাক করে দেবে।" এ বিপুল সংখ্যক হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আওযায়ী ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহ প্রমুখ ফকীহগণ এমত পোষণ করেন যে, জুতা সর্বাবস্থায় যমীনের মাটির সাহায্যে পাক হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেঈর সর্বজন পরিচিত উক্তি এর বিরোধী। সম্ভবত তিনি জুতা পরে নামায পড়া আদবের বিরোধী মনে করে তা করতে নিষেধ করেন। যদিও একথা মনে করা হয়েছে যে, তাঁর মতে

www.banglabookpdf.blogspot.com



জুতা মাটিতে ঘসলে পাক হয় না। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মসজিদে নববীতে চাটাইয়ের বিছানাও ছিল না বরং কাঁকর বিছানো ছিল। কাজেই এসব হাদীসের প্রমাণের ভিত্তিতে যদি কোনো ব্যক্তি আজ মসজিদের বিছানার ওপর জুতা পায়ে উঠতে চায় তাহলে তা সঠিক হবে না। তবে ঘাসের ওপর বা খোলা ময়দানে জুতা পায়ে নামায পড়তে পারে। তবে যারা মাঠে-ময়দানে জানাযার নামায পড়ার সময়ও পা থেকে জুতা খুলে ফেলার ওপর জোর দিতে থাকে তারা আসলে শরীয়াতের বিধান জানে না।)

৮. সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, "তুওয়া" ছিল এই উপত্যকাটির নাম। কিন্তু কোনো কোনো মুফাসসির "পবিত্র তুওয়া উপত্যকা" অর্থ করেছেন "এমন উপত্যকা যাকে একটি সময়ের জন্য পবিত্র করা হয়েছে।"

৯. এখানে নামাযের মূল উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যেন আল্লাহ্ থেকে গাফেল না হয়ে যায়। দুনিয়ার চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলী যেন তাকে এ সত্য বিমুখ না করে দেয় যে, সে কারো বান্দা এবং সে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। এ চিন্তাকে জীবন্ত ও তরতাজা রাখার এবং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে নামায। প্রতিদিন কয়েকবার মানুষকে দুনিয়ার কাজকারবার থেকে সরিয়ে নামায তাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়।

কেউ কেউ এর এ অর্থও নিয়েছেন যে, নামায কায়েম করো যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ "আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণে রাখবো।"

আনুসংগিকভাবে এ আয়াত থেকে এ বিধানটিও বের হয় যে, যে ব্যক্তি ভুলে যায় তার যখনই মনে পড়বে তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

"কোনো ব্যক্তি কোনো সময় নামায পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই নামায পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোনো কাফফারা নেই। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ)

এ অর্থে হযরত আবু হুরাইরার (রা) একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি তাঁদের হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, "ঘুমের মধ্যে কোনো দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাত নামায পড়ে নেবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

১০. তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সকল নবীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে

www.banglabookpdf.blogspot.com



فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِىَ عَصَاىَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

*কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে— "আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি?"[১১]*

*মূসা জবাব দিল, "এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্যে পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।"[১২]*

*বললেন, "একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা।"*

*সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাত সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল।*

*বললেন, "ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে,[১৩] এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এজন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"*

আখেরাত। এখানে কেবলমাত্র এ সত্যটি বর্ণনা করাই হয়নি বরং এর উদ্দেশ্যের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রতীক্ষিত সময়টি আসার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং যে কাজ করেছে তার প্রতিদান পাবে সে আখেরাতে। তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে সে সময়টি গোপন রাখা হয়েছে। যার আখেরাতের সামান্য চিন্তা থাকবে সে সবসময় এ সময়টির কথা ভাববে এবং এ ভাবনা

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

*মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও[১৪] আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৫] আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে।[১৬] তার মাধ্যমে আমার হাত মযবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি। তুমি সবসময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক।"*

তাকে ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি বৈষয়িক কাজকর্মের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইবে সে এ চিন্তার মধ্যে ডুবে যাবে যে, কিয়ামত এখনো অনেক দূরে বহুদূরেও তার আসার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না।

১১. জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না। বরং আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরাতের খেলা কিভাবে শুরু হয়।

১২. যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ঠ ছিল যে, জনাব, এটি একটি লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

১৩. সূর্যের আলোর মতো আলো হবে কিন্তু এর ফলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বাইবেলে সাদা হাতের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের তাফসীরগুলোতেও এর প্রচলন হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা যখন বগলে হাত রেখে বাইরে বের করলেন তখন দেখা গেলো পুরো হাতটাই কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর আবার যখন তা বগলে রাখলেন তখন আবার আগের মতো হয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com



গেছে। এ মুজিযাটির এ ব্যাখ্যাই তালমূদেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এ রোগ সে লুকিয়ে রেখেছিলে। তাই তার সামনে এ মুজিযা পেশ করে তাকে দেখানো হয়েছে যে, দেখো মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে মুহূর্তের মধ্যেই তা নিরাময় করা যায়। কিন্তু প্রথমত ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা কোনো নবীকে কুষ্ঠরোগের মুজিযা দিয়ে এক বাদশাহর দরবারে পাঠানোর ব্যাপারটিই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত ফেরাউনের যদি অপ্রকাশ্য কুষ্ঠরোগ থেকে থাকে তাহলে কুষ্ঠরোগীর সাদা হাত শুধুমাত্র তার একার জন্য মুজিযা হতে পারে, তার সভাসদদের ওপর এ মুজিযার কী প্রভাব পড়বে ? কাজেই সঠিক কথা এটাই যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তাঁর হাত সূর্যলোকের মতো আলোকোজ্জল হয়ে উঠতো এবং চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। প্রথম যুগের মুফাসসিরদের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

১৪. অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও। যেহেতু হযরত মূসা (আ)-কে একটি অনেক বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দোয়া করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, ধৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন।

১৫. বাইবেলে এর যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা বললেন ঃ "হায় সদাপ্রভু ! আমি বাকপটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি। কারণ আমি জড়মুখ ও জড় জিহ্বা। (যাত্রা পুস্তক ৪ ঃ ১০) কিন্তু তালমূদে এ সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে একথা বলা হয়েছে যে, শৈশবে হযরত মূসা যখন ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন একদিন তিনি ফেরাউনের মাথার মুকুট নামিয়ে নিজের মাথায় পরে নেন। এতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ শিশু এ কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে অথবা এটা তা নিছক বালকসুলভ চপলতা। শেষে ঠিক করা হয়, শিশুর সামনে সোনা ও আগুন একসাথে রাখা হবে। সে মোতাবেক দুটি জিনিস এনে একসাথে সামনে রাখা হলো এবং হযরত মূসা আগুন উঠিয়ে মুখে পুরে দিলেন। এতে তিনি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার জিহ্বায় চিরকালের জন্য জড়তা সৃষ্টি হয়।

এ কাহিনী ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আমাদের তাফসীর গ্রন্থগুলোতেও লিখিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শিশু যদি আগুনে হাত দিয়েও ফেলে তাহলে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে অংগার উঠিয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেবে। শিশু তো আগুনের জ্বালা অনুভব করার সাথে সাথেই হাত গুটিয়ে নেবে। পোড়া হাতে অংগার নিয়ে সে অংগার মুখে দেবার অবকাশ পাবে কেমন করে ? কুরআনের শব্দাবলী থেকে আমরা যে কথা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে বাগ্মীতার অভাব দেখছিলেন। ফলে তাঁর মনে আশংকা জেগেছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর কখনো বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾

*বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো। আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম।[১৭] সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মাকে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা অহীর মাধ্যমে করা হয়, এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, দরিয়া তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।*

(এ পর্যন্ত যার কোনো প্রয়োজন তাঁর দেখা দেয়নি) তাহলে তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি। এ বিষয়েই ফেরাউন একবার তাঁকে খোটা দিয়ে বলেছিল। "এ ব্যক্তি তো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না" (لَا يَكَادُ يُبِينُ যুখরুফ ৫২) এ দুর্বলতা অনুভব করেই হযরত মূসা নিজের ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে চান। সূরা কাসাসে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

وَأَخِى هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا

"আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাকপটু তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও" (আল কাসাস ঃ আয়াত ৩৪।) পরবর্তী আলোচনায় আরো জানা যায় যে, হযরত মূসার এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ জোরদার ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন। কুরআনে ও বাইবেলে তাঁর পরবর্তীকালের যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা উন্নত পর্যায়ের শাব্দিক অলংকার ও বাকপটুতার সাক্ষ্য দেয়।

জিভে জড়তা আছে এমন একজন তোতলা ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের রসূল নিযুক্ত করবেন, একথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিরোধী। রসূলরা সবসময় এমন ধরনের লোক হয়েছেন যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিকে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোনো রসূলকে এমন কোনো

www.banglabookpdf.blogspot.com



إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

*স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, "আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো, যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে ?" এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো। হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না। যাও, তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"*[১৮]

*উভয়েই*[১৮(ক)] *বললো, "হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে।"*

দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো যেতে পারতো না, যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হন অথবা লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

১৬. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত হারুন হযরত মূসার চাইতে তিন বছরের বড় ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৭ ঃ ৭)

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۝ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

*বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের অহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১৯]*

*ফেরাউন[২০] বললো, "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দুজনের রব কে হে মূসা?"[২১]*

*মূসা জবাব দিল, "আমাদের রব তিনি[২২] যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথনির্দেশ দিয়েছেন।"[২৩]*

১৭. এরপর আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তাঁর প্রতি যতগুলো অনুগ্রহ করা হয়েছিল, এক এক করে তার সবকটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মূসাকে এ অনুভূতি দান করা যে, এখন যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এ কাজের জন্যই তোমাকে পয়দা করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্যই আজ পর্যন্ত বিশেষ সরকারী তত্ত্বাবধানে তুমি প্রতিপালিত হয়ে এসেছো।

১৮. মানুষ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়।

১৮(ক). মনে হচ্ছে এটা এমন সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আ) মিসরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যত তাঁর সাথে শরীক হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে উভয়েই আল্লাহর কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



১৯. এ ঘটনাটি বাইবেল ও তালমূদে যেভাবে পেশ করা হয়েছে তার ওপর একবার নজর বুলানো দরকার। এর ফলে কুরআন মজীদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা কেমন মর্যাদা সহকারে বর্ণনা করেছে এবং বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর কি চিত্র অংকন করা হয়েছে তা আন্দাজ করা যাবে। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, প্রথমবার আল্লাহ যখন মূসাকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার জাতি বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনবে" তখন হযরত মূসা জবাব দিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাবার এবং বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে আনার আমি কে ?" তারপর আল্লাহ হযরত মূসাকে অনেক বুঝালেন, তাঁর মনে শক্তি সঞ্চার করলেন, মু'জিযা দান করলেন কিন্তু মূসা আবার একথাই বললেন, "হে আমার প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও এ বার্তা পাঠাও।" (যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ১৩) তালমূদের বর্ণনা আবার এর চাইতে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ ও হযরত মূসার সাথে সাতদিন পর্যন্ত বাদানুবাদ হতে থাকে। আল্লাহ বলতে থাকেন, নবী হও। কিন্তু মূসা বলতে থাকেন, আমার কণ্ঠই খুলছে না, কাজেই আমি নবী হই কেমন করে। শেষে আল্লাহ বললেন, তুমি নবী হয়ে যাও এতেই আমি খুশী। একথায় হযরত মূসা বললেন, লূতকে বাঁচাবার জন্য আপনি ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, হাজেরা যখন সারার গৃহ থেকে বের হলেন তখন তার জন্য পাঁচজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, আর এখন নিজের বিশেষ সন্তান (বনী ইসরাঈল)-দেরকে মিসর থেকে বের করে আনার জন্য আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন ? একথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি রিসালাতের কাজে তাঁর সাথে হারুনকে শরীক করে দিলেন। আর মূসার সন্তানদের বঞ্চিত করে পৌরহিত্যের দায়িত্ব হারুনের সন্তানদের দিয়ে দিলেন—এগুলোই হচ্ছে প্রাচীন কিতাব এবং নির্লজ্জ লোকেরা এগুলো সম্পর্কে বলে থাকে যে, কুরআনের এ কাহিনীগুলো নাকি এসব কিতাব থেকে নকল করা হয়েছে।

২০. হযরত মূসা কিভাবে ফেরাউনের কাছে পৌছলেন এবং কিভাবে তার সামনে নিজের দাওয়াত পেশ করলেন এসব বিস্তারিত বিবরণ এখানে পরিহার করা হয়েছে। সূরা আরাফের ১৩ রুকূতে এ আলোচনা এসেছে। আর সামনের দিকে সূরা শূআরার ২-৩, সূরা কাসাসের ১৪ এবং সূরা নাযিআতের ১ রুকূতে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফের ৮৫ টীকা দেখুন।

২১. দুই ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ) এবং দাওয়াতদানের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তাই ফেরাউন তাঁকে সম্বোধন করে। আর হতে পারে তাঁকে সম্বোধন করার তার আর একটি কারণও থাকতে পারে। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, সে হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মীতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হযরত মূসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। ইতিপূর্বে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দুজন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিই। সূরা নাযিআতে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে

www.banglabookpdf.blogspot.com



যে, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى হে মিসরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব। সূরা যুখরুফে সে দরবারের সমস্ত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলে ঃ

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ

"হে আমার জাতি ! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই ? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না ?" (৫১ আয়াত) সূরা কাসাসে সে নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলে ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ج فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى.

"হে জাতির সরদারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ বানাচ্ছে।" (৩৮ আয়াত)

সূরা শূ'আরায় সে হযরত মূসাকে ধমক দিয়ে বলে ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

"যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বানিয়েছো তাহলে মনে রেখো, তোমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেবো।" (২৯ আয়াত)

এর অর্থ এ নয় যে, ফেরাউন তার জাতির একমাত্র মাবুদ ছিল এবং সেখানে তার ছাড়া আর কারো পূজা হতো না। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ফেরাউন নিজেকে সূর্য দেবতার (র' বা রা') অবতার হিসেবে বাদশাহের দাবীদার বলতো। তাছাড়া মিসরের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, বহু দেবী ও দেবতার পূজা-উপাসনা করা ছিল এ জাতির ধর্ম। তাই "একমাত্র পূজনীয়" হওয়ার দাবী ফেরাউনের ছিল না। বরং সে কার্যত মিসরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল। সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোনো সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। তার আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণে কোনো কোনো লোকের ধারণা হয়েছে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ্ ও উপাস্য হওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু একথা কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, সে উর্ধ জগতে অন্য কারো শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো। সূরা আল মু'মিন ২৮-৩৪ এবং সূরা যুখরুফ ৫৩ আয়াত গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন। এ আয়াতগুলো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতো না। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রসূল এসে তার ওপর হুকুম চালাবে, এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাসাস, ৫৩ টীকা)

www.banglabookpdf.blogspot.com



২২. অর্থাৎ আমরা সকল অর্থে একমাত্র তাঁকেই রব মানি। প্রতিপালক, প্রভু, মালিক, শাসক ইত্যাকার সকল অর্থেই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব বলে স্বীকার করি না।

২৩. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্ব-জাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শুনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্ব-জাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকও।

এ অতুলনীয় ব্যাপক অর্থবহুল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু একথাই বলেননি যে, তাঁর রব কে ? বরং একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি রব কেন এবং কেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। দাবীর সাথে সাথে তার যুক্তি-প্রমাণও এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে এসে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, যখন ফেরাউন ও তার প্রত্যেকটি প্রজা তার নিজের বিশেষ অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত এবং যখন তাদের এক জনেরও শ্বাসযন্ত্র পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নিজের কাজ করে না যাওয়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না তখন ফেরাউনের নিজেকে লোকদের রব বলে দাবী করা এবং লোকদের কার্যত তাকে নিজেদের রব বলে মেনে নেয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আবার এ ছোট্ট বাক্যে হযরত মূসা (আ) ইশারায় রিসালাতের যুক্তিও পেশ করে দিয়েছেন। ফেরাউন এই রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। হযরত মূসার যুক্তির মধ্যে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথ নির্দেশনা দেবার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর মাছ ও মুরগীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথ নির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখাবার জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথ দেখাবেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿٥٤﴾

*ফেরাউন বললো, "আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল ?"*[২৪]

*মূসা বললো, "সে জ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।"*[২৫]

*—তিনিই*[২৬] *তোমাদের জন্য যমীনের বিছানা বিছিয়েছেন, তার মধ্যে তোমাদের চলার পথ তৈরি করেছেন এবং ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। খাও এবং তোমাদের পশুও চরাও। অবশ্যি এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য বহু নিদর্শনাবলী।*[২৭]

২৪. অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভু ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে ? তারা সবাই কি গোমরাহ ছিল ? তারা সবাই কি আযাবের হকদার ছিল ? তাদের সবার কি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিল ? এ ছিল ফেরাউনের কাছে হযরত মূসার এ যুক্তির জবাব। হতে পারে সে মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ জবাব দিয়েছে। আবার দুষ্টামীর কারণেও এ জবাব দিতে পারে। তাছাড়া এ উভয় কারণই এ জবাবের পিছনে সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেও একথায় রাগান্বিত হয়েছে যে, এ ধর্মের কারণে আমাদের সকল বুযর্গ যে পথভ্রষ্ট ছিল তা মেনে নিতে হবে আবার সাথে সাথে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিসরবাসীদের মনে হযরত মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। সত্যপন্থীদের সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটি হামেশা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূর্খদের কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এটা বড়ই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সময় কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশী এ অস্ত্রটিকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের এ ছলনার উল্লেখ যথার্থই ছিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com



مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى ﴿۵۵﴾

৩ রুকূ'

*এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এ থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করবো।*[২৮]

২৫. এটি হযরত মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। এ থেকে প্রচার কৌশল সম্পর্কে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায়। উপরের বর্ণনা অনুসারে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো। যদি হযরত মূসা বলতেন, হ্যাঁ, তারা সবাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তাহলে এটা সত্য কথনের বিরাট আদর্শ হলেও এ জবাব হযরত মূসার পরিবর্তে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তাই তিনি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে এমন জবাব দেন যা ছিল একদিকে যথার্থ সত্য এবং অন্যদিকে ফেরাউনের বিষ দাঁতও উপড়ে ফেলতে সক্ষম। তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোনো উপায় নেই। কাজেই তাদের ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত দিই কেমন করে ? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোনো জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোনো জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের পরিণাম কি হবে, তোমার ও আমার একথা চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের ভূমিকা কি এবং আমরা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হবো।

২৬. কথার ধরন থেকে বুঝা যাচ্ছে, হযরত মূসার জবাব "বিস্মৃতও হন না"-এ এসে শেষ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত সমস্ত ভাষ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও স্মারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতীতে ঘটেছে বা আগামীতে ঘটবে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে যখন কোনো ব্যক্তির কোনো উক্তি উদ্ধৃত করা হয় তখন তার পরপরই উপদেশ, ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য বলা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথার ধরন থেকেই জানা যায় যে, এগুলো ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির কথার আলোচনা চলছিল তার উক্তি নয় বরং আল্লাহর নিজের উক্তি।

উল্লেখ্য এ ভাষ্যের সম্পর্ক কেবলমাত্র নিকটবর্তী বাক্য "আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না"-এর সাথে নেই বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমগ্র বক্তব্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক, যা رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ থেকে শুরু হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ যারা ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য অনুসন্ধান করতে চান তারা এ নিদর্শনাবলীর সহায়তায় প্রকৃত সত্যের মনযিলে পৌঁছার পথ জানতে পারেন। এ নিদর্শনাবলী তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের একজন রব আছেন

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

*আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম।[২৯] কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না। বলতে লাগলো, "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে ?[৩০] বেশ, আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মুকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানে সামনে এসে যাও।"*

*মূসা বললো, "উৎসবের দিন নির্ধারিত হলো এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে।[৩১] ফেরাউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মুকাবিলায় এসে গেলো।[৩২]*

এবং সমগ্র রুবুবিয়াত ও এলাহী কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্য কোনো রবের জন্য এখানে কোনো অবকাশ নেই।

২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। একটি পর্যায় হচ্ছে বর্তমান জগতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হবার পরের পর্যায়। এই আয়াতের দৃষ্টিতে এ তিনটি পর্যায়ই অতিক্রান্ত হবে এ যমীনের ওপর।

২৯. অর্থাৎ পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং হযরত মূসাকে (আ) প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও। ফেরাউনকে বুঝাবার জন্য হযরত মূসা (আ) যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মুজিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

৩০. যাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরায় বিস্তারিতভাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে একথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফেরাউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



"তোমার যাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও।" কোনো যাদুকর যাদুর জোরে কোনো দেশ জয় করে নিয়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে পূর্বে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং পরবর্তীকালেও ঘটতে দেখা যায়নি। ফেরাউনের নিজের দেশে শত শত যাদুকর ছিল, যারা যাদুর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেবার জন্য হাত পাততো। এ জন্য ফেরাউনের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা এবং অন্যদিকে তিনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা তার স্পষ্ট দিশেহারা হয়ে যাবার আলামত পেশ করে। আসলে হযরত মূসার ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং মুজিযাগুলো দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে, শুধুমাত্র তার সভাসদরাই নয় বরং তার সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই এ থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাই সে মিথ্যা, প্রতারণা ও হিংসার পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করলো। সে বললো, এসব মু'জিযা নয়, যাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক যাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সে বললোঃ হে জনতা! ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী গণ্য করছে। সে আরো বললো ঃ হে জনতা! সাবধান হয়ে যাও, এ ব্যক্তি নবী-টবী কিছুই নয়, এ আসলে ক্ষমতালোভী। এ ব্যক্তি ইউসুফের জামানার মতো আবার বনী ইসরাঈলকে এখানে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়ে দিতে এবং কিবতীদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ফেরাউন সত্যের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ টীকা, সূরা ইউনুস ৭৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, প্রতি যুগে ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের আহবায়কদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগই এনেছে যে, তারা ক্ষমতালোভী এবং এ উদ্দেশ্যেই সব কথা বলছে। এর দৃষ্টান্ত দেখুন সূরা আ'রাফের ১১০ ও ১৩৩, সূরা ইউনুসের ৭৮ এবং সূরা আল মু'মিনূনের ২৪ আয়াতসমূহে।

৩১. ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার যাদুকরদের লাঠি ও দড়িদড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের ওপর পড়ছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। হযরত মূসাও মনেপ্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোনো পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরকার নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোনো অবকাশই না থাকে।

৩২. ফেরাউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। তারা এর ফায়সালার সাথে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করছিল। সারা দেশে লোক পাঠানো হয়। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শি যাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয়। এভাবে বেশী বেশী লোক একত্র হয়ে যাবে এবং তারা স্বচক্ষে যাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। প্রকাশ্যে বলা হতে লাগলো আমাদের ধর্ম এখন যাদুকরদের তেলেসমাতির

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

*মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো,[৩৩] "দুর্ভাগ্যপীড়িতরা ! আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিয়ো না,[৩৪] অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রটনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।"*

*একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো[৩৫] শেষে কিছু লোক বললো,[৩৬] "এরা দুজন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য।[৩৭] আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো।[৩৮] ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে।"*

ওপর নির্ভর করছে। তারা জিতলে আমাদের ধর্ম বেঁচে যাবে, নয়তো মূসার ধর্ম চারদিকে ছেয়ে যাবেই। (দেখুন সূরা শূ'আরা ৩ রুকূ)

এ ক্ষেত্রে এ সত্যটিও সামনে থাকা দরকার যে, মিসরের রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর ধর্ম জনগণের ধর্ম থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। উভয়ের দেবতা ও মন্দির আলাদা ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এক ধরনের ছিল না। আর মৃত্যুপরের জীবনের ব্যাপারেও মিসরে যার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী, উভয়ের কার্যকর পদ্ধতি ও আদর্শিক পরিণামে অনেক বড় ফারাক পাওয়া যেতো। (দেখুন টয়েনবির লেখা A Study of History বইয়ের ৩১-৩২ পৃষ্ঠা) তাছাড়া মিসরে ইতিপূর্বে যে ধর্মীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার ফলে সেখানকার জনগণের মধ্যে এমন একাধিক গ্রুফ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা মুশরিকী ধর্মের তুলনায় একটি তাওহীদী ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছিল অথবা দিতে পারতো। যেমন বনী ইসরাঈল এবং তাদের স্বধর্মীয় লোকেরা। এরা জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ ছিল। এ ছাড়াও রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় ফেরাউন আমিনোফিস বা আখনাতুন (খৃঃ পৃঃ ১৩৭৭-১৩৬০) যে ধর্ম বিপ্লব অনুষ্ঠান করেছিলেন তারপর তখনো পুরো দেড়শ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। এ বিপ্লবের

www.banglabookpdf.blogspot.com



মাধ্যমে সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে একমাত্র একক উপাস্য "অতুন"কে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছিল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির জোরেই এ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তবুও সে তার কিছু না কিছু প্রভাব রেখে গিয়েছিল। এসব অবস্থা সামনে রাখলে সে সময় ফেরাউনের মনে যে ভীতি ও আশংকা জাগছিল তা পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে।

৩৩. হযরত মূসার এ সম্বোধন জনগণের প্রতি ছিল না। কারণ হযরত মূসা মু'জিযা দেখাচ্ছেন, না যাদু দেখাচ্ছেন—তখনো পর্যন্ত জনগণ এ ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কাজেই এ সম্বোধন ছিল ফেরাউন ও তার সভাসদদের প্রতি। কারণ তারাই তাঁকে যাদুকর গণ্য করছিল।

৩৪. অর্থাৎ এ মু'জিযাকে যাদু এবং এর নবীকে যাদুকর গণ্য করো না।

৩৫. এ থেকে জানা যায়, এরা মনে মনে নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করছিল। এরা জানতো হযরত মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয়। এরা প্রথম থেকেই দোটানা মনোভাব ও ভীতি সহকারে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তারপর যখন নির্ধারিত সময়ে হযরত মূসা তাদেরকে উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন তখন অকস্মাত তাদের দৃঢ় সংকল্প কেঁপে উঠলো। সম্ভবত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকবে যে, এত বড় উৎসবে, যেখানে সারা দেশের লোক জমা হয়ে গেছে সেখানে খোলা ময়দানে দিনের উজ্জ্বল আলোকে এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কি না। যদি এখানে আমরা পরাজিত হয়ে যাই এবং সবার সামনে যাদু ও মুজিযার ফারাক প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

৩৬. এ উক্তিকারীরা নিশ্চয়ই হবে ফেরাউনী পার্টির চরমপন্থী গ্রুপ, যারা যে কোনো উপায়ে হযরত মূসার বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিল। মনে হয়, দূরদর্শী অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা সামনের দিকে এক পা এগিয়ে যেতেও ইতস্তত করছিল। কিন্তু এ চরমপন্থী আবেগমুখর লোকেরা হয়তো বলেছিলঃ অনর্থক দূরের চিন্তা ত্যাগ করো এবং মন স্থির করে প্রতিযোগিতায় নেমে যাও।

৩৭. অর্থাৎ দুটি বিষয় ছিল তাদের মূল প্রতিপাদ্য। এক, যদি যাদুকররাও মূসার মতো লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ জন সমাবেশে মূসার যাদুকর হওয়া প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, তারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে শাসক শ্রেণীর মনে অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তাদেরকে এই মর্মে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসার বিজয় দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়া এবং তোমাদের আদর্শ (Ideal) জীবন যাপন পদ্ধতির অপমৃত্যুর নামান্তর। তারা দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ভয় দেখাচ্ছিল এই বলে যে, মূসা যদি দেশের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তোমাদের এ শিল্প, চারুকলা, সুন্দর ও মোহময় সংস্কৃতি এবং তোমাদের নারী স্বাধীনতা (যার চমৎকার নমুনা হযরত ইউসুফের জামানায় মিসরীয় ললনারা পেশ করেছিল) তথা এমন সবকিছু যেগুলো ছাড়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা যায় না, একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তো শুরু হবে নিছক "কাঠমোল্লাদের" রাজত্ব যা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۞ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۞ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۞

*যাদুকররা বললো,[৩৯] "হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমরাই আগে নিক্ষেপ করবো ?"*

*মূসা বললো, "না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।"*

*অকস্মাত তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়িদড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো[৪০] এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলে[৪১] আমি বললাম, "ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে।*

৩৮. অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। এ সময় যদি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিযোগিতার সংগীন মুহূর্তে সাধারণ জনতার সামনে তোমাদের মধ্যে যদি এ ধরনের কানাকানি ও ইতস্তত ভাব চলতে থাকে তাহলে এখনই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে এবং লোকেরা মনে করতে থাকবে তোমাদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিত নও বরং সংশয় দোলায়িত চিত্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছো।

৩৯. মাঝখানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্ণিত হয়নি, যা থেকে জানা যায় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের ফলে ফেরাউনের দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং প্রতিযোগিতা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাদুকরদেরকে প্রকাশ্যে ময়দানে চলে আসার হুকুম দেয়া হয়।

৪০. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ

"যখন তারা নিজেদের তন্ত্রমন্ত্র ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো এবং তাদেরকে আতংকিত করে তুললো।"(১১৬ আয়াত)

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব শুধুমাত্র সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, হযরত মূসাও যাদু প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চোখই কেবল এটা অনুভব করেনি বরং তাঁর মস্তিষ্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও দড়িদড়া সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَاَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۖ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ۖ وَلَا یُفْلِحُ السّٰحِرُ حَیْثُ اَتٰی ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰی ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۖ اِنَّهٗ لَكَبِیْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَیْدِیَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَیُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰی ﴿٧١﴾

*ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যাকিছু আছে, এখনি এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে,[৪২] এরা যাকিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না।" শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকরকে সিজদাবনত করে দেয়া হলো[৪৩] এবং তারা বলে উঠলো ঃ "আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে।"[৪৪]*

*ফেরাউন বললো, "তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই ? দেখছি, এ তোমাদের গুরু, এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল।[৪৫] এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি[৪৬] এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলিবিদ্ধ করছি[৪৭] এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দুজনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।"[৪৮] (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে।)*

৪১. মনে হচ্ছে, যখনই হযরত মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো" শব্দ বের হয়েছে তখনই যাদুকররা অকস্মাত নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়াগুলো তাঁর দিকে ফিঁকে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিলবিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত মূসা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশংকার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোনো অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় হযরত মূসা স্বাভাবিকভাবে এ আশংকাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এখানে একটি কথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। কুরআন এখানে একথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, নবীও যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। যদিও যাদুকর তাঁর নবুওয়াত কেড়ে নেবার

www.banglabookpdf.blogspot.com



অথবা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কিংবা যাদুর প্রভাবে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার অবশ্য করতে পারে। এ থেকে যারা হাদীসগ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়ার ঘটনাবলী পাঠ করে শুধুমাত্র এ রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে থাকেন, তাদের চিন্তাধারার গলদও সামনে এসে যাবে।

৪২. হতে পারে, মু'জিযার মাধ্যমে যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা সামনের যেসব লাঠি ও দড়িদড়া সাপের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলোকে গিলে ফেলেছিল। কিন্তু এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেসব শব্দের সাহায্যে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে বাহ্যত অনুমিত হয় যে, এ অজগরটি লাঠি ও দড়িগুলো গিলে ফেলেনি বরং যে যাদুর প্রভাবে সেগুলো সাপ বলে মনে হচ্ছিল সে প্রভাবটিই নষ্ট করে দিয়েছিল। সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

"যে মিথ্যা তারা তৈরী করছিল তাকে সে গিলে ফেলছিল।" আর এখানে এ শব্দাবলী হচ্ছে ঃ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا "সে গিলে ফেলবে তা, যা তারা তৈরী করে রেখেছে।" একথা স্পষ্ট যে, তাদের মিথ্যা ও কৃত্রিমতা তাদের লাঠি ও দড়িদড়া ছিল না বরং তা ছিল তাদের যাদু, যার বদৌলতে সেগুলোকে সাপের মতো দেখা যাচ্ছিল। তাই আমাদের মতে এ অজগরটি যেদিকেই গেছে সেদিকেই লাঠি ও দড়িগুলো গিলে নিয়ে এমনভাবে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে যার ফলে প্রত্যেকটি লাঠি ও দড়ি স্ব স্ব স্থানে পড়ে রয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ মূসার লাঠির কৃতিত্ব দেখার সাথে সাথেই তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এটি নিশ্চিতভাবেই মু'জিযা, যাদু কোনোক্রমেই নয়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

৪৪. এর মানে হচ্ছে সেখানে সবাই জানতো কিসের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সমগ্র জনসমাবেশে একজনও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো না যে, মূসার ও যাদুকরদের কলাকৌশলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং কার কৌশল শক্তিশালী সেটিই এখন দেখার বিষয়। সবাই জানতো, একদিকে মূসা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং নিজের নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ দাবী করছেন যে, তাঁর লাঠি অলৌকিকভাবে অজগরে পরিণত হয়। অন্যদিকে যাদুকরদেরকে জনসমক্ষে আহ্বান করে ফেরাউন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, লাঠির অজগরে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কর্ম নয় বরং নিছক যাদুর তেলেসমাতি। অন্যকথায়, সেখানে ফেরাউন ও যাদুকর এবং সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য অবগত ছিল। কাজেই সেখানে এ মর্মে পরীক্ষা চলছিল যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদুর পর্যায়ভুক্ত, না রব্বুল আলামীনের অসীম কোনো ক্ষমতা ছাড়া অন্য ক্ষমতার সাহায্যে যে মু'জিযা দেখানো যেতে পারে না তার পর্যায়ভুক্ত ? এ কারণে যাদুকররা নিজেদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখে

www.banglabookpdf.blogspot.com



একথা বলেনি, "আমরা মেনে নিলাম, মূসা আমাদের চাইতে বড় যাদুকর।" বরং সংগে সংগেই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মূসা যথার্থই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাচ্চা পয়গম্বর। তারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমরা সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, যার পয়গম্বর হিসেবে মূসা ও হারুন এসেছেন।

এ থেকে সাধারণ জন সমাবেশে এ পরাজয়ের কি প্রভাব পড়ে থাকবে এবং সারা দেশবাসী এর দ্বারা কি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ফেরাউন দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় মেলায় এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল এ আশায় যে, মিসরের সব এলাকা থেকে আগত লোকেরা স্বচক্ষে দেখে নেবে লাঠি দিয়ে সাপ তৈরি করা মূসা একার কোনো অভিনব কৃতিত্ব নয়, প্রত্যেক যাদুকরই এটা করতে পারে। ফলে মূসার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু তার এ কৌশলের ফাঁদে সে নিজেই আটকে গেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত লোকদের সামনে যাদুকররাই একযোগে একথার সত্যতা প্রকাশ করেছে যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়, তা হচ্ছে মূলত মু'জিযা। কেবলমাত্র আল্লাহর নবীগণই এ মু'জিযা দেখাতে পারেন।

৪৫. সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا .

"এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা রাজধানীতে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।"

এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগসাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের চাঁই ও গুরু। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর যাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করবে।

৪৬. অর্থাৎ একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা।

৪৭. শূলিবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি এ কাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার ওপর একটি তখ্‌তা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তখ্‌তার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখ্‌তার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলিদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

৪৮. এটা ছিল হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য ফেরাউনের সর্বশেষ চাল। সে যাদুকরদেরকে ভয়াবহতম শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, সত্যি তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে গোপন যোগসাজশ

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

*যাদুকররা জবাব দিল, "সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না।[৪৯] তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো। আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদুবৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।"—প্রকৃতপক্ষে[৫০] যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাযির হবে তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে।[৫১] আর যারা তার সামনে মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে হাযির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা, চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির যে পবিত্রতা অবলম্বন করে।*

ছিল এবং তারা তাঁর সাথে মিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু যাদুকরদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠা তার এ চাল উল্টে দিল। তারা এ ভয়ংকর শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে একথা নিশ্চতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নিছক হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, তারা সাচ্চা দিলে মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৪ রুকূ'

*আমি[৫২] মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও।[৫৩] কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না।*

*পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল।[৫৪] ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোনো সঠিক পথ দেখায়নি।[৫৫]*

৪৯. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "আমাদের সামনে যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসে গেছে এবং যে সত্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার মোকাবিলায় আমরা কোনোক্রমেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।"

৫০. যাদুকরদের উক্তির সাথে এটা আল্লাহর বাড়তি উক্তি। বক্তব্যের ধরন থেকেই একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এ বাক্য যাদুকরদের উক্তির অংশ নয়।

৫১. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। পুরোপুরি মৃত্যু হবে না। যার ফলে তার কষ্ট ও বিপদের সমাপ্তি সূচিত হবে না। আবার জীবনকে মৃত্যুর ওপর প্রাধান্য দেবার মতো জীবনের কোনো আনন্দও লাভ করবে না। জীবনের প্রতি বিরূপ হবে কিন্তু মৃত্যু লাভ করবে না। মরতে চাইবে কিন্তু মরতে পারবে না। কুরআন মজীদে জাহান্নামের আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অবস্থাটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। এর কল্পনায়ও হৃদয়-মন কেঁপে ওঠে।

৫২. এরপর দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থানকালে যা কিছু ঘটেছিল সেসব আলোচনা মাঝখানে বাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনাবলী বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আ'রাফ ১৫-১৬, সূরা ইউনুস ৯, সূরা মু'মিন ৩-৫ এবং সূরা যুখরুফ ৫ রুকূ' দেখুন।

৫৩. এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ রাতে সমস্ত ইসরাঈলী ও অইসরাঈলী মুসলমানদের

www.banglabookpdf.blogspot.com



(যাদের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক 'আমার বান্দাদের' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) মিসরের সকল এলাকা থেকে হিজরত করে বের হয়ে পড়ার কথা ছিল। তারা সবাই একটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে একটি কাফেলার আকারে রওয়ানা হলো। এ সময় সুয়েজ খালের অস্তিত্ব ছিল না। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এলাকাটাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে এলাকার সকল পথেই ছিল সেনানিবাস। ফলে সেখান দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। তাই হযরত মূসা লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। সম্ভবত তাঁর পরিকল্পনা ছিল সাগরের তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে সিনাই উপদ্বীপের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু সেদিক থেকে ফেরাউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌঁছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরেই উপস্থিত হয়েছিল। সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের কাফেলা ফেরাউনের সেনাদল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এমনি সময় মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে হুকুম দিলেন اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ। "সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।"

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ

"তখন সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরো একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।"

আর মাঝখান দিয়ে শুধু কাফেলার পার হয়ে যাবার পথ তৈরি হয়ে গেলো না বরং উপরের আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী মাঝখানের এ অংশ শুকিয়ে খটখটে সড়কের আকার ধারণ করলো। এটি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জিযার বর্ণনা । এ থেকে যারা একথা বলে থাকেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বা জোয়ার ভাটার ফলে সমুদ্রের পানি সরে গিয়েছিল তাদের কথার গলদ সহজেই ধরা পড়ে। কারণ এভাবে যে পানি সরে যায় তা দু'দিকে পর্বত শৃংগের মতো খাড়া হয়ে থাকে না এবং মাঝখানের পানি বিহীন অংশ শুকিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায় না। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা শূ'আরা ৪৭ টীকা দেখুন।)

৫৪. সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ সমুদ্রের বুকে তৈরি হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। (৬৩-৬৪ আয়াত) এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফেরাউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল। (৫০ আয়াত) অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোনো ইলাহ নেই সেই ইলাহ ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলমানদের অন্তরভুক্ত।"

কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলো ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ـ

"এখন ঈমান আনছো ? আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরমানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ, আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।"(৯০-৯২ আয়াত)

৫৫. অতি সূক্ষ্মভাবে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এই মর্মে যে, তোমাদের সরদার ও নেতারাও তোমাদের সে একই পথে নিয়ে যাচ্ছে যেপথে ফেরাউন তার জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও যে, এটা সঠিক পথ নির্দেশনা ছিল না।

এ কাহিনী শেষ করতে গিয়ে মনে হয় বাইবেলের বর্ণনাবলীও পর্যালোচনা করা দরকার। এভাবে যারা বলে থাকে কুরআনের এ কাহিনী বনী ইসরাঈলের থেকে নকল করা হয়েছে তাদের মিথ্যার হাটে হাড়ি ভেঙে যাবে। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে (Exodus) এ কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তার নিম্নোক্ত অংশগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

এক ঃ ৪ অধ্যায়ের ২-৫ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ লাঠির মু'জিযা হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। আবার ১৭ শ্লোকে তাঁকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "আর তুমি এ যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বারাই তোমাকে সেই সকল চিহ্ন-কার্য করিতে হইবে।" কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে জানা গেল না কেমন করে এ লাঠি হযরত হারুনের হাতে চলে গেলো এবং তিনিই এর সাহায্যে মু'জিযা দেখাতে থাকলেন। ৭ অধ্যায় থেকে নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অনবরত হযরত হারুনকেই লাঠির মু'জিযা দেখাতে দেখি।

দুই ঃ ৫ অধ্যায়ে ফেরাউনের সাথে হযরত মূসার প্রথম সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহর একত্ব ও রুবুবিয়াত সম্পর্কে হযরত মূসা ও ফেরাউনের মধ্যে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আদতে তার কোনো উল্লেখই নেই। ফেরাউন বললো; "সদা প্রভূ কে যে, আমি তাহার কথা শুনিয়া ইসরাঈলকে ছাড়িয়া দিব ? আমি সদা প্রভুকে জানি না।" কিন্তু মূসা ও হারুন এর এছাড়া আর কোনো জবাব দিলেন না, "ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।"(৫ ঃ ২-৩)

তিন ঃ যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার সমগ্র কাহিনী নিচের মাত্র এই ক'টি বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোনকে কহিলেন, ফরৌন যখন তোমাদিগকে বলে, তোমরা আপনাদের পক্ষে কোনো অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি হারোনকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌনের সামনে নিক্ষেপ কর, তাহাতে তাহা সর্প হইবে। তখন মোশি ও হারোন ফেরাউনের নিকট গিয়া সদা প্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, হারোন ফরৌনের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে

www.banglabookpdf.blogspot.com



তাহা সর্প হইল। তখন ফরৌনও বিদ্বানদিগকে ও গুণীদিগকে ডাক দিলেন, তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াবলে সেই রূপ করিল। ফলত তাহারা আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল, কিন্তু হারোনের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল।" (৭ ঃ ৮-১২)

কুরআনের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। মূল কাহিনীর সমগ্র প্রাণশক্তি কি মারাত্মকভাবে এখানে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উৎসবের দিন খোলা ময়দানে যথারীতি চ্যালেঞ্জের পর প্রতিযোগিতা হওয়া এবং তারপর পরাজয়ের পর যাদুকরদের ঈমান আনা ছিল মূলত এ কাহিনীর প্রাণ। কিন্তু এখানে তার কোনো উল্লেখই করা হয়নি।

চার ঃ কুরআন বলছে, বনী ইসরাঈলদের মুক্তি ও স্বাধীনতাই ছিল হযরত মূসার দাবী। বাইবেল বলছে, তাঁর দাবী কেবল এতটুকুই ছিল ঃ "আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ৩)

পাঁচ ঃ মিসর থেকে বের হওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ১১ থেকে ১৪ অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত রূপও আমরা দেখতে পাই। আবার এই সংগে অনেকগুলো অদ্ভুত কথাও জানা যায়। যেমন ১৪ অধ্যায়ের ১৫-১৬ শ্লোকে হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে ঃ "তুমি আপন যষ্টি (জি হাঁ, এখন যষ্টি হযরত হারুনের হাত থেকে নিয়ে হযরত মূসার হাতে দেয়া হয়েছে) তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর ; তাহাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু সামনের দিকে গিয়ে ২১-২২ শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ "মোশি (মূসা) সমুদ্রের উপর আপন হস্ত বিস্তার করিলেন তাহাতে সদা প্রভু সেই সমস্ত রাত্রি ব্যাপি প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল।" বুঝতে পারা গেল না যে, এটা মু'জিযা ছিল, না ছিল প্রাকৃতিক ঘটনা ? যদি মু'জিযা থেকে থাকে তাহলে তা লাঠির আঘাতেই সৃষ্ট হয়ে থাকবে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে। আর যদি সত্যি প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে পূর্বীয় বায়ু সমুদ্রকে মাঝখান থেকে ফেড়ে পানিকে দু'দিকে দেয়ালের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং মাঝখানে শুকনো পথ বানিয়ে দিয়েছে, এটা তো দস্তুরমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাতাস কি কখনো এমনি ধরনের কোনো আযব কাণ্ড ঘটিয়েছে ?

তালমূদের বর্ণনা বাইবেল থেকে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন এবং কুরআনের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু উভয়ের মোকাবিলা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এক জায়গা সরাসরি অহী জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং অন্য জায়গায় শত শত বছরের জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত বর্ণনাই ঘটনার রূপ নিয়েছে। যার ফলে তা যথেষ্ট বিকৃত হয়েছে। দেখুন ঃ The talmud Selcsction, H. Polano, pp, 150-54

www.banglabookpdf.blogspot.com



يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾

*হে বনী ইসরাঈল![৫৬] আমি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং তূরের ডান পাশে[৫৭] তোমাদের উপস্থিতির জন্য সময় নির্ধারণ করেছি[৫৮] আর তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছি[৫৯]—খাও আমার দেয়া পবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় তোমাদের ওপর আমার গযব আপতিত হবে। আর যার ওপর আমার গযব আপতিত হয়েছে তার পতন অবধারিত। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল।[৬০]*

৫৬. মাঝখানে সমুদ্র পার হওয়া থেকে নিয়ে সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা বলা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, মিসর থেকে বের হয়েই সিনাই উপদ্বীপে একটি মন্দির দেখে বনী ইসরাঈল নিজেদের জন্য একজন কৃত্রিম খোদার দাবী করে বসেছিল। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৯৮ টীকা)

৫৭. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের পূর্ব পাদদেশে।

৫৮. সূরা বাকারার ৬ রুকূ' ও সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে বলা হয়েছে, আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে শরীয়াতের নির্দেশনা দেবার জন্য চল্লিশ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। এর পর মূসা আলাইহিস সালামকে পাথরের ফলকে লিখিত বিধান দেয়া হয়েছিল।

৫৯. মান্না ও সাল্ওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বাকারাহ ৭৩ ও সূরা আ'রাফ ১১৯ টীকা। বাইবেলের বর্ণনা মতে মিসর থেকে বের হবার পর যখন বনী ইসরাঈল সীন মরুভূমিতে ইলীম ও সীনাইর মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং মজুদ খাদ্য খতম হয়ে গিয়ে অনাহার অর্ধাহারের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই মান্না ও সালওয়ার অবতরণ শুরু হয় এবং ফিলিস্তিনের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত পুরো চল্লিশ বছর ধরে এ ধারাবাহিক কার্যক্রম চলতে থাকে। (যাত্রা পুস্তক ১৬ অধ্যায়, গণনা পুস্তক ১১ : ৭-৯, যিহোশূয় ৫ : ১২) যাত্রা পুস্তকে মান্না ও সালওয়ার নিম্নোক্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে :

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلٰٓى أَثَرِىْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسٰٓى إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾

*আর[৬১] কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা ?[৬২]*

*সে বললো, "তারা তো ব্যস আমার পেছনে এসেই যাচ্ছে। আমি দ্রুত তোমার সামনে এসে গেছি হে আমার রব! যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।"*

*তিনি বললেন, "ভালো কথা, তাহলে শোনো, আমি তোমার পেছনে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী[৬৩] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"*

*ভীষণ ক্রোধ ও মর্মজ্বালা নিয়ে মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি ?[৬৪] তোমাদের কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে ?[৬৫] অথবা তোমরা নিজেদের রবের গযবই নিজেদের উপর আনতে চাচ্ছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে ?"[৬৬]*

"পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবির স্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে দেখ ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তু বিশেষ প্রান্তরের উপর পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না।" (১৬ ঃ ১৩-১৫)

"আর ইস্রায়েল কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্ল বর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।"(১৬ ঃ ৩১)

গণনা পুস্তকে আরো বেশী বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতায় পিষিয়া কিংবা উখলিতে চূর্ণ করিয়া বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্দারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত ; তৈলপক্ক পিষ্টকের

www.banglabookpdf.blogspot.com



ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িল ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।" (১১ ঃ ৮-৯)

এটাও ছিল একটি মু'জিযা। কারণ চল্লিশ বছর পরে বনী ইসরাঈল যখন খাদ্যের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ লাভ করলো তখন খাদ্য সরবরাহের এ ধারাটি বন্ধ করে দেয়া হলো। এখন ঐ এলাকায় বাবুই পাখির প্রাচুর্য নেই এবং মান্নাও কোথাও পাওয়া যায় না। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈল যে এলাকায় চল্লিশ বছর মরুচারী জীবন যাপন করেছিল গবেষক ও অনুসন্ধানকারীরা সেই সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। কোথাও তারা মান্নার সাক্ষাত পাননি। তবে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে বোকা বানাবার জন্য অবশ্যি মান্নার হালুয়া বিক্রি করে থাকে।

৬০. অর্থাৎ মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শির্‌ক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও রসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিন, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের বিধান অনুযায়ী ভালো কাজ করা, চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া।

৬১. এই মাত্র উপরে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখান থেকে তার সাথে আলোচনা সম্পৃক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তূর পাহাড়ের ডান দিকে অবস্থান করো এবং চল্লিশ দিনের মেয়াদ শেষ হলে তোমাদের নির্দেশনামা দেয়া হবে।

৬২. এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে হযরত মূসা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশের যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল। সেখানে তখনো কাফেলা পৌঁছুতে পারেনি। ততক্ষণ হযরত মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আ'রাফের ১৭ রুকূ'তে। হযরত মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর একথা বলা যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের ওপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুড়ো করে দেয়া এবং হযরত মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, আর তারপর পাথরের তখতিতে লেখা বিধান লাভ করা এসব সেই সময়ের ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হচ্ছে। একটি জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা কিভাবে হয় এবং আল্লাহর নবী এ ফিতনাটি দেখে কেমন অস্থির হয়ে পড়েন, মক্কার কাফেরদেরকে একথা জানানোই এ বর্ণনার উদ্দেশ্য।

৬৩. এটা ঐ ব্যক্তির নাম নয়। বরং শব্দের শেষে সম্বন্ধসূচক ইয়া (ى) ব্যবহারের সুস্পষ্ট আলামত থেকে একথা জানা যায় যে, এটা গোত্র, বংশ বা স্থানের সাথে সম্পর্কিত কোনো শব্দ। তারপর আবার কুরআন যেভাবে আসসামেরী বলে তার উল্লেখ করছে তা থেকে একথাও অনুমান করা যায় যে, সেসময় সামেরী গোত্র, বংশ বা স্থানের বহু লোক ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। কুরআনের এ জায়গার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে

www.banglabookpdf.blogspot.com



বেশী কিছু বর্ণনার দরকার নেই। কিন্তু এ জায়গায় যা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীরা বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপত্তি উথাপন করেছেন। তারা বলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এটা কুরআন রচয়িতার মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ এ ঘটনার কয়েকশ বছর পর খৃষ্টপূর্ব ৯২৫ অব্দের কাছাকাছি সময় ইসরাঈল সাম্রাজ্যের রাজধানী "সামেরীয়া" নির্মিত হয়। তারপর এরও কয়েকশ বছর পর ইসরাঈলী ও অইসরাঈলীদের সমন্বয়ে শংকর প্রজন্মের উদ্ভব হয়, যারা "সামেরী" নামে পরিচিত হয়। তাদের মতে এই সামেরীদের মধ্যে অন্যান্য মুশরিকী বিদআতের সাথে সাথে সোনালী বাছুর পূজার রেওয়াজও ছিল এবং ইহুদীদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে নিয়ে থাকবেন। তাই তিনি একে নিয়ে হযরত মূসার যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং এ কাহিনী তৈরি করেছেন যে, সেখানে সোনার বাছুর পূজার প্রচলনকারী সামেরী নামে এক ব্যক্তি ছিল। এ ধরনের কথা এরা হামানের ব্যাপারেও বলেছে। কুরআন এই হামানকে ফেরাউনের মন্ত্রী হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদরা তাকে ইরানের বাদশাহ আখসোয়ার্সের সভাসদ ও উমরাহ "হামান" এর সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, এটা কুরআন রচয়িতার অজ্ঞতার আর একটা প্রমাণ। সম্ভবত এ জ্ঞান ও গবেষণার দাবীদারদের ধারণা প্রাচীন যুগে এক নামের একজন লোক, একটি গোত্র অথবা একটি স্থানই হতো এবং এক নামের দু'জন লোক, গোত্র বা দুটি স্থান হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ প্রাচীনকালের একটি অতি পরিচিত জাতি ছিল সুমেরী। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ইরাক ও তার আশপাশের এলাকায় এ জাতিটি বসবাস করতো আর এ জাতির বা এর কোনো শাখার লোকদেরকে মিসরে সামেরী বলা হতে পারে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর এই সামেরীয়ার মূলের দিকেও নজর দিন। এরি সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই তো পরবর্তীকালে উত্তর ফিলিস্তীনের লোকদেরকে সামেরী বলা হতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মতে ইসরাঈল রাজ্যের শাসক উমরী "সামর" (বা শেমর) নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পাহাড় কিনেছিলেন যার ওপর পরে তিনি নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু পাহাড়ের সাবেক মালিকের নাম সামর ছিল তাই এ শহরের নাম রাখা হয় সামেরী (বা শামরিয়া)। (১-রাজাবলী ১৬-২৪) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়,সামেরীয়ার অস্তিত্বলাভের পূর্বে "সামর" নামক লোকের অস্তিত্ব ছিল এবং তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে তার বংশ বা গোত্রের নাম সামেরী এবং স্থানের নাম সামেরীয়া হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর ছিল।

৬৪. এর অনুবাদ "ভালো ওয়াদা করেননি"ও হতে পারে। মূল ইবারতের যে অনুবাদ আমি করেছি তার অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিসর থেকে বের করেছেন। দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি ? দ্বিতীয় অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরীয়াত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোনো কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا
يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

*তারা জবাব দিল, "আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা ভংগ করিনি। ব্যাপার হলো, লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।"[৬৭]—তারপর[৬৮] এভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেললো। এবং তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো, যার মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা বলে উঠলো, "এ-ই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, মূসা একে ভুলে গিয়েছে।" তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না ?*

৬৫. দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশী সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো ?" প্রথম অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এর পর কি অনেক বেশী সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে ? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো ? দ্বিতীয় অনুবাদের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোনো প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো।

৬৬. প্রত্যেক জাতি তার নবীর সাথে যে ওয়াদা করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এ ওয়াদা হচ্ছেঃ তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর দেয়া নির্দেশের ওপর অবিচল থাকা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী না করা।

৬৭. যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুড়ে দিয়েছিলাম। বাছুর তৈরী করার নিয়ত আমাদের ছিল না বা তা দিয়ে কি করা হবে তাও আমাদের জানা ছিল না। এরপর যা কিছু ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছি।

"লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম"-এ বাক্যের সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা মিসরের রীতি অনুযায়ী যেসব ভারী

www.banglabookpdf.blogspot.com



ভারী গহনা পরেছিল তা এ মরুচারী জীবনে আমাদের জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছিল। এ বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবো এ চিন্তায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী এ গহনাগুলো মিসর ত্যাগ করার সময় প্রত্যেক ইসরাঈলী নারী ও পুরুষ তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়েছিল। এভাবে তারা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে লুট করে রাতারাতি হিজরত করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ইসরাঈলী নিজেই এ কাজে ব্রতী হয়েছিল, এ নৈতিক কর্মকাণ্ডটি শুধুমাত্র এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এ মহত কর্মটি আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তাদেরকে শিখিয়েছিলেন এবং নবীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ নিজেই। দেখুন বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এ ব্যাপারে কি বলে ঃ

> "ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, ....... তুমি যাও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, ......... তোমরা যাত্রাকালে রিক্তহস্তে যাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যলংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে ; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে, এই রূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।" (৩ ঃ ১৪-২২)

> "আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, ..... তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যলংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। (১১ ঃ ১-৩)

> "আর ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য করিল, ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যলংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল ; আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়রা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।" (১২ ঃ ৩৫-৩৬)

দুঃখের বিষয় আমাদের মুফাসসিরগণও কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বর্ণনা চোখবন্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের এ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে যে, অলংকারের এ বোঝা আসলে ছিল লুটের বোঝা।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ "আমরা স্রেফ সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, যখন নিজেদের গহনাপাতির বোঝা বইতে বইতে লোকেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে তখন পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে যে, সবার গহনাপাতি এক জায়গায় জমা করা হোক এবং কার সোনা ও রূপা কি পরিমাণ আছে তা লিখে নেয়া হোক, তারপর এগুলো গালিয়ে ইট ও শলাকায় পরিণত করা হোক। এভাবে জাতির সামগ্রীক মালপত্রের সাথে গাধা ও গরুর পিঠে এগুলো উঠিয়ে দেয়া যাবে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় অলংকার এনে অলংকারের স্তুপের ওপর নিক্ষেপ করে গিয়ে থাকবে।

৬৮. এখান থেকে এ প্যারার শেষ ইবারত পর্যন্ত চিন্তা করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, জাতির জবাব "ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী এ বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন। এ থেকে যে আসল ঘটনা জানা যায় তা হচ্ছে এই

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۞ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۞ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۞ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۞

*৫ রুকূ'*

*(মূসার আসার) আগেই হারুন তাদেরকে বলেছিল, "হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও।" কিন্তু তারা তাকে বলে দিল, "মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো।"*[৬৯]

*মূসা (তার সম্প্রদায়কে ধমকাবার পর হারুনের দিকে ফিরে) বললো, "হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো?"*[৭০]

*হারুন জবাব দিল, "হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না।*[৭১] *আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।"*[৭২]

যে; আসন্ন ফিতনা সম্পর্কে বেখবর হয়ে লোকেরা যার যার গহনাপাতি এনে স্তুপীকৃত করে চলেছে এবং সামেরী সাহেবও তাদের মধ্যে শামিল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অলংকার গালাবার দায়িত্ব সামেরী সাহেব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন এবং এমন কিছু জালিয়াতি করেন যার ফলে ইট বা শলাকা তৈরি করার পরিবর্তে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি হয়ে আসে। তার মুখ থেকে গরুর মতো হাম্বা রব বের হতো। এভাবে সামেরী জাতিকে প্রতারিত করে। তার কথা হচ্ছে আমি তো শুধু সোনা গালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্য থেকে তোমাদের এ দেবতা নিজেই স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

৬৯. বাইবেল এর বিপরীত হযরত হারুনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, বাছুর বানানো এবং তাকে উপাস্য বানানোর মহা পাপ তিনিই করেছিলেন ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



"পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠুন আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিল। তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন ; এবং একটি ঢালা গো-বৎস নির্মাণ করিলেন, তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এ তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদী নির্মাণ করিলেন এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হইবে।"

(যাত্রা পুস্তক ৩২ ঃ ১-৬)

বনী ইসরাঈলের সমাজে এ ভুল বর্ণনার খ্যাতিলাভের সম্ভাব্য কারণ এও হতে পারে যে, হয়তো সামেরীর নাম হারুনই ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা এই হারুনকে হারুন নবীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ খৃষ্টান মিশনারী ও পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা জোর দিয়ে একথাই বলতে চায় যে, এখানেও কুরআন নিশ্চয় ভুল করেছে। তাদের পাক-পবিত্র নবী-ই বাছুরকে ইলাহ বানিয়েছিলেন এবং তাঁর গাত্রাবরণ থেকে এ দাগটি তুলে দিয়ে কুরআন একটি উপকার করেনি বরং উল্টো অপরাধ করেছে। এ হচ্ছে তাদের হঠকারিতার অবস্থা। তবে তারা এটা দেখছেন না যে, এ একই অধ্যায়েই মাত্র কয়েক লাইন পরেই বাইবেল কিভাবে নিজেই নিজের ভুল বর্ণনার রহস্য ভেদ করছে। এ অধ্যায়ের শেষ দশটি শ্লোকে বাইবেল বর্ণনা করছে যে, হযরত মূসা (আ) এরপর লেবীর সন্তানদেরকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর এ হুকুম শুনালেন যে, যারা এ শিরকের মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেক মু'মিন নিজ হাতে নিজের যেসব ভাই, সাথী ও প্রতিবেশী গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করবে। এভাবে সেদিন তিন হাজার লোক নিহত হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত হারুনকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো ? যদি তিনিই এ অপরাধের মূল উদগাতা ও স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে এ গণহত্যা থেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা হলো ? লেবীর সন্তানরা কি তাহলে একথা বলতো না যে, হে মূসা! আমাদের তো হুকুম দিচ্ছো নিজেদের গুনাহগার ভাই, সাথী ও প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করার কিন্তু নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত উঠাচ্ছো না কেন, অথচ আসল গোনাহগার তো সে-ই ছিল ? সামনের দিকে গিয়ে আরো বলা হয়েছে, মূসা সদাপ্রভুর কাছে গিয়ে আবেদন জানান, এবার বনী ইসরাঈলের গোনাহ মাফ করে দেন, নয়তো তোমার কিতাব থেকে আমার নাম কেটে দাও। একথায় আল্লাহ জবাব দেন, "যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গোনাহ করেছে আমি তার নাম আমার কিতাব থেকে মুছে ফেলবো।" কিন্তু আমরা দেখছি, হযরত হারুনের নাম মুছে ফেলা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকে বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ অর্থাৎ বনী লেবীর নেতৃত্ব ও বায়তুল মাকদিসের সেবায়েতের দায়িত্ব দান করা হয়। (গণনা পুস্তক ১৮ ঃ ১-৭) বাইবেলের এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ কি তার নিজের পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতিবাদ ও কুরআনের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে না ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



৭০. হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হযরত হারুনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মূসা তাঁকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফে একে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

"আর মূসা (যাওয়ার সময়) নিজের ভাই হারুনকে বললো, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো এবং দেখো, সংশোধন করবে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করো না। (১৪২ আয়াত)

৭১. এ আয়াতগুলোর অনুবাদের সময় আমি এ বিষয়টি সামনে রেখেছি যে, হযরত মূসা ছোট ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন বড়। অন্যদিকে হযরত হারুন বড় ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন ছোট।

৭২. হযরত হারুনের জবাবের অর্থ কখনোই এই নয় যে, জাতির ঐক্যবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথে থাকার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং শিরকের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা তার এমন অনৈক্যের চেয়ে ভালো যার ভিত্তি গড়ে ওঠে হক ও বাতিলের বিরোধের ওপর। কোনো ব্যক্তি যদি এ আয়াতের এ অর্থ করে তাহলে সে কুরআন থেকে গোমরাহী গ্রহণ করবে। হযরত হারুনের পুরো কথাটা বুঝতে হলে এ আয়াতটিকে সূরা আ'রাফের ১৫০ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ز فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاۤءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

"হে আমার সহোদর ভাই ! এ লোকেরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি দুশমনদেরকে আমার প্রতি হাসবার সুযোগ দিয়ো না এবং ঐ জালেম দলের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।"

এখন এ উভয় আয়াত একত্র করে দেখলে যথার্থ ঘটনার এ ছবি সামনে আসে যে, হযরত হারুন লোকদেরকে এ গোমরাহী থেকে রুখবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে তিনি এই আশংকায় নীরব হয়ে যান যে, হযরত মূসার ফিরে আসার আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়ে যায় এবং তিনি পরে এসে এ অভিযোগ না করে বসেন যে, তোমার যখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না তখন তুমি পরিস্থিতিকে এতদূর গড়াতে দিলে কেন ? আমার আসার অপেক্ষা করলে না কেন ? সূরা আ'রাফের আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও একথাই প্রতিভাত হয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে উভয় ভাইয়ের একদল শত্রু ছিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِىُّ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ۝

*মূসা বললো, "আর হে সামেরী তোমার কি ব্যাপার ?"*

*সে জবাব দিল, "আমি এমন জিনিস দেখেছি যা এরা দেখেনি, কাজেই আমি রসূলের পদাংক থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছি এবং তা নিক্ষেপ করেছি, আমার মন আমাকে এমনি ধারাই কিছু বুঝিয়েছে।"৭৩*

৭৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি দলের পক্ষ থেকে অদ্ভুত ধরনের টানা হেঁচড়া করা হয়েছে।

একটি দলে আছেন প্রাচীন তাফসীরকারগণ এবং প্রাচীন প্রদ্ধতিতে তাফসীরকারীদের বৃহত্তম অংশ। তারা এর অর্থ বর্ণনা করেন, "সামেরী রসূল অর্থাৎ হযরত জিব্রীলকে যেতে দেখে নিয়েছিল এবং তাঁর পদাংক থেকে এক মুঠো মাটি উঠিয়ে নিয়েছিল। আর এই মাটি যখন বাছুরের মূর্তির মধ্যে রাখা হয়েছিল। তখন তার অলৌকিক মহিমায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ স্পন্দন এবং একটি জীবন্ত বাছুরের মতো হাম্বা রব তার মুখ থেকে বের হতে শুরু হয়েছিল।" অথচ সত্যিই যে এমনটি হয়েছিল তা অবশ্য কুরআন বলছে না। কুরআন স্রেফ এতটুকু বলছে যে, হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে সামেরী একথা বানিয়ে বলেছিল। এ অবস্থায় আমরা বুঝতে পারছি না, মুফাসসিরগণ কেমন করে একে একটি সত্য ঘটনা এবং কুরআন বর্ণিত যথার্থ সত্য মনে করে বসলেন।

দ্বিতীয় দলটি সামেরীর কথার অন্য একটি অর্থ করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামেরী আসলে বলেছিল, "আমি রসূল অর্থাৎ মূসার দীনের মধ্যে এমন দুর্বলতা দেখেছিলাম যা অন্যেরা দেখতে পায়নি। তাই আমি একদিক থেকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেছিলাম।" এ ব্যাখ্যাটি সম্ভবত সর্বপ্রথম করেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তারপর ইমাম রাযী একে নিজের তাফসীরে উদ্ধৃত করে এর প্রতি নিজের সমর্থন প্রকাশ করেন। বর্তমানে আধুনিক তাফসীরকারদের অধিকাংশই এ অর্থটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিন্তু তারা একথা ভুলে গেছেন যে, কুরআন ধাঁধা ও হেঁয়ালির ভাষায় নাযিল হয়নি বরং পরিষ্কার ও সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। একজন সাধারণ আরববাসী নিজের ভাষার প্রচলিত স্বাভাবিক বাগধারা অনুযায়ী এর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষার সাধারণ প্রচলিত বাকরীতি ও দৈনন্দিন কথোপকথনের শব্দাবলী সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তি কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, সামেরীর এ মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সহজ-সরল আরবী ভাষায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হবে যা এ আয়াতের তাফসীরকারগণ বলেছেন। অথবা একজন সাধারণ আরবীয় একথাগুলো শুনে কখনো এমন অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যা এ তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন। অভিধান গ্রন্থ থেকে কোনো একটি শব্দের এমন একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যা বিভিন্ন প্রবাদে ব্যবহৃত

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ
الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ اَعْرَضَ
عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

*মূসা বললো, "বেশ, তুই দূর হয়ে যা, এখন জীবনভর তুই শুধু একথাই বলতে থাকবি, 'আমাকে ছুঁয়ো না।'[৭৪] আর তোর জন্য জবাবদিহির একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে যা কখনোই তোর থেকে দূরে সরে যাবে না। আর দেখ, তোর এই ইলাহর প্রতি, যার পূজায় তুই মত্ত ছিলি, এখন আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেবো। হে লোকেরা ! এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, প্রত্যেক জিনিসের ওপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।"*

*হে মুহাম্মাদ![৭৫] এভাবে আমি অতীতে যা ঘটে গেছে তার অবস্থা তোমাকে শুনাই এবং আমি বিশেষ করে নিজের কাছ থেকে তোমাকে একটি 'যিকির' (উপদেশমালা) দান করেছি।[৭৬] যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কিয়ামতের দিন কঠিন গোনাহের বোঝা উঠাবে।*

হয়ে থাকে এবং তার মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থ নিয়ে এমন একটি বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া যেখানে একজন সাধারণ আরব কখনোই এ শব্দটিকে এ অর্থে ব্যবহার করে না—এটাতো ভাষাজ্ঞান হতে পারে না, তবে বাগাড়ম্বর হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি নেই। 'ফরহংগে আসেফীয়া' নামক উর্দু অভিধান খানি অথবা 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' হাতে নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি যথাক্রমে তাদের উর্দু ও ইংরেজী রচনাগুলোর মধ্যে এ ধরনের কৃতিত্ব ফলাতে থাকেন, তাহলে সম্ভবত নিজেদের কথার দু-চারটে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনেই তাদের লেখকরা চিৎকার করে উঠবেন। সাধারণত কুরআনের এ ধরনের ব্যাখ্যা এমন সময় করা হয় যখন এক ব্যক্তি কোনো আয়াতের সহজ সরল অর্থ দেখে নিজে নিজেই একথা মনে করে থাকে যে, এখানে তো আল্লাহ তা'আলা বড়ই অসাবধান হয়ে গেছেন, এসো আমি তাঁর কথা এমনভাবে পেশ করে দিই যার ফলে তাঁর ভুলের পরদা ঢেকে যাবে এবং তাঁর বক্তব্য নিয়ে লোকদের হাসাহাসি করার সুযোগ থাকবে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ বিকৃত চিন্তা পরিহার করে যে ব্যক্তিই এ বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি পড়বে সে সহজে বুঝতে পারবে যে, সামেরী ছিল একজন ফিতনাবাজ ব্যক্তি। সে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে ধোঁকা ও প্রতারণার একটি বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। সে কেবল একটি সোনার বাছুর তৈরি করে যে কোনো কৌশলে তার মধ্যে গো-বৎসের হাম্বা রব সৃষ্টি করে দেয়নি এবং সমগ্র জাতির অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রতারিত করেনি বরং সে আরো দুঃসাহসী হয়ে খোদ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকেও একটি প্রতারণাপূর্ণ গল্প শুনিয়ে দিল। সে দাবী করলো, আমি এমন কিছু দেখেছি যা অন্যেরা দেখেনি। সাথে সাথে এ গল্পও শুনিয়ে দিল যে, রসূলের পদাংকের এক মুঠো মাটিই এ কেরামতি দেখিয়েছে। রসূল বলে সে জিব্রীলকেও নির্দেশ করতে পারে, যেমন প্রাচীন তাফসীরকারগণ মনে করেছেন। কিন্তু যদি একথা মনে করা হয় যে, রসূল শব্দটি বলে সে হযরত মূসাকে নির্দেশ করেছে, তাহলে এটা তার আর একটা প্রতারণা। সে এভাবে হযরত মূসাকে মানসিক উৎকোচ দিতে চাচ্ছিল, যাতে তিনি এটাকে তাঁর নিজের পদাংকের অলৌকিকতা মনে করে গর্বিত হন এবং নিজের অন্যান্য কেরামতির প্রচারণার জন্য সামেরীর যোগ্যতাকে স্থায়ীভাবে কাজে লাগান। কুরআন এ সমগ্র ব্যাপারটিকে সামেরীর প্রতারণা হিসেবেই পেশ করছে, নিজের পক্ষ থেকে প্রকৃত ঘটনা হিসেবে পেশ করছে না। তাই এতে এমন দূষণীয় কিছু ঘটেনি যে, তা প্রক্ষালনের জন্য অভিধান গ্রন্থগুলোর সাহায্যে অযথা বাগাড়ম্বর করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। বরং পরবর্তী বাক্যগুলোতে হযরত মূসা যেভাবে তাকে ধিক্কার ও অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, তার বানানো এ প্রতারণাপূর্ণ গল্প শোনার সাথে সাথেই তিনি তা তার মুখের উপরে ছুড়ে মেরেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ শুধু এতটুকুই নয় যে, সারাজীবনের জন্য মানব সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে এবং তাকে অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হয়েছে বরং তার ওপর এ দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে নিজের অচ্ছুৎ হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে দেবে এবং দূর থেকেই লোকদেরকে এ মর্মে বলতে থাকবে, "আমি অচ্ছুৎ আমাকে ছুয়ো না।" বাইবেলের লেবীয় পুস্তকে কুষ্ঠরোগীর স্পর্শ থেকে লোকদের বাঁচাবার জন্য যে নিয়ম বাতলানো হয়েছে তার মধ্য থেকে একটি নিয়ম হচ্ছে এই ঃ

> "আর যে কুষ্ঠির ঘা হইয়াছে। তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তার মস্তক মুক্ত কেশ থাকিবে ও সে আপনার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি, অশুচি' এ শব্দ করিবে। যতদিন তাহার গাত্রে ঘা থাকিবে, ততদিন সে অশুচি থাকিবে ; সে অশুচি ; সে একাকী বাস করিবে, শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।" (১৩ ঃ ৪৫-৪৬)

এ থেকে অনুমিত হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করা হয়ে থাকবে অথবা তার জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকবে যে, শারীরিকভাবে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেভাবে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে নৈতিক কুষ্ঠে আক্রান্ত রোগীকেও মানুষদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে এবং এ ব্যক্তিও কুষ্ঠরোগীর মতো চিৎকার করে করে তার কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলতে থাকবে ঃ আমি অপবিত্র, আমাকে ছুঁয়ো না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

*আর এ ধরনের লোকেরা চিরকাল এ দুর্ভাগ্য পীড়িত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের দায়ভার) বড়ই কষ্টকর বোঝা হবে।[৭৭] সেদিন যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে[৭৮] এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো যে, তাদের চোখ (আতংকে) দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে।[৭৯] তারা পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি করবে, দুনিয়ায় বড়জোর তোমরা দশটা দিন অতিবাহিত করেছো"[৮০]—আমি[৮১] ভালোভাবেই জানি তারা কিসব কথা বলবে, (আমি এও জানি) সে সময় তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সতর্ক অনুমানকারী হবে সে বলবে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবনতো মাত্র একদিনের জীবন ছিল।*

৭৫. মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী খতম করে আবার ভাষণের মোড় সেদিকে ফিরে যাচ্ছে যা দিয়ে সূরার সূচনা হয়েছিল। সামনে এগিয়ে যাবার আগে আর একবার সূরার সেই প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পড়ে নিন .... যেগুলোর পর হঠাৎ হযরত মূসার কাহিনী শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে ভালোভাবে বুঝা যাবে, সূরার আসল আলোচ্য বিষয় কি, মাঝখানে মূসার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে কেন এবং কাহিনী খতম করে কিভাবে ভাষণটি তার মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে আসছে।

৭৬. অর্থাৎ এ সূরার প্রথমে যে কুরআনের কথা বলা হয়েছিল সেটা এমন কোনো বিষয় ছিল না যার মাধ্যমে তোমাদের কোনো অসম্ভব কাজে লিপ্ত করা বা তোমাদের ওপর অনর্থক একটা কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দেবার জন্য তা নাযিল করা হয়েছিল। সেটা তো ছিল একটা স্মারক ও উপদেশ (তাযকিরাহ) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে অন্তরে আল্লাহকে ভয় করে।

৭৭. এখানে প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উপদেশবাণী অর্থাৎ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তার বিধান ও পথ নির্দেশনা গ্রহণে অস্বীকার করবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। এর ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁকে প্রেরণকারী আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। তার এ নির্বুদ্ধিতা হবে তার নিজেরই সাথে শত্রুতারই নামান্তর। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির কাছে কুরআনের এ নসীহত পৌঁছে গেছে এবং সে এটা গ্রহণ করতে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে ও ইতস্তত করছে সে আখেরাতে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আয়াতের শব্দাবলী ব্যাপক অর্থ প্রকাশক। কোনো দেশ,

www.banglabookpdf.blogspot.com



জাতি ও সময়ের সাথে সেগুলো বিশেষভাবে সম্পর্কিত নয়। যতদিন এ কুরআন দুনিয়ায় থাকবে, যেখানে, যে দেশে এবং যে জাতি ও ব্যক্তির কাছে এটা পৌঁছে যাবে সেখানে তার জন্যে দুটোই পথ খোলা থাকবে। তৃতীয় কোনো পথ সেখানে থাকবে না। হয় একে মেনে নিয়ে এর আনুগত্য করতে হবে আর নয়তো একে অস্বীকার করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রথম পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি সামনের দিকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পথ অবলম্বনকারীদের পরিণতি এ আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে।

৭৮. সিংগা মানে রণভেরী, রণতুর্য। আজকাল এর বিকল্প হিসেবে বিউগল বলা যেতে পারে। সেনাদলকে একত্র ও বিক্ষিপ্ত করার এবং নির্দেশ দেবার জন্য বিউগল বাজানো হয়। আল্লাহ তাঁর বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন যা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ শব্দ ও পরিভাষাগুলো ব্যবহার করার মূল লক্ষ হচ্ছে আমাদের ধারণা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে আসল জিনিসের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। আমরা সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাজ্যের বিভিন্ন জিনিসকে হুবহু এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করবো এবং সেগুলোকে এসব সীমিত আকারের জিনিস মনে করে নেবো যেমন আমাদের জীবনে পাওয়া যায়, এটা কখনোই এর উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত লোকদের জমা করার এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করার জন্য এমন কোনো না কোনো জিনিস বাজানো বা কোনো কিছুতেই ফুঁক দিয়ে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করা হয় যা রণভেরী, রণতুর্য বা বিউগলের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন এমনি একটি জিনিসে ফুঁক দেয়া হবে (যা আমাদের বিউগলের মতো। একবার তাতে ফুঁক দেয়া হবে,) তখন সবাই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন সবাই জেগে উঠবে এবং পৃথিবীর সব দিক থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে আসতে থাকবে। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ১০৬ টীকা।)

৭৯. মূল শব্দ "যুরকান"। এটা হচ্ছে "আযরাক"-এর বহুবচন। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যারা 'আযরাক' বা সাদাটে নীলচে ভাব ধারণ করবে। কারণ ভয়ে ও আতংকে তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। আবার অন্য কিছু লোক এ শব্দকে "আযরাকুল আয়েন" বা নীল চক্ষুওয়ালার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন অত্যধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি থির হয়ে যাবে। যখন কারোর চোখ আলোহীন হয়ে পড়ে তখন তার চোখের মণি সাদা হয়ে যায়।

৮০. এর আরেকটি মানে এও হতে পারে, "মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তোমাদের বড় জোর দশ দিন অতিবাহিত হয়ে থাকবে।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থান থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজেদের দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কেও আন্দায করে নেবে যে, তা ছিল অতি সামান্য দিনের এবং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে সময়কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে সে সম্পর্কেও তাদের এ প্রায় একই ধরনের অনুমান হবে। কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ○

"আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে ? জবাব দেবে, একদিন বা দিনের এক অংশ থেকেছি, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"
(আল মু'মিনূন ঃ ১১২-১১৩)

অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُوْا يُوْفَكُوْنَ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ○

"আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা (মৃত অবস্থায়) এক ঘন্টার বেশী সময় পড়ে থাকিনি। এভাবে তারা দুনিয়ায়ও ধোঁকা খেতে থেকেছে। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী তোমরা তো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে থেকেছো এবং আজ সে পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।" (আর রূম ঃ ৫৫-৫৬)

এসব সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় দুনিয়ার জীবন ও আলমে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবন উভয়কে তারা সামান্য মনে করবে। দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে তারা একথা এজন্য বলবে যে, নিজেদের আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় একটি চিরন্তন জীবনে যখন তাদের চোখ মেলতে হবে এবং যখন তারা দেখবে এখানকার জন্য তারা কিছুই তৈরি করে আনেনি, তখন চরম আক্ষেপ ও হতাশার সাথে তারা নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে ফিরে দেখবে এবং দুঃখ করে বলতে থাকবে, হায় ! মাত্র দু'দিনের আনন্দ ও ভোগ বিলাসের লোভে আমরা চিরকালের জন্য নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলাম। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জীবনকাল তাদের কাছে সামান্য মনে হবে, কারণ মৃত্যুপরের জীবনকে তারা দুনিয়ায় অসম্ভব মনে করতো এবং কুরআন বর্ণিত পরকালীন জগতের ভূগোল কখনোই গুরুত্ব সহকারে তাদের কাছে গৃহীত হয়নি। এ ধারণা-কল্পনা নিয়েই তারা দুনিয়ার জীবনের সচেতন মুহূর্তগুলো নিশেষ করেছিল। আর এখন হঠাৎ চোখ মেলতেই সামনে দেখবে দ্বিতীয় জীবনের সূচনা। এ জীবনের শুরুতেই বিউগলের বিকট আওয়াজে নিজেদের দেখবে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যেতে। ভীষণ আতংকের মধ্যে এখন তারা মনে করতে থাকবে ওমুক হাসপাতালে বেহুশ হবার পর অথবা ওমুক জাহাজ থেকে সমুদ্রে ডুবে যাবার পর কিংবা অমুক স্থানে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কতটুকু সময়ই বা কেটে গেছে। তাদের মগজে একথা আসবেই না যে, দুনিয়ায় তারা মারা পড়েছিল এবং এখন সেই দ্বিতীয় জীবনটিই শুরু হয়েছে, যাকে তারা

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ
لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ
لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

৬ রুকূ'

*—এ লোকেরা[৮২] তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে ? বলো, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে তোমরা কোনো উঁচু নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।[৮৩]—সেদিন সবাই নকীবের আহ্বানে সোজা চলে আসবে, কেউ সামান্য দর্পিত ভংগীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না এবং করুণাময়ের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ[৮৪] ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না। সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করেন।[৮৫]—তিনি লোকদের সামনের পেছনের সব অবস্থা জানেন এবং অন্যেরা এর পুরো জ্ঞান রাখে না।[৮৬]*

একেবারে অর্থহীন ও অযৌক্তিক বলে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিতো। তাই তাদের প্রত্যেকেই একথা মনে করতে থাকবে, সম্ভবত আমি কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম এবং এখন এমন এক সময় আমার চেতনা ফিরে এসেছে অথবা ঘটনাক্রমে এমন এক জায়গায় আমি পৌঁছে গেছি যেখানে কোনো রকমের দুর্ঘটনার কারণে লোকেরা একদিকে দৌড়ে চলছে। এটাও অসম্ভব মনে হয় না যে, আজকাল যারা মরছে তারা কিয়ামতের শিংগার আওয়াজকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিমান আক্রমণের পূর্বের সতর্কতামূলক সাইরেন ধ্বনি বলে মনে করতে থাকবে।

৮১. এটি একটি প্রাসঙ্গিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে এর সাহায্যে শ্রোতাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রোতাদের মনে এ সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে সময় হাশরের ময়দানে ছুটে চলা লোকেরা চুপিসারে যে আলাপ করবে তা আজ এখানে কেমন করে বর্ণনা করা হচ্ছে ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



৮২. এটিও একটি প্রাসংগিক বাক্য। ভাষণের মাঝখানে কোনো শ্রোতার প্রশ্নের জবাবে এ বাক্যটি বলা হয়েছে। মনে হয় যখন এ সূরাটি একটি ঐশী ভাষণ হিসেবে শুনানো হচ্ছিল তখন কেউ বিদ্রূপ করার জন্য এ প্রশ্নটি উঠিয়েছিল যে, কিয়ামতের যে চিত্র আপনি আঁকছেন তাতে তো মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ার লোকেরা কোনো সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলতে থাকবে। তাহলে এ বিশালাকৃতির পাহাড়গুলো তখন কোথায় চলে যাবে ? এ প্রশ্নের সুযোগটি বুঝার জন্য যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল সেটি সামনে রাখতে হবে। মক্কা যে স্থানে অবস্থিত তার অবস্থা একটি জলধারের মতো, যার চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। প্রশ্নকারী এ পাহাড়গুলোর প্রতি ইংগিত করে একথা বলে থাকবে। অহীর ইশারায় উপস্থিত ক্ষেত্রে তখনই এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, এ পাহাড়গুলো ভেঙ্গে বালুকারাশির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে এবং সেগুলো ধূলোমাটির মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেয়া হবে যেখানে কোনো উঁচু-নীচু, ঢালু বা অসমতল জায়গা থাকবে না। তার অবস্থা এমন একটি পরিষ্কার বিছানার মতো হবে যাতে সামান্যতমও খাঁজ বা ভাঁজ থাকবে না।

৮৩. পরকালীন জগতে পৃথিবী যে নতুন রূপ নেবে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ "যখন পৃথিবী বিস্তৃত করে দেয়া হবে।" সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ "যখন সাগর চিরে ফেলা হবে।" এর অর্থ সম্ভবত এই হবে যে, সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমস্ত পানি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে চলে যাবে। সূরা তাকবীরে বলা হয়েছে ঃ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ। "যখন সমুদ্র ভরে দেয়া হবে বা সমান করে দেয়া হবে।" এখানে বলা হচ্ছে যে, পাহাড়গুলো ভেংগে গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। মনের পাতায় এর যে আকৃতি গড়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, পরকালীন দুনিয়ায় সমস্ত সমুদ্র ভরাট করে, পাহাড়গুলো ভেংগে উঁচু-নীচু সমান করে, বন-জংগল সাফ করে পুরোপুরি একটি বলের গাত্রাবরণের মতো সমান ও মসৃন করে দেয়া হবে। এ আকৃতি সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ। "এমন দিন যখন পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন কিছু করে দেয়া হবে।" এ আকৃতির পৃথিবীর ওপর হাশর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ সেখানে আদালত তথা ন্যায়বিচার কায়েম করবেন। তারপর সবশেষে তাকে যে আকৃতি দান করা হবে সূরা যুমারের ৭৪ আয়াতে তা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ০

অর্থাৎ মুত্তাকীরা "বলবে, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের দ্বারা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। কাজেই সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ থেকে জানা যায়, সবশেষে এ সমগ্র পৃথিবীটিকেই জান্নাতে পরিণত করা হবে এবং আল্লাহর মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল বান্দারা হবে এর উত্তরাধিকারী। সে সময় সারা পৃথিবী একটি দেশে পরিণত হবে। পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদী, মরুভূমি আজ পৃথিবীকে অসংখ্য দেশে বিভক্ত করে রেখেছে এবং এ সাথে বিশ্বমানবতাকেও বিভক্ত করে দিয়েছে। এগুলোর সেদিন কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। (উল্লেখ্য সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহও এ মত পোষণ করতেন যে, জান্নাত এ পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সূরা নাজম-এর عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى আয়াতের ব্যাখ্যা তারা এভাবে করেন যে, এখানে এমন জান্নাতের কথা বলা হয়েছে যেখানে এখন শহীদদের রূহ রাখা হয়।)

৮৪. মূলে 'হাম্‌স' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি পায়ের আওয়াজ, চপিচুপি কথা বলার আওয়াজ, উটের চলার আওয়াজ এবং আরো এ ধরনের হাল্‌কা আওয়াজের জন্য বলা হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া চুপিচুপি গুনগুন করে কথা বলার কোনো আওয়াজ শোনা যাবে না। চতুর্দিকে একটি ভয়ংকর ভীতিপ্রদ পরিবেশ বিরাজ করবে।

৮৫. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। একটি অনুবাদ আমরা অবলম্বন করেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না তবে যদি কারো পক্ষে করুণাময় এর অনুমতি দেন এবং তার জন্য কথা শুনতে রাজি হয়ে যান।" এখানে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উভয় অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলা তো দূরের কথা, টুঁশব্দটি করারও কারোর সাহস হবে না। আল্লাহ যাকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। এ দু'টি কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

"কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে ?"

(সূরা আল বাকারা ২৫৫ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ط لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

"সেদিন যখন রূহ ও ফেরেশতারা সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সংগত কথা বলবে।" (আন নাবা, ৩৮ আয়াত)

অন্যদিকে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

www.banglabookpdf.blogspot.com



"আর তারা কারোর সুপারিশ করে না সেই ব্যক্তির ছাড়া যার পক্ষে সুপারিশ শোনার জন্য (রহমান) রাজী হবেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।"

(সূরা আল আম্বিয়া, ২৮ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى -

"কত ফেরেশতা আকাশে আছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে লাগবে না, তবে একমাত্র তখন যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবার পর সুপারিশ করা হবে এবং এমন ব্যক্তির পক্ষে করা হবে যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।" (সূরা আন নাজম, ২৬ আয়াত)

৮৬. সুপারিশের প্রতি এ বিধি-নিষেধ আরোপিত কেন, এর কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতা, আম্বিয়া বা আউলিয়া যে-ই হোন না কেন কারো রেকর্ড সম্পর্কে এদের কারো কিছুই জানা নেই এবং জানার কোনো ক্ষমতাও এদের নেই। দুনিয়ায় কে কি করতো এবং আল্লাহর আদালতে কে কোন ধরনের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং কেমন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে এসেছে তাও কেউ জানে না। অপরদিকে আল্লাহ প্রত্যেকের অতীতের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড জানেন। তার বর্তমান ভূমিকাও তিনি জানেন। সে সৎ হলে কেমন ধরনের সৎ। অপরাধী হলে কোন্ পর্যায়ের অপরাধী। তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য কি না। সে কি পূর্ণ শাস্তিলাভের অধিকারী অথবা কম শাস্তির। এহেন অবস্থায় কেমন করে ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে তাদের ইচ্ছামতো যার পক্ষে যে কোনো ধরনের সুপারিশ তারা চায় তা করার জন্য তাদেরকে অবাধ অনুমতি দেয়া যেতে পারে ? একজন সাধারণ অফিসার তার নিজের ক্ষুদ্রতম বিভাগে যদি নিজের প্রত্যেকটি বন্ধু ও আত্মীয়ের সুপারিশ শুনতে শুরু করে দেন তাহলে মাত্র চারদিনেই সমগ্র বিভাগটিকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তার কাছ থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তাঁর দরবারে ব্যাপকভাবে সুপারিশ চলতে থাকবে এবং প্রত্যেক বুযর্গ সেখানে গিয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়ে আনবেন। অথচ তাদের কেউই যাদের সুপারিশ তারা করছেন তাদের কার্যকলাপ কেমন তা জানেন না। দুনিয়ায় যে কর্মকর্তা দায়িত্বের সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তার কর্মনীতি এ পর্যায়েরই হয়ে থাকে যে, যদি তার কোনো বন্ধু তার কোনো অধস্তন কর্মচারীর সুপারিশ নিয়ে আসে তাহলে সে তাকে বলে, আপনি জানেন না এ ব্যক্তি কত বড় ফাঁকিবাজ, দায়িত্বহীন, ঘুষখোর ও অত্যাচারী। আমি এর যাবতীয় কীর্তিকলাপের খবর রাখি। কাজেই আপনি মেহেরবানী করে অন্তত আমার কাছে তার সুপারিশ করবেন না। এ ছোট্ট উদাহরণটির ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা কতদূর সঠিক, যুক্তি-সংগত ও ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার দরজা বন্ধ হবে না। আল্লাহর সৎ বান্দারা যারা দুনিয়ায় মানুষের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাদেরকে আখেরাতেও সহানভূতির অধিকার

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

*—লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে যুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোনো জুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই।*[৮৭]

*আর হে মুহাম্মাদ! এভাবে আমি একে আরবী কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি*[৮৮] *এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে বাঁচবে বা এদের মধ্যে এর বদৌলতে কিছু সচেতনতার নিদর্শন ফুটে উঠবে।*[৮৯]

*কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উন্নত ও মহান।*[৯০]

*আর দেখো, কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার অহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরো জ্ঞান দাও।*[৯১]

*আমি*[৯২] *এর আগে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম*[৯৩] *কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি।*[৯৪]

আদায় করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু তারা সুপারিশ করার আগে অনুমতি চেয়ে নেবেন। যার পক্ষে আল্লাহ তাদেরকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র তার পক্ষেই তারা সুপারিশ করতে পারবেন। আবার সুপারিশ করার জন্যও শর্ত হবে যে, তা সংগত এবং ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে যেমন وَقَالَ صَوَابًا (এবং ঠিক কথা বলবে) আল্লাহর এ উক্তিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেখানে আজেবাজে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেমন একজন দুনিয়ায় শত শত, হাজার হাজার লোকের অধিকার গ্রাস করে এসেছে

www.banglabookpdf.blogspot.com



কিন্তু কোনো এক বুযর্গ হঠাৎ উঠে তার পক্ষে সুপারিশ করে দিলেন যে, হে আল্লাহ! তাকে পুরস্কৃত করুন, কারণ সে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন।

৮৭. কারণ সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর (Merits) ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। যে ব্যক্তি কোনো জুলুমের গোনাহের বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে, সে আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধে জুলুম করুক বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের বিরুদ্ধে অথবা নিজের নফসের বিরুদ্ধে জুলুম করুক না কেন যে কোনো অবস্থায়ই এগুলো তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে না। অন্যদিকে যারা ঈমান ও সৎকাজ (নিছক সৎকাজ নয় বরং ঈমান সহকারে সৎকাজ এবং নিছক ঈমানও নয় বরং সৎকাজ সহকারে ঈমান) নিয়ে আসবে তাদের ওপর সেখানে জুলুম হবার কোনো আশংকা নেই অর্থাৎ নিরর্থক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং সমস্ত অধিকার গ্রাস করে নেয়া হবে এমন কোনো আশংকাও সেখানে থাকবে না।

৮৮. অর্থাৎ তা এমনিতর বিষয়বস্তু, শিক্ষাবলী ও উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র ওপরের আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিকটবর্তী বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়নি। বরং কুরআনে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেসব দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আবার কুরআন সম্পর্কে সূরার সূচনায় এবং তারপর মূসার কাহিনীর শেষ পর্যায়ের আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে এর বর্ণনা পরম্পরা সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার প্রতি যে "স্মারক" পাঠানো হয়েছে এবং আমার কাছ থেকে বিশেষভাবে আমি যে "স্মরণ" তোমাকে দিয়েছি তা এ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন স্মারক ও স্মরণ।

৮৯. অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি থেকে সজাগ হবে, ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে কিছুটা স্মরণ করবে এবং পথ ভুলে কোন্ পথে যাচ্ছে আর এই পথ ভুলে চলার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে এদের মনে বেশ কিছুটা অনুভূতি জাগবে।

৯০. কুরআনে সাধারণত একটি ভাষণ শেষ করতে গিয়ে এ ধরনের বাক্য বলা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর কালামের সমাপ্তি তাঁর প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে করাই হয় এর উদ্দেশ্য। বর্ণনাভংগী ও পূর্বাপর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে একটি ভাষণ শেষ হয়ে গেছে এবং وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। বেশীর ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, এ দুটি ভাষণ বিভিন্ন সময় নাযিল হয়ে থাকবে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী দুটিকে এক জায়গায় একত্র করে দিয়ে থাকবেন। একত্র করার কারণ উভয় ভাষণের বিষয়গত সাদৃশ্য। এ বিষয়টি আমি পরবর্তী আলাচনায় সুস্পষ্ট করে দেবো।

৯১. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ বাক্যেই ভাষণ খতম হয়ে গেছে। এরপর বিদায় নেবার সময় ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। অহী নাযিল করার সময় এটা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে সংশোধন করে দেয়া সংগত মনে করা হয়নি। তাই বাণী পাঠানোর কাজ শেষ হবার পর এখন তার এ সংশোধনী দিচ্ছেন। সতর্কবাণীর শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, কি ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল। অহীর বাণী গ্রহণ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু

www.banglabookpdf.blogspot.com



আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্মরণ রাখার এবং মুখে পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করে থাকবেন। এ প্রচেষ্টার কারণে তাঁর মনোযোগ বারবার সরে গিয়ে থাকবে। ফলে অহী গ্রহণের ধারাবাহিকতার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাণী শোনার প্রতি মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। এ অবস্থা দেখে এ প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছে যে, তাঁকে অহীর বাণী গ্রহণ করার সঠিক পদ্ধতি বুঝাতে হবে এবং মাঝখানে মাঝখানে স্মরণ রাখার জন্য যে চেষ্টা তিনি করেন তা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে হবে।

এ থেকে জানা যায়, সূরা "ত্বা-হা"র এ অংশটি প্রথম যুগের অহীর অন্তরভুক্ত। প্রথম যুগে তখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অহী গ্রহণ করার অভ্যাস ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় কয়েকবার তিনি এ কাজ করেছেন। প্রত্যেকবার এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো না কোনো বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে। সূরা "কিয়ামাহ" নাযিলের সময়ও এমনটিই হয়েছিল। তাই তখন বাণীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছিলঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ.

"কুরআনকে দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহবা বার বার সঞ্চালন করো না। তা স্মরণ করিয়ে ও পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমি তা শুনাচ্ছি তখন তুমি গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে থাকো, তারপর তার অর্থ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার।"

সূরা আ'লায়েও তাঁকে এ নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, "আমি তা পড়িয়ে দেবো এবং তুমি তা ভুলে যাবে না।" سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى —পরে যখন তিনি অহীর বাণী গ্রহণ করার ব্যাপারে ভালোমতো পারদর্শিতা লাভ করেন তখন তিনি আর এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হননি। এ কারণে পরবর্তী সূরাগুলোয় এ ধরনের কোনো সতর্কবাণী আমরা দেখি না।

৯২. যেমন এর আগে বলা হয়েছে, এখান থেকে আর একটা আলাদা ভাষণ শুরু হয়েছে। সম্ভবত ওপরের ভাষণের পর কোনো এক সময় এটি নাযিল হয়েছিল এবং বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এর সাথে মিলিয়ে একই সূরার মধ্যে উভয়কে একত্র করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য একাধিক। যেমন ঃ

এক ঃ কুরআন যে ভুলে যাওয়া শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা সেই একই শিক্ষা যা মানব জাতিকে তার সৃষ্টির সূচনায় দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ যা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন এবং যা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কুরআনের পূর্বে বারবার "স্মারক" আসতে থেকেছে।

দুই ঃ শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ বারবার এ শিক্ষা ভুলে যায় এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই বরাবর সে এ দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে। তাই মানুষ বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকার মুখাপেক্ষী।

www.banglabookpdf.blogspot.com



তিন ঃ মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করে তার এমন আচরণের ওপর যা আল্লাহ প্রেরিত এই "স্মারকের" সাথে সে করবে। সৃষ্টির সূচনালগ্নে একথা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল। আজ এটা কোনো নতুন কথা বলা হচ্ছে না যে, এর অনুসরণ করলে গোমরাহী ও দুর্ভাগ্য থেকে সংরক্ষিত থাকবে অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে বিপদে পড়বে।

চার ঃ একটি জিনিস হচ্ছে, ভুল, সংকল্পের অভাব ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। এরি কারণে মানুষ তার চিরন্তন শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এবং ভুল করে বসে। মানুষের মনে ভুলের অনুভূতি জাগার সাথে সাথেই সে যদি নিজের দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্যের পথে ফিরে আসে তাহলেই সে ক্ষমা লাভ করতে পারে। দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘন এবং ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহর মোকাবিলায় শয়তানের দাসত্ব করা। ফেরাউন ও সামেরী এ কাজ করেছিল। এর ক্ষমার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফেরাউন ও সামেরী নিজেদের যে পরিণতি ভোগ করেছে এর পরিণতিও তাই হবে। যে ব্যক্তি এ কর্মনীতি অবলম্বন করবে সে-ই এ পরিণতির শিকার হবে।

৯৩. আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা এর আগে সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ (দু'জায়গায়), সূরা হিজর, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহাফে আলোচিত হয়েছে। এখানে সপ্তমবার এর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গায় বর্ণনা পরম্পরার সাথে এর সম্পর্ক ভিন্নতর এবং প্রত্যেক জায়গায় এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যে জায়গায় আলোচ্য বিষয়ের সাথে ঘটনার যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে সে জায়গায় সেটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য জায়গায় তা পাওয়া যাবে না অথবা বর্ণনাভংগী সামান্য আলাদা হবে। পুরো ঘটনাটা বা এর পূর্ণ তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সব জায়গাগুলোই পড়ে নেয়া উচিত। আমি সব জায়গায়ই এর সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং এর ফলাফল টীকায় বর্ণনা করে দিয়েছি।

৯৪. অর্থাৎ তিনি পরবর্তী পর্যায়ে এ নির্দেশের সাথে যে আচরণ করেন তা অহংকার ও ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহের ভিত্তিতে ছিল না বরং গাফলতি ও ভুলের শিকার হবার এবং সংকল্প ও ইচ্ছার দুর্বলতার কারণে ছিল। তিনি এ ধরনের কোনো চিন্তা ও সংকল্পের ভিত্তিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি যে, আমি আল্লাহর পরোয়া করতে যাবো কেন, তাঁর হুকুম হয়েছে তাতে কি হয়েছে, আমার মন যা চাইবে আমি তা করবো, আল্লাহ আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কেন ? এর পরিবর্তে বরং তাঁর আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণ এই ছিল যে, তিনি আল্লাহর হুকুম মনে রাখার চেষ্টা করেননি, তিনি তাঁকে কি বুঝিয়েছিলেন তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এবং তার ইচ্ছাশক্তি খুব বেশী মজবুত ছিল না যার ফলে যখন শয়তান তাঁকে প্ররোচিত করতে এলো তখন তিনি পূর্বাহ্নে প্রদত্ত আল্লাহর সতর্কবাণী ও উপদেশ (যার আলোচনা এখনই সামনে আসছে) স্মরণ করতে পারলেন না এবং শয়তান প্রদত্ত লোভ ও লালসার কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেন না।

"আমি তার মধ্যে সংকল্প পাইনি" এ বাক্যের অর্থ কেউ কেউ এরূপ নিয়েছেন যে, "আমি তার মধ্যে নাফরমানীর সংকল্প পাইনি" অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেছেন ভুল করে করেছেন, নাফরমানী করার সংকল্প নিয়ে করেননি। কিন্তু খামাখা এ ধরনের সংকোচ করার

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

৭ রুকূ'

*স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো, তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু একমাত্র ইবলীস অস্বীকার করে বসলো। এ ঘটনায় আমি আদমকে বললাম,[৯৫] দেখো, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু,[৯৬] এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়[৯৭] এবং তোমরা বিপদে পড়ে যাও। এখানে তো তুমি এ সুবিধে পাচ্ছো যে, তুমি না অভুক্ত ও উলংগ থাকছো এবং না পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লান্ত হচ্ছো।[৯৮] কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল,[৯৯] বলতে থাকলো, "হে আদম! তোমাকে কি এমন গাছের কথা বলে দেবো যা থেকে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজ্য লাভ করা যায় ?"[১০০]*

কোনো প্রয়োজন নেই। একথা বলতে হলে لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَلَى الْعِصْيَانِ বলা হতো, শুধুমাত্র لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا বলা হতো না। আয়াতের শব্দাবলী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সংকল্পের অভাব মানে হুকুম মেনে চলার সংকল্পের অভাব, নাফরমানী করার সংকল্পের অভাব নয়। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি ও পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি নজর দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, এখানে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের ভূমিকা ও মর্যাদা কালিমামুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করছেন না বরং তিনি একথা বলতে চান যে, তিনি যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং যে কারণে শুধু তিনি একাই নন বরং তাঁর সন্তানরাও আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী সত্ত্বেও নিজের শত্রুর ফাঁদে পা দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দিয়েই চলেছে সেটি কি ছিল। উপরন্তু যে ব্যক্তিই খোলা মনে এ আয়াতটি পড়বে তার মনে প্রথমে এ অর্থটিই ভেসে উঠবে যে, "আমি তার মধ্যে হুকুমের আনুগত্য করার সংকল্প বা মজবুত ইচ্ছাশক্তি পাইনি। দ্বিতীয় অর্থটি তার মনে ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না সে আদম আলাইহিস সালামের সাথে গোনাহের সম্পর্ক স্থাপন করা অসংগত মনে করে আয়াতের অন্য কোনো অর্থ খোঁজা শুরু করে দেবে। এ অবস্থায় এ অভিমত আল্লামা আলুসীও তাঁর তাফসীরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



لكن لا يخفى عليك ان هذا التفسير غير متبادر ولا كثير المناسبة للمقام -

"একথা তোমার কাছে গোপন থাকা উচিত নয় যে, আয়াতের শব্দাবলী শুনে এ ব্যাখ্যার সংগে সংগেই মনে উদয় হয় না এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথেও এটা তেমন কোনো সম্পর্ক রাখে না।" (দেখুন রুহুল মা'আনী, ১৬ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

৯৫. আদম আলাইহিস সালামকে যে আসল হুকুমটি দেয়া হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সে হুকুমটি হচ্ছে এই যে, "এ বিশেষ গাছটির ফল খেয়ো না।" কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ হুকুমটি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু বলার আসল বিষয়টি হচ্ছে শুধুমাত্র এতটুকু যে, মানুষ কিভাবে আল্লাহর আগাম সতর্কবাণী ও উপদেশ দান সত্ত্বেও নিজের পরিচিত শত্রুর কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয় এবং তার এ দুর্বলতা কিভাবে তার থেকে এমন কাজ করিয়ে নেয় যা তার নিজের স্বার্থ বিরোধী হয়, তাই আল্লাহ আসল হুকুম উল্লেখ করার পরিবর্তে এখানে কেবল মাত্র তার সাথে হযরত আদমকে (আ) যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল সেটির উল্লেখ করেছেন।

৯৬. শত্রুতার প্রদর্শনী তখনই হয়ে গিয়েছিল। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিলেন ইবলীস তাঁদেরকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছিল :

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

"আমি তার চাইতে ভালো, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" (আ'রাফ : ১২ এবং সাদ : ৭৬)

أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ "একটু দেখো তো, এ সত্তাটিকে তুমি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো।" ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا "এখন কি আমি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি থেকে?" (বনী ইসরাঈল : ৬১-৬২) তারপর শুধুমাত্র প্রকাশ্যে নিজের ঈর্ষা প্রকাশ করেই সে ক্ষান্ত থাকেনি বরং আল্লাহর কাছে এই বলে নিজের জন্য অবকাশও চেয়ে নিয়েছিল যে, আমাকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার অযোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ দিন, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেখিয়ে দেবো সে আপনার কেমন ধরনের প্রতিনিধি। সূরা আ'রাফ, হিজর ও বনী ইসরাঈলে তার এই চ্যালেঞ্জ উচ্চারিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা সাদেও আসছে। তাই আল্লাহ যখন বললেন, এ তোমাদের শত্রু তখন এটা নিছক একটা অজানা সংবাদ ছিল না বরং এমন একটা জিনিস ছিল যা ঠিক সময় মতো স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেনও।

৯৭. এভাবে উভয়কে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, যদি তার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে তোমরা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করো তাহলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না এবং তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেসব তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

*শেষ পর্যন্ত দুজন (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেয়ে বসলো। ফলে তখনই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং দুজনাই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকতে লাগলো।[১০১] আদম নিজের রবের নাফরমানী করলো এবং সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।[১০২] তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন,[১০৩] তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশনা দান করলেন।[১০৪]*

৯৮. জান্নাত থেকে বের হবার পর মানুষকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। এ সময় জান্নাতের বড় বড় পূর্ণাংগ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার পরিবর্তে তার চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তোমাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও গৃহের ব্যবস্থা সরকারীভাবে করা হচ্ছে। এর কোনো একটি অর্জন করার জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে না। এ থেকে আপনাআপনি একথা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে জান্নাত থেকে বের হয়ে তারা এখানকার বড় বড় নিয়ামত তো দূরের কথা মৌলিক জীবন উপকরণও লাভ করবে না। নিজেদের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্যও তারা প্রচেষ্টা চালাতে এবং জীবনপাত করতে বাধ্য হবে। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলা পর্যন্ত একবেলার আহারেরও সংস্থান করতে পারবে না। দু'বেলা দু'মুঠো আহারের চিন্তা তাদের মনোযোগ, সময় ও শক্তির এমন বৃহত্তম অংশ টেনে বের করে নিয়ে যাবে যে, কোনো উন্নততর উদ্দেশ্যের জন্য কিছু করার অবকাশ ও শক্তি তাদের থাকবে না।

৯৯. এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, আদম ও হাওয়ার মধ্যে আসলে যাকে শয়তান প্ররোচিত করেছিল তিনি হাওয়া ছিলেন না বরং ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। যদিও সূরা আ'রাফের বক্তব্যে দু'জনকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সেখানে দু'জনকেই প্ররোচিত বলা হয়েছে কিন্তু শয়তানের প্ররোচনার গতিমুখ ছিল মূলত হযরত আদমেরই দিকে। অন্যদিকে বাইবেলের বর্ণনা মতে সাপ প্রথমে মহিলা অর্থাৎ হযরত হাওয়ার সাথে কথা বলে এবং হাওয়া তার স্বামীকে প্ররোচিত করে তাঁকে গাছের ফল খাওয়ান। (আদি পুস্তক ঃ ৩)

১০০. সূরা আ'রাফে আমরা শয়তানের কথাবার্তার আরো যে বিস্তারিত বিবরণ পাই তা হচ্ছে এই যে,

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ـ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আর সে বললো, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটি থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত রেখেছেন, যাতে তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জীব না হয়ে যাও।"(২০ আয়াত)

১০১. অন্য কথায় নাফরমানীর প্রকাশ ঘটার সাথে সাথেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে যেসব জীবনোপকরণ দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর এর প্রথম প্রকাশ ঘটলো পোশাক ছিনিয়ে নেবার মধ্য দিয়েই। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়া তো ছিল পরবর্তীকালের ব্যাপার। ক্ষুধা ও পিপাসা লাগলে তবেই না খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা বুঝা যেতো এবং বাসস্থান থেকে বের করে দেবার ব্যাপারটিও ছিল পরবর্তীকালীন ব্যাপার। কিন্তু নাফরমানীর প্রথম প্রভাব পড়লো সরকারী পোশাকের ওপর। কারণ তা সংগে সংগেই খুলে নেয়া হয়েছিল।

১০২. এখানে আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যে মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল তার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা উচিত। তিনি আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও রব বলে জানতেন এবং অন্তর দিয়ে তা মানতেন। জান্নাতে তিনি যেসব জীবনোপকরণ লাভ করেছিলেন সেগুলো সবসময় তাঁর সামনে ছিল। শয়তানের হিংসা ও শত্রুতার জ্ঞানও তিনি সরাসরি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দেবার সাথে সাথেই বলে দিয়েছিলেন, এ হচ্ছে তোমার শত্রু, তোমাকে নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবে ফলে এজন্য তোমাকে এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। শয়তান তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তার শিকড় উপড়ে ফেলবো। এসব সত্ত্বেও শয়তান যখন তার সামনে স্নেহশীল উপদেশ দাতা ও কল্যাণকামী বন্ধুর বেশে এসে তাঁকে একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার (চিরন্তন জীবন ও অন্তহীন শাসন কর্তৃত্ব) লোভ দেখালো তখন তার লোভ দেখানোর মোকাবিলায় তিনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর পা পিছলে গেলো। অথচ এখনো আল্লাহর প্রতি তাঁর বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য দেখা দেয়নি। এবং তাঁর ফরমান আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ ধরনের কোনো ভাবনাও তাঁর মনে জাগেনি। শয়তানী লালসাবৃত্তির আওতাধীনে যে একটি তাৎক্ষণিক আবেগ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁকে ভুলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং আত্মসংযমের বাঁধন ঢিলে হবার সাথে সাথেই তিনি আনুগত্যের উন্নত স্থান থেকে গোনাহের নিম্নপংকে নেমে গেলেন। এ "ভুল" ও সংকল্প বিহীনতার উল্লেখ কাহিনীর শুরুতেই করা হয়েছিল। এ আয়াতের শুরুতে এরি ফলশ্রুতি হিসেবে নাফরমানী ও ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের এ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে এমন কোনো যুগ আসেনি যখন তার মধ্যে এ দুর্বলতা পাওয়া যায়নি।

১০৩. অর্থাৎ শয়তানের মতো আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত করেননি। আনুগত্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁকে পড়ে থাকতে দেননি বরং উঠিয়ে আবার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন এবং নিজের খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রোহকারী এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশকারী ভৃত্যের সাথে এক ধরনের আচরণ করা হয়। শয়তান ছিল এর হকদার এবং এমন প্রত্যেক বান্দাও এর হকদার হয়ে পড়ে যে নিজের রবের নাফরমানী করে এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে সামনে দাঁড়ায়। আর এক ধরনের আচরণ করা হয় এমন বিশ্বস্ত বান্দার সাথে যে নিছক "ভুল" ও

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

*আর বললেন, "তোমরা (উভয় পক্ষ অর্থাৎ মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু থাকবে। এখন যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো নির্দেশনামা পৌঁছে যায় তাহলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে চলবে সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্য পীড়িতও হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকির' (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন[১০৫] এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।"[১০৬]*

"সংকল্পহীনতা"র কারণে অপরাধ করে বসে এবং তারপর সজাগ হবার সাথে সাথেই নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। হযরত আদম ও হাওয়ার সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল। কারণ নিজেদের ভুলের অনুভূতি হবার সাথে সাথেই তারা বলে উঠেছিলেন :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের প্রতি করুণা না করো তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" (আ'রাফ : ২৩)

১০৪. অর্থাৎ শুধু মাফই করেননি বরং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথও বাতলে দিয়েছেন এবং তার ওপর চলার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

১০৫. দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন হবার মানে এই নয় যে, দুনিয়ায় তাকে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারবে না। কোটিপতি হলেও মানসিক অস্থিরতায় ভুগবে। সাত মহাদেশের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হলেও মানসিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তার পার্থিব সাফল্যগুলো হবে হাজারো ধরনের অবৈধ কলাকৌশল অবলম্বনের ফল। এগুলোর কারণে নিজের বিবেকসহ চারপাশের সমগ্র সামাজিক পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে তার লাগাতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যার ফলে সে কখনো মানসিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

১০৬. এখানে আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী শেষ হয়ে যায়। এ কাহিনী যেভাবে এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আমি একথা বুঝেছি যে, (অবশ্য আল্লাহ সঠিক জানেন) আদম আলাইহিস সালামকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



শুরুতে জান্নাতে যা দেয়া হয়েছিল সেটিই ছিল যমীনের আসল খিলাফত। সে জান্নাত সম্ভবত আকাশে বা এ পৃথিবীতেই বানানো হয়েছিল। মোটকথা সেখানে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধিকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে ছিল এবং সেবকরা (ফেরেশতাগণ) তার হুকুমের অনুগত ছিলেন।

খিলাফতের বৃহত্তর ও উন্নততর দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি যাতে সচেষ্ট হতে পারেন এজন্য তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের আদৌ কোনো চিন্তা তাকে করতে হতো না। কিন্তু প্রার্থীর যোগ্যতার অবস্থা সুস্পষ্ট হবার এবং তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলো প্রকাশিত হবার জন্য এ পদে স্থায়ী নিযুক্তির পূর্বে তার পরীক্ষা নেয়া অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। সে জন্যই এই পরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে যে কথা সুস্পষ্ট হয়েছে তা এই ছিল যে, লোভ ও লালসা প্রদর্শনে প্রভাবিত হয়ে এ প্রার্থীর পা পিছলে যায়। আনুগত্যের সংকল্পের ওপর সে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বিস্মৃতি তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পরীক্ষার পর আদম ও তার সন্তানদেরকে স্থায়ী খিলাফতে নিযুক্তির পরিবর্তে পরীক্ষামূলক খিলাফত দান করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার জন্য একটি সময়সীমা (নির্ধারিত সময়সীমা, কিয়ামত পর্যন্ত যার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে) নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের জন্য জীবন ধারণের সরকারী ব্যবস্থাপনা খতম করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজেদের জীবনোপকরণ তাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করে নিতে হবে। তবে পৃথিবী ও তার সৃষ্টিসমূহের ওপর তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। এখন এরি পরীক্ষা চলছে যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আনুগত্য করে কিনা এবং ভুল হয়ে গেলে অথবা লোভ ও লালসার প্রভাবে পা পিছলে গেলে সতর্কবাণী, স্মারক ও শিক্ষার প্রভাব গ্রহণ করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে কি না ? এবং তাদের শেষ ফায়সালা কি হয়, আনুগত্য না নাফরমানী ? এ পরীক্ষামূলক খিলাফতের যুদ্ধে প্রত্যেকের কর্মধারার রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে এবং যে চিরন্তন জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের লোভ দেখিয়ে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেছিল শেষ বিচার ও হিসেবের দিন যারা সফলকাম হবে তাদেরকে আবার সেই স্থায়ী খিলাফত দান করা হবে। সে সময় এ সমগ্র পৃথিবীটিকে জান্নাতে পরিণত করা হবে। আল্লাহর এমন সব সৎ বান্দা এর উত্তরাধিকারী হবে যারা পরীক্ষামূলক খিলাফতের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অথবা ভুল করার পর শেষ পর্যন্ত আবার আনুগত্যের দিকে ফিরে এসে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেবে। জান্নাতের এই জীবনকে যারা নিছক, পানাহার করা ও আয়েশ আরাম করে বুক ফুলিয়ে চলার জীবন মনে করে তাদের ধারণা সঠিক নয়। সেখানে অনবরত উন্নতি হতে থাকবে, অবনতির কোনো ভয় থাকবে না। মানুষ সেখানে আল্লাহর খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করবে এবং এপথে আবার কোনো প্রকার ব্যর্থতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। কিন্তু সেই উন্নতি ও সেসব কার্যক্রমের কল্পনা করা আমাদের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন যেমন একটি শিশুর জন্য সে বড় হয়ে যখন বিয়ে করবে তখন দাম্পত্য জীবনের অবস্থা কেমন হবে একথা কল্পনা করা কঠিন হয়। এজন্যই কুরআনে জান্নাতের জীবনের শুধুমাত্র এমনসব তৃপ্তি ও স্বাদ-আহলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে দুনিয়ার ভোগ ও স্বাদ-আহলাদের সাথে তুলনা করে সেগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুটা আন্দাজ অনুমান করতে পারি।

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ সুযোগে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বাইবেলে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া কম আকর্ষণীয় হবে না। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে "খোদা পৃথিবীর মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেন। তার নাসিকায় ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করান। এভাবে মানুষ জীবন লাভ করে। আর খোদা পূর্বদিকে এদনে একটি উদ্যান নির্মাণ করান এবং সেখানে নিজের তৈরি করা মানুষকে রাখেন" "আর উদ্যানের মাঝখানে জীবন বৃক্ষ ও ভালো ও মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষও উৎপন্ন করেন।" "আর খোদা আদমকে হুকুম দেন এবং বলেন, তুমি উদ্যানের প্রতিটি গাছের ফল নির্দ্বিধায় খেতে পারো কিন্তু ভালো মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল কখনো খেয়ো না। কারণ যেদিন তুমি ওর মধ্য থেকে খাবে সেদিনই মারা পড়বে।" "আর খোদা আদমের মধ্য থেকে যে পঞ্জর বের করেছিলেন তা থেকে এক নারী সৃষ্টি করে তাকে আদমের কাছে আনেন।" "আর আদম ও তার স্ত্রী উভয়ই উলংগ ছিলেন, তাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" "আর ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে বেশী খল। সে ঐ নারীকে বললো, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোনো বৃক্ষের ফল খেয়ো না ?" "সাপ নারীকে বললো, তোমরা কোনোক্রমেই মরবে না, বরং ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে ভালো মন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে।" "এ জন্য নারী তার ফল পেড়ে খেয়ে ফেললেন এবং নিজের স্বামীকেও খাওয়ালেন।" "তখন তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, তারা উলংগ। আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে নিজেদের জন্য ঘাঘরা প্রস্তুত করলেন। আর তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন। তাহাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন।" "তখন খোদা আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায় ? তিনি বললেন, আমি উদ্যানে তোমার আওয়াজ শুনে ভীত হয়েছি এবং লুকিয়েছি, কারণ আমি উলংগ। খোদা বললেন, তুমি যে উলংগ তা তোমাকে কে বললো ? যে বৃক্ষের ফল খেতে তোমাকে বারণ করেছিলাম নিশ্চয়ই তুমি তার ফল খেয়েছো। আদম বললেন, হাওয়া আমাকে তার ফল খাইয়েছে। আর হাওয়া বললো, আমাকে সাপ প্ররোচিত করেছিল। একথায় আল্লাহ সাপকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছো, তাই গ্রাম্য বন্য পশুদের মধ্যে তুমি অধিক শাপগ্রস্ত ; তুমি বুকে হাঁটবে এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করবো; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে।" এবং নারীকে এ শাস্তি দিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেবো তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ; ও সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" আর আদমের ব্যাপারে এ ফায়সালা করলেন যে, যেহেতু তুমি নিজের স্ত্রীর কথা মেনে নিয়েছো এবং আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছো, "তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে তা ভোগ করবে ......... তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে।" তারপর "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক তৈরি করে তাদেরকে তা পরালেন।" "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, দেখো, মানুষ ভালোমন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের একের মতো হলো ; এখন এমন যেমন না হয় যে, সে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফলও পেড়ে খায় এবং অনন্তজীবী হয়। তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে এদনের উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।" (আদি পুস্তক ২ ঃ ৭-২৫, ৩ ঃ ১-২৩)

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

*—সে বলবে, "হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন?" আল্লাহ বলবেন, "হ্যাঁ, এভাবেই তো। আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"[১০৭]—এভাবেই আমি সীমালংঘনকারী এবং নিজের রবের আয়াত অমান্যকারীকে (দুনিয়ায়) প্রতিফল দিয়ে থাকি[১০৮] এবং আখেরাতের আযাব বেশী কঠিন এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী।*

*তাহলে কি এদের[১০৯] (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো পথনির্দেশ মেলেনি যে, এদের পূর্বে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতিগুলোতে আজ এরা চলাফেরা করে? আসলে যারা ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে বহু নিদর্শন।[১১০]*

যারা একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না যে, কুরআনে এ কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে নকল করা হয়েছে তাদের কাছে বাইবেলের এ বর্ণনা ও কুরআনের বর্ণনাকে একটু পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করার আবেদন জানাই।

১০৭. কিয়ামতের দিন নুতুন জীবনের শুরু থেকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধীদেরকে যেসব বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অবস্থা হচ্ছে,

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ○

"তুমি এ জিনিস থেকে গাফলতির মধ্যে পড়েছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পরদা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ।" (কাফ ঃ ২২)

অর্থাৎ আজ তুমি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছো। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا تَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ -

"আল্লাহ তো তাদের আযাবকে সেদিনের জন্য পিছিয়ে দিচ্ছেন যেদিন অবস্থা এমন হবে যে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়েই থেকে যাবে, লোকেরা মাথা তুলে ছুটতেই থাকবে। চোখ উপরে তুলে তাকিয়েই থাকবে এবং মন দিশেহারা হয়ে যাবে।"

(ইবরাহীম ৪২-৪৩)

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

"আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি লিখন বের করবো, যাকে সে পাবে উন্মুক্ত কিতাব হিসেবে। পড়ো নিজের আমলনামা আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৪)

আর আমাদের আলোচ্য আয়াতে এসব অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে তারা আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং নিজেদের দুষ্কৃতির ফল তো খুব ভালোভাবেই দেখবে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র এগুলোই দেখার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। বাদবাকি অন্যান্য দিক থেকে তাদের অবস্থা হবে এমন অন্ধের মতো যে, নিজের চলার পথ দেখতে পায় না। যার হাতে লাঠিও নেই, হাতড়ে চলার ক্ষমতাও নেই, প্রতি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, বুঝতে পারছে না সে কোন্ দিকে যাবে এবং নিজের প্রয়োজন কিভাবে পূর্ণ করবে। নিম্নলিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে এ অবস্থাটিকে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "যেভাবে তুমি আমার আয়াতগুলো ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" অর্থাৎ তুমি কোথায় কোথায় হোঁচট খাচ্ছো, আঘাত পাচ্ছো এবং কেমনতর বঞ্চনার শিকার হচ্ছো আজ তার কোনো পরোয়াই করা হবে না। কেউ তোমার হাত ধরবে না। তোমার অভাব ও প্রয়োজন কেউ পূর্ণ করবে না এবং তোমার কোনো রকম দেখাশুনা করা হবে না। তুমি চরম উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হবে।

১০৮. এখানে আল্লাহ "যিকির" অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে "অতৃপ্ত জীবন" যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে।

১০৯. সে সময় মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল এবং এখানে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ ইতিহাসের এ শিক্ষায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এ পর্যবেক্ষণে, মানব জাতির এ অভিজ্ঞতায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

৮ রুকূ'

*যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেই একটি সিদ্ধান্ত না করে দেয়া হতো এবং অবকাশের একটি সময়সীমা নির্ধারিত না করা হতো, তাহলে অবশ্যি এরও ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হতো। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এরা যেসব কথা বলে তাতে সবর করো এবং নিজের রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্য উদয়ের আগে ও তার অস্ত যাবার আগে, আর রাত্রিকালেও প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তগুলোতেও।[১১১] হয়তো এতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[১১২] আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে, যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই[১১৩] উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।*

১১১. অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা তোমার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন তোমাকে অবশ্য তা বরদাশত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তুমি নামায থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবে। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে তোমার প্রতিদিন নিয়মিত এ নামায পড়া উচিত।

"রবের প্রশংসা ও গুণগান সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা" করা মানে হচ্ছে নামায। যেমন সামনের দিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا "নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



নামাযের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের নামায। সূর্য অস্তে যাবার আগে আসরের নামায। আর রাতের বেলা এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের নামায হতে পারে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ ১১৩, বনী ইসরাঈল ৯১ থেকে ৯৭, আর রূম ২৪ ও আল মু'মিন ৭৪ টীকাগুলো দেখুন।

১১২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্যও। একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকো। এই অবস্থায় নিজের কর্তব্য পালনের কারণে তোমাকে নানা অপ্রীতিকর কথা শুনতে হচ্ছে। তোমার প্রতি যারা অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম করছে তাদেরকে এখনো শাস্তি দেয়া হবে না, তারা সত্যের আহ্বায়ককে কষ্ট দিতেও থাকবে এবং পৃথবীর বুকে বুক ফুলিয়েও চলবে, আল্লাহর এই ফায়সালায় তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তুমি একবার একাজটি করে দেখো। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে যাতে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এ দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে নামাযের হুকুম দেবার পর বলা হয়েছে ঃ

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ

"আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থান) পৌঁছিয়ে দেবেন।" (৭৯ আয়াত)

অন্যত্র সূরা 'দু-হা'য় বলা হয়েছে ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"তোমার জন্য পরবর্তী যুগ অবশ্য পূর্ববর্তী যুগের চাইতে ভালো আর শিগ্‌গির তোমার রব তোমাকে এত কিছু দেবেন যার ফলে তুমি খুশী হয়ে যবে।"

১১৩. "রিয্‌ক" শব্দের অনুবাদ আমি করেছি "হালাল রিযিক"। এর কারণ মহান আল্লাহ কোথাও হারাম সম্পদকে "রবের রিযিক" হিসেবে পেশ করেননি। এর অর্থ হচ্ছে, এ ফাসেক ও দুশ্চরিত্র লোকেরা অবৈধ পথে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের জীবনে যে বাহ্যিক চমক সৃষ্টি করে নেয় তোমার ও তোমার মু'মিন সাথীদের তাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এ ধন-দওলত ও শান শওকত তোমাদের জন্য মোটেও ঈর্ষণীয় নয়। তোমরা নিজেরা পরিশ্রম করে যে পাক-পবিত্র রিযিক উপার্জন করো তা যতই সামান্য হোক না কেন সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদার লোকদের জন্য তাই ভালো এবং তার মধ্যে এমন কল্যাণ রয়েছে যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বজায় থাকবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولٰى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ۝ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۝

*নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার হুকুম দাও[১১৪] এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই।[১১৫]*

*তারা বলে, এ ব্যক্তি নিজের রবের পক্ষ থেকে কোনো নিশানী (মু'জিযা) আনে না কেন ? আর এদের কাছে কি আগের সহীফাগুলোর সমস্ত শিক্ষার সুস্পষ্ট বর্ণনা এসে যায়নি ?[১১৬] যদি আমি তার আসার আগে এদেরকে কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে আবার এরাই বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি কেন, যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই তোমার আয়াত মেনে চলতাম ? হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, সবাই কাজের পরিণামের প্রতীক্ষায় রয়েছে।[১১৭] কাজেই এখন প্রতিক্ষারত থাকো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা সোজা-সঠিক পথ অবলম্বনকারী এবং কারা সৎপথ পেয়ে গেছে।*

১১৪. অর্থাৎ তোমাদের সন্তানরা যেন নিজেদের অভাব অনটন ও দূরবস্থার মোকাবিলায় এ হারামখোরদের ভোগ বিলাসিতা দেখে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। এ জিনিসটি তাদের দৃষ্টিভংগীতে পরিবর্তন ঘটাবে। তাদের মূল্যবোধ বদলে দেবে। তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে দেবে। তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিকের ওপর সবর করবে এবং তাতে পরিতুষ্ট হবে। ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় তাকে তারা এমন ভোগের ওপর অগ্রাধিকার দিতে থাকবে, যা ফাসেকী, দুশ্চরিত্রতা ও পার্থিব লোভ লালসা থেকে অর্জিত হয়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



১১৫. আমার কোনো লাভের জন্য আমি তোমাদের নামায পড়তে বলছি না। বরং এতে লাভ তোমাদের নিজেদেরই। সেটি হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর এটিই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে স্থায়ী ও শেষ সাফল্যের মাধ্যম।

১১৬. অর্থাৎ এটা কি কোনো ছোটখাটো মু'জিযা যে, তাদের মধ্য থেকে এক নিরক্ষর ব্যক্তি এমন একটি কিতাব পেশ করেছেন, যাতে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাবলীর নির্যাস বের করে রেখে দেয়া হয়েছে ? মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য ঐ সমস্ত কিতাবের মধ্যে যা কিছু ছিল তা কেবলমাত্র তার মধ্যে একত্রই করা হয়নি বরং তা এমন উন্মুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, একজন মরুচারী বেদুইনও তা অনুধাবন করে লাভবান হতে পারে।

১১৭. অর্থাৎ যখন থেকে এ দাওয়াতটি তোমাদের শহরে পেশ করা হয়েছে তখন থেকে শুধুমাত্র এ শহরের নয় বরং আশপাশের এলাকারও প্রতিটি লোক এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

❒

www.banglabookpdf.blogspot.com



# আল আম্বিয়া

## ২১

### নামকরণ

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর কথা আলোচিত হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে "আল আম্বিয়া"। এটাও সূরার বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং নিছক সূরা চিহ্নিত করার একটি আলামত মাত্র।

### নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে অবস্থার যে বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

### বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উথাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তাঁর মুকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে— বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



দুই ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উথাপন করা এবং কোনো একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার—ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিনঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোনো ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোনো প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।—যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চার ঃ শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।—এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোনো আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়।—একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতোই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দু'টি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাঁদের বিরোধীরাও তাঁদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে

www.banglabookpdf.blogspot.com



অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ① مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ② لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

*মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় কাছে এসে গেছে,[১] অথচ সে গাফলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে।[২] তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে উপদেশ আসে,[৩] তা তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে শোনে এবং খেলার মধ্যে ডুবে থাকে,[৪] তাদের মন (অন্য চিন্তায়) আচ্ছন্ন।*

*আর জালেমরা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে যে, "এ ব্যক্তি মূলত তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কি, তাহলে কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পড়বে ?"[৫]*

১. এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত নিকটবর্তী। অর্থাৎ লোকদের নিজেদের কাজের হিসেব দেবার জন্য তাদের রবের সামনে হাজির হবার সময় আর দূরে নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন একথারই আলামত যে, মানব জাতির ইতিহাস বর্তমানে তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এখন সে তার সূচনাকালের পরিবর্তে পরিণামের বেশী নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সূচনা ও মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এবার শেষ পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি হাদীসে একথাই বলেছেন। তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে বলেনঃ

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"আমার আগমন এমন সময়ে ঘটেছে যখন আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই আছে। মাঝখানে অন্য কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই। যদি সংশোধিত হয়ে যেতে চাও তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সংশোধিত হও। আর কোনো সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসবেন না।

২. অর্থাৎ কোনো সতর্ক সংকেত ও সতর্কবাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। নিজেরাও পরিণামের কথা ভাবে না, আর যে নবী তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছেন তাঁর কথাও শোনে না।

৩. অর্থাৎ কুরআনের যে নতুন সূরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয় এবং তাদেরকে শুনানো হয়।

৪. وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ ওপরে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে খেলা মানে হচ্ছে এই জীবনের খেলা। আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল লোকেরা এ খেলা খেলছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে তা শোনে না বরং খেলা, ঠাট্টা-তামাসা ও কৌতুকচ্ছলে তা শুনে থাকে।

৫. "পড়ে যেতে থাকবে"-ও অনুবাদ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। মক্কার যেসব বড় বড় কাফের সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করার চিন্তায় বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল তারাই পরস্পর বসে বসে এই কানাকানি করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো কোনোক্রমে নবী হতেই পারে না। কারণ এতো আমাদেরই মতো মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী-সন্তানও আছে। কাজেই এর মধ্যে এমন নতুন কথা কি আছে যা তাকে আমাদের থেকে বিশিষ্ট করে এবং আমাদের মোকাবিলায় তাঁকে আল্লাহর সাথে একটি অস্বাভাবিক সম্পর্কের অধিকারী করে ? তবে কিনা এ ব্যক্তির কথাবার্তায় এবং এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাদু আছে। ফলে যে ব্যক্তি এর কথা কান লাগিয়ে শোনে এবং এর কাছে যায়, সে এর ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এর কথায় কান দিয়ো না এবং এর সাথে মেলামেশা করো না। কারণ এর কথা শোনা এবং এর নিকটে যাওয়া সুস্পষ্ট যাদুর ফাঁদে নিজেকে আটকে দেয়ার মতই।

যে কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "যাদু"র অভিযোগ আনতো তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫২ হিঃ) তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একবার উত্‌বা ইবনে আবী রাবীআহ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর এবং কলিজা খাদক হিন্দার বাপ) কুরাইশ সরদারদেরকে বললো, যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করি এবং তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি। এটা ছিল হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণের পরবর্তীকালের ঘটনা। তখন নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং এ অবস্থা দেখে কুরাইশ সরদাররা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। লোকেরা বললো, হে আবুল ওলীদ ! তোমার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি অবশ্যই গিয়ে তার সাথে কথা বলো। সে নবী করীম (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, "হে ভাতিজা ! আমাদের এখানে তোমার যে মর্যাদা ছিল তা তুমি নিজেই জানো এবং বংশের দিক দিয়েও তুমি

www.banglabookpdf.blogspot.com



একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তুমি নিজের জাতির ওপর একটি বিপদ চাপিয়ে দিয়েছো ? তুমি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। সমগ্র জাতিকে বোকা ঠাউরেছো। তার ধর্ম ও উপাস্যদের দুর্নাম করেছো। মৃত বাপ-দাদাদের সবাইকে তুমি পথভ্রষ্ট ও কাফের বানিয়ে দিয়েছো। হে ভাতিজা! যদি এসব কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এসো আমরা সবাই মিলে তোমাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ দিয়ে দেবো যে, তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে। নেতৃত্ব চাইলে আমরা তোমাকে নেতা মেনে নিচ্ছি। বাদশাহী চাইলে তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তোমার কোনো রোগ হয়ে থাকে যে কারণে সত্যিই তুমি শয়নে-জাগরণে কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাহলে আমরা সবাই মিলে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সহায়তায় তোমার রোগ নিরাময় করবো।" এসব কথা সে বলতে থাকলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে সব শুনতে থাকলেন। যখন সে যথেষ্ট বলে ফেলেছে তখন নবী করীম (স) বললেন," আবুল ওলীদ! আপনি যা কিছু বলতে চান সব বলে শেষ করেছেন, নাকি এখনো কিছু বলার বাকি আছে ?" সে বললো, হাঁ, আমার বক্তব্য শেষ, তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে এখন আপনি আমার কথা শুনুন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এরপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে সূরা হা-মীম-আস সাজাদাহ্ তেলাওয়াত করতে থাকলেন এবং উত্‌বা পেছনে মাটির ওপর হাত ঠেকিয়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকলো। আটতিরিশ আয়াতে পৌঁছে তিনি সিজদা করলেন এবং তারপর মাথা উঠিয়ে উত্‌বাকে বললেন, "হে আবুল ওলীদ! আমার যা কিছু বলার ছিল তা আপনি শুনে নিয়েছেন, এখন আপনার যা করার আপনি করবেন।"

উত্‌বা এখান থেকে উঠে কুরাইশ সরদারদের কাছে ফিরে যেতে লাগলো। লোকেরা তাকে দূর থেকে আসতে দেখে বললো,"আল্লাহর কসম, আবুল ওলীদের চেহারা পাল্‌টে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে এখান থেকে গিয়েছিল এটা সে চেহারা নয়। তার ফিরে আসার সাথে সাথেই লোকেরা প্রশ্ন করলো, "বলো, হে আবুল ওলীদ! তুমি কি করে এলে ?" সে বললো, "আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এ কবিতা নয়, যাদুও নয়, গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। হে কুরাইশ জনতা! আমার কথা মেনে নাও এবং এ ব্যক্তিকে এর অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। এর যেসব কথা আমি শুনেছি তা একদিন স্বরূপে প্রকাশিত হবেই। যদি আরবরা তার ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদের ভাইয়ের রক্তপাতের দায় থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। অন্যেরা তার দায়ভার বহন করবে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তাহলে তার শাসন কর্তৃত্ব হবে তোমাদেরই শাসন কর্তৃত্ব এবং তার সম্মান তোমাদেরই সম্মানে রূপান্তরিত হবে।" লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ! তুমিও তার যাদুতে আক্রান্ত হয়েছো।" সে বললো, "এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এখন তোমরা নিজেরাই তোমাদের সিদ্ধান্ত নেবে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ) ইমাম বায়হাকী এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন তার একটিতে এতটুকু বাড়িয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com



বলা হয়েছে যে, যখন নবী করীম (স) সূরা হা-মীম আস সাজদাহ তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছে গেলেন—

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

(তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, আমি তো তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি এমন একটি আকস্মিক আযাবে পতিত হওয়া থেকে, যেমন আযাবে পতিত হয়েছিল আদ ও সামুদ।) তখন উত্‌বাহ স্বতস্ফূর্তভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো, আল্লাহর দোহাই নিজের জাতির প্রতি করুণা করো।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইবনে ইসহাক এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একবার আরাশ গোত্রের একজন লোক কিছু উট নিয়ে মক্কায় এলো। আবু জেহেল তার উটগুলো কিনে নিলো। যখন সে দাম চাইলো তখন আবু জেহেল টালবাহানা করতে লাগলো। আরাশী ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন কা'বার হারমে কুরাইশ সরদারদেরকে ধরলো এবং প্রকাশ্য সমাবেশে ফরিয়াদ করতে থাকলো। অন্যদিকে হারাম শরীফের অন্য প্রান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। কুরাইশ সরদাররা তাকে বললো, "আমরা কিছুই করতে পারবো না। দেখো, ঐ দিকে ঐ কোণে যে ব্যক্তি বসে আছে তাকে গিয়ে বলো। সে তার কাছ থেকে তোমার টাকা আদায় করে দেবে।" আরাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কুরাইশ সরদাররা পরস্পর বলতে লাগলো, "এবার মজা হবে।" আরাশী গিয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করলো, তিনি তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিয়ে আবু জেহেলের গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সরদাররা তাদের পেছনে একজন লোক পাঠিয়ে দিল। আবু জেহেলের বাড়ীতে কি ঘটে তা সে সরদারদেরকে জানাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা আবু জেহেলের দরজায় পৌঁছে গেলেন এবং শিকল ধরে নাড়া দিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, "কে ?" তিনি জবাব দিলেন, "মুহাম্মাদ।" সে অবাক হয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন, "এ ব্যক্তির পাওনা দিয়ে দাও।" সে কোনো দ্বিরুক্তি না করে ভেতরে চলে গেলো এবং উটের দাম এনে তার হাতে দিল। এ অবস্থা দেখে কুরাইশদের প্রতিবেদক হারাম শরীফের দিকে দৌড়ে গেলো এবং সরদারদেরকে সমস্ত ঘটনা শুনাবার পর বললো, আল্লাহর কসম! আজ এমন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম, যা এর আগে কখনো দেখিনি। হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল) যখন গৃহ থেকে বের হয়ে মুহাম্মাদকে দেখলো তখনই তার চেহারার রং ফিকে হয়ে গেলো এবং যখন মুহাম্মাদ তাকে বললো, তার পাওনা দিয়ে দাও তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন হাকাম ইবনে হিশামের দেহে প্রাণ নেই। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৯-৩০ পৃঃ)

এ ছিল ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের প্রভাব। আবার অন্যদিকে ছিল কালাম ও বাণীর প্রভাব যাকে তারা যাদু মনে করতো এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে এ বলে ভয় দেখাতো যে, এ লোকটির কাছে যেয়ো না, কাছে গেলেই তোমাদেরকে যাদু করে দেবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قٰلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

*রসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয়, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।*[৬]

*তারা বলে, "বরং এসব বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া বরং এ ব্যক্তি কবি।*[৭] *নয়তো সে আনুক একটি নিদর্শন যেমন পূর্ববর্তীকালের নবীদেরকে পাঠানো হয়েছিল নিদর্শন সহকারে।" অথচ এদের আগে আমি যেসব জনবসতিকে ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ ঈমান আনেনি। এখন কি এরা ঈমান আনবে ?*[৮]

৬. অর্থাৎ নবী কখনো মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব রটনার এ অভিযানের (Whispering Campaign) জবাবে এ ছাড়া অন্য কোনো কথা বলেননি যে, "তোমরা যেসব কথা তৈরি করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন।" তিনি কখনো অন্যায়পন্থী শত্রুর সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করেন না।

৭. এর পটভূমি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রভাব যখন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, মক্কার সরদাররা পরস্পর পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য একটি জোরদার প্রচারাভিযান চালাতে হবে। মক্কায় যিয়ারত করার জন্য যে ব্যক্তিই আসবে তার মনে পূর্বাহ্নেই তাঁর বিরুদ্ধে এত বেশী কুধারণা সৃষ্টি করে দিতে হবে যার ফলে সে তাঁর কোনো কথায় কান দিতে রাজিই হবে না। এমনিতে এ অভিযান বছরের বারো মাসই জারি থাকতো কিন্তু বিশেষ করে হজ্জের মওসুমে বিপুল সংখ্যক লোক চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হতো, তারা বাইর থেকে আগত সকল যিয়ারতকারীর তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে এমন এমন ধরনের একজন লোক আছে, তার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব আলোচনার সময় নানান ধরনের কথা বলা হতো। কখনো বলা হতো, এ ব্যক্তি যাদুকর। কখনো বলা হতো, সে নিজেই একটা বাণী রচনা করে বলছে এটা আল্লাহর বাণী। কখনো বলা হতো, আরে হাঁ, তা আবার এমন কি বাণী ! ডাহা পাগলের প্রলাপ এবং অগোছালো চিন্তার একটা আবর্জনা স্তুপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কখনো বলা হতো, কিছু কবিত্বমূলক ভাব-কল্পনা ও ছন্দ-গাথাকে সে আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে রেখেছে। যেনতেনভাবে লোকদেরকে প্রতারিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। কোনো একটি কথার ওপর অবিচল থেকে একটি মাপাজোকা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা পেশ করছিল না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



কারণ সত্যের কোনো প্রশ্নই তাদের সামনে ছিল না। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারণার ফল যা হলো তা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। মুসলমানদের বছরের পর বছরের প্রচেষ্টায় তার যে প্রচার ও পরিচিতি হওয়া সম্ভবপর ছিল না কুরাইশদের এ বিরোধিতার অভিযানে তা মাত্র সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে গেলো। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন জাগলো, যার বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান, এ মারাত্মক অভিযোগ, কে সেই ব্যক্তি ? আবার অনেকে ভাবলো তার কথা তো শোনা উচিত। আমরা তো আর দুধের শিশু নই যে, অযথা তার কথায় পথভ্রষ্ট হবো।

এর একটি মজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোফাইল ইবনে আমর দাওসীর ঘটনা। ইবনে ইসহাক বিস্তারিত আকারে তাঁর নিজের মুখেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন ঃ আমি দাওস গোত্রের একজন কবি ছিলাম। কোনো কাজে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছতেই কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ফেললো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কথা বললো। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে খারাপ ধারণা জন্মালো। আমি স্থির করলাম, তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকবো। পর দিন আমি হারাম শরীফে গেলাম। দেখলাম তিনি কা'বা গৃহের কাছে নামায পড়ছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি বাক্য আমার কানে পড়লো। আমি অনুভব করলাম, বড় চমৎকার বাণী। মনে মনে বললাম, আমি কবি, যুবক, বুদ্ধিমান। আমি কোনো শিশু নই যে, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো না। তাহলে এ ব্যক্তি কি বলেন, এর সংগে কথা বলে জানার চেষ্টা করি না কেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে চলে যেতে লাগলেন তখন আমি তাঁর পিছু নিলাম। তাঁর গৃহে পৌছে তাঁকে বললাম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছিল, ফলে আমি আপনার ব্যাপারে এতই খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, নিজের কানে তুলো ঠেসে দিয়েছিলাম, যাতে আপনার কথা শুনতে না পাই। কিন্তু এখনই যে কয়েকটি বাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি তা আমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয়েছে। আপনি কি বলেন, আমাকে একটু বিস্তারিতভাবে জানান। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুরআনের একটি অংশ শুনালেন। তাতে আমি এত বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে, তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি নিজের পিতা ও স্ত্রীকে মুসলমান করলাম। এরপর নিজের গোত্রের মধ্যে অবিরাম ইসলাম প্রচারের কাজ করতে লাগলাম। এমন কি খন্দকের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমার গোত্রের সত্তর আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। (ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ২২-২৪ পৃঃ)

ইবনে ইসহাক যে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, কুরাইশ সরদাররা নিজেদের মাহফিলগুলোতে নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব কথা তৈরি করে সেগুলো নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন ঃ একটি মজলিসে নযর ইবনে হারেস বক্তৃতা প্রসংগে বলে, "তোমরা যেভাবে মুহাম্মাদের মোকাবিলা করছো তাতে কোনো কাজ হবে না। সে যখন যুবক ছিল তখন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী ব্যক্তি ছিল। সবচেয়ে বড় সত্যনিষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। আর এখন তার চুল সাদা হতে যাচ্ছে, এখন তোমরা বলো কিনা সে যাদুকর, গণক, কবি, পাগল। আল্লাহর কসম,

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

*আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম।[৯] তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করো।[১০] সেই রসূলদেরকে আমি এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খেতো না এবং তারা চিরজীবিও ছিল না। তারপর দেখে নাও আমি তাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি এবং তাদেরকে ও যাকে যাকে আমি চেয়েছি রক্ষা করেছি এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।[১১]*

*হে লোকেরা ! আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদেরই কথা আছে, তোমরা কি বুঝ না ?[১২]*

সে যাদুকর নয়। আমি যাদুকরদের দেখেছি এবং তাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কেও জানি। আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমি গণকদের তন্ত্রমন্ত্র শুনেছি, তারা যেসব রহস্যময় ও বহুমুখী কথা বলে থাকে তা আমি জানি। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। কবিতার বিভিন্ন প্রকারের সাথে আমি পরিচিত। তার বাণী এর কোনো প্রকারের মধ্যেই পড়ে না। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। পাগল যে অবস্থায় থাকে এবং সে যে প্রলাপ বকে সে ব্যাপারে কি আমরা কেউ অনভিজ্ঞ ? হে কুরাইশ সরদাররা! অন্য কিছু চিন্তা করো। তোমরা যে বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছো এসব ঠুনকো কথায় তাকে পরাজিত করবে, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়।" এরপর সে এই প্রস্তাব পেশ করলো যে, আরবের বাহির থেকে রুস্তম ও ইস্ফিন্দিয়ারের কাহিনী এনে ছড়াতে হবে। লোকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তা তাদের কাছে কুরআনের চাইতেও বেশী বিস্ময়কর মনে হবে। সেই অনুসারে কিছুদিন এই পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজ চলতে লাগলো। এবং নযর নিজেই গল্প বলার কাজ শুরু করে দিল। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ)

৮. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিদর্শন দেখাবার দাবীর যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে। এক, পূর্ববর্তী রসূলদেরকে যে ধরনের নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তোমরা তেমনি ধরনের নিদর্শন চাচ্ছো ? কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো হঠকারী লোকেরা সেসব

www.banglabookpdf.blogspot.com



নিদর্শন দেখেও ঈমান আনেনি। দুই, তোমরা নিদর্শনের দাবী তো করছো কিন্তু একথা মনে রাখছো না যে, সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখে নেবার পরও যে জাতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তারা এরপর শুধু ধ্বংসই হয়ে গেছে। তিন, তোমাদের চাহিদামতো নিদর্শনাবলী না পাঠানো তো তোমাদের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট মেহেরবাণী. কারণ এ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর হুকুম শুধুমাত্র অস্বীকারই করে আসছো কিন্তু এ জন্য তোমাদের ওপর আযাব পাঠানো হয়নি। এখন কি তোমরা নিদর্শন এ জন্য চাচ্ছো যে, যেসব জাতি নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি এবং এ জন্য তাদেরকে ধ্বংস কর দেয়া হয়েছে তোমরাও তাদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হতে চাও ?

৯. এটি হচ্ছে "এ ব্যক্তি তোমাদের মতই একজন মানুষ" তাদের এ উক্তির জবাব. তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক সত্তাকে তাঁর নবী না হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতো। জবাব দেয়া হয়েছে যে, পূর্ব যুগের যেসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে তোমরা মানো তাঁরা সবাইও মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থায়ই তাঁরা আল্লাহর অহী লাভ করেছিলেন. (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ১১ টীকা)

১০. অর্থাৎ যে ইহুদীরা ইসলাম বৈরিতার ক্ষেত্রে আজ তোমাদের সাথে গলা মিলিয়ে চলছে এবং তোমাদেরকে বিরোধিতা করার কায়দা কৌশল শেখাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, মূসা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীগণ কী ছিলেন ? মানুষ ছিলেন, না অন্য কোনো জীব ?

১১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষা শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলে না যে, পূর্বে যেসব রসূল পাঠানো হয়েছিল তারা মানুষ ছিলেন বরং একথাও বলে যে, তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাঁদের বিরোধিতাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেবার যতগুলো অংগীকার আল্লাহ তাঁদের সাথে করেছিলেন সবই পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব জাতি তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে। কাজেই এখন নিজেদের পরিণতি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে নাও।

১২. মক্কার কাফেররা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবিন্যস্তভাবে যেসব কথা বলে চলছিল যে, তিনি যা এনেছেন তা কবিত্ব, যাদু, বিভ্রান্ত স্বপ্ন, মনগড়া কাহিনী ইত্যাদি। এটি হচ্ছে সেগুলোর একটি সম্মিলিত জবাব। এতে বলা হচ্ছে, এ কিতাবে এমন কি অভিনব কথা বলা হচ্ছে যা তোমরা বুঝতে পারছো না, যে কারণে সে সম্পর্কে তোমরা এত বেশী বিপরিতধর্মী মত গঠন করছো ? এর মধ্যে তো তোমাদের নিজেদের কথাই বলা হয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ব ও তোমাদেরই ব্যবহারিক জীবনের কথা আলোচনা করা হয়েছে. তোমাদেরই স্বভাব, প্রকৃতি, গঠনাকৃতি এবং সূচনা ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে। তোমাদেরই পরিবেশ থেকে এমনসব নিদর্শন বাছাই করে করে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত করে. তোমাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ থেকে দোষ-গুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখানো হচ্ছে, যা সঠিক বলে তোমাদের নিজেদের বিবেকই সাক্ষ দেয়। এসব কথার মধ্যে কী এমন জটিল বিষয় আছে, যা বুঝতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষম ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِيْنَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوْا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾

২ রুকূ'

*কত অত্যাচারী জনবসতিকে আমি বিধ্বস্ত করে দিয়েছি এবং তাদের পর উঠিয়েছি অন্য জাতিকে। যখন তারা আমার আযাব অনুভব করলো,[১৩] পালাতে লাগলো সেখান থেকে। (বলা হলো) "পালায়ো না, চলে যাও তোমাদের গৃহে ও ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে, যেগুলোর মধ্যে তোমরা আরাম করছিলে, হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১৪] বলতে লাগলো, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।" আর তারা এ আর্তনাদ করতেই থাকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে কাটা শস্যে পরিণত না করি, জীবনের একটি স্ফুলিংগও তাদের মধ্যে থাকেনি।*

*এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই আছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে তৈরি করিনি।[১৫]*

১৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আযাব মাথার ওপর এসে পড়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের ধ্বংস এসে গেছে।

১৪. এটি বড়ই অর্থবহ বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন একটু ভালোভাবে এ শাস্তিটি প্রত্যক্ষ করো, যাতে কাল যদি কেউ এর অবস্থা জিজ্ঞেস করে তাহলে যেন ভালোভাবে বলতে পারো। নিজের আগের ঠাটবাট বজায় রেখে সাড়ম্বরে আবার মজলিস গরম করো। হয়তো এখনো তোমাদের চাকরেরা বুকে হাত বেঁধে জিজ্ঞেস করবে, হুজুর, বলুন কি হুকুম। নিজের আগের পরিষদ ও কমিটি নিয়ে বসে যাও, হয়তো এখনো তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ ও জ্ঞানপুষ্ট মতামত থেকে লাভবান হবার জন্য দুনিয়ার লোকেরা তৈরি হয়ে আছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ۝١٧ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝١٨ وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝٢٠ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝٢١

*যদি আমি কোনো খেলনা তৈরি করতে চাইতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম।[১৬] কিন্তু আমি তো মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাত হানি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়িয়ে দেয় এবং সে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়। আর তোমাদের জন্য ধ্বংস! যেসব কথা তোমরা তৈরি করো সেগুলোর বদৌলতে।[১৭]*

*পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যে সৃষ্টিই আছে তা আল্লাহরই।[১৮] আর যে (ফেরেশতারা) তাঁর কাছে আছে[১৯] তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষণ্ন হয়,[২০] দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিরাম-বিশ্রাম নেয় না।*

*এদের তৈরি মাটির দেবতাগুলো কি এমন পর্যায়ের যে, তারা (প্রাণহীনকে প্রাণ দান করে) দাঁড় করিয়ে দিতে পারে?[২১]*

১৫. জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভংগীর কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না এটি হচ্ছে সেই সমগ্র দৃষ্টিভংগির ওপর মন্তব্য। তাদের ধারণা ছিল, মানুষকে দুনিয়ায় এমনিই স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নিজের যা ইচ্ছা সে করবে। যেভাবে চাইবে করবে। তার কোনো কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। কারো কাছে তাকে হিসেব দিতে হবে না। ভালো-মন্দ কয়েক দিনের এই জীবন যাপন করে সবাইকে ব্যস এমনিই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। পরবর্তী কোনো জীবন নেই, যেখানে ভালো কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এসব ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা আসলে একথাই ব্যক্ত করছিল যে, বিশ্ব-জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থা নিছক একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনো গুরুগম্ভীর ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও

www.banglabookpdf.blogspot.com



লক্ষ একে পরিচালিত করছে না। আর এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই তাদের নবীর দাওয়াত অবহেলা করার আসল কারণ ছিল।

১৬. অর্থাৎ যদি আমি খেলা করতেই চাইতাম তাহলে খেলনা বানিয়ে নিজেই খেলতাম। এ অবস্থায় একটি অনুভূতিশীল, সচেতন ও দায়িত্বশীল প্রাণী সৃষ্টি এবং তার মধ্যে সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব ও টানাহেচড়ার অবতারণা করে নিছক নিজের আনন্দ ও কৌতুক করার জন্য অন্যকে অনর্থক কষ্ট দেবার মতো জুলুম কখনোই করা হতো না। তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহ এ দুনিয়াটাকে রোমান সম্রাটদের রংগভূমি (Colosseum) রূপে তৈরি করেননি। এখানে বান্দাদেরকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করিয়ে তাদের শরীরের গোশত ছিঁড়ে উৎক্ষিপ্ত করিয়ে আনন্দের অট্টহাসি হাসা হয় না।

১৭. অর্থাৎ আমি বাজিকর নই। খেলা-তামাসা করা আমার কাজ নয়। আমার এ দুনিয়া একটা বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোনো মিথ্যা এখানে টিকে থাকতে পারে না। মিথ্যা যখনই এখানে মাথা উঠায় তখনই সত্যের সাথে তার অনিবার্য সংঘাত বাধে এবং শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে থাকে। এ দুনিয়াকে যদি তুমি খেলাঘর মনে করে জীবন অতিবাহিত করো অথবা সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করে থাকো তাহলে এর ফল হবে তোমার নিজেরই ধ্বংস। মানব জাতির ইতিহাস দেখো, দুনিয়াকে নিছক একটি খেলাঘর, ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি থালা ও একটি ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি মনে করে যেসব জাতি এখানে জীবন যাপন করেছে এবং নবীগণ কথিত সত্য বিমুখ হয়ে মিথ্যা মতবাদের ভিত্তিতে কাজ করেছে, তারা একের পর এক কোন্ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। তারপর বুদ্ধিমান যখন বুঝাতে থাকে তখন তাকে বিদ্রূপ করা এবং যখন নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল আল্লাহর আযাবের আকারে মাথার ওপর এসে পড়ে তখন "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম" বলে গলা ফাটানো কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

১৮. এখান থেকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক বাতিলের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে। এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়। এখন মুশরিকদেরকে একথা বলা হচ্ছে যে, বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থার মধ্যে তোমরা জীবন যাপন করছো (যে সম্পর্কে এখনই বলা হলো যে, এটা কোনো খেলোয়াড়ের খেলনা নয়, যে সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, এটা একটা বাস্তবানুগ উদ্দেশ্যমুখীন ও সত্যভিত্তিক ব্যবস্থা এবং যে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে মিথ্যা সবসময়ে সত্যের সাথে সংঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।) এর প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে এই যে, এ সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও প্রতিপালক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। অন্যদিকে এ সমগ্র ব্যবস্থাকে বহু ইলাহর মিলিত সাম্রাজ্য মনে করা বা একজন বড় প্রভুর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যান্য ছোট ছোট প্রভুদেরও কিছু শরীকানা আছে বলে মনে করে নেয়াই হচ্ছে এ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা।

১৯. অর্থাৎ আরব মুশরিকরা যেসব ফেরেশতাকে আল্লাহর সন্তান অথবা প্রভুত্ব কর্তৃত্বে শামিল মনে করে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com



لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۞ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۞

*যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো।[২২] কাজেই এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে আরশের রব আল্লাহ[২৩] তা থেকে পাক-পবিত্র। তাঁর কাজের জন্য (কারো সামনে) তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।*

*তাঁকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রমাণ আনো। এ কিতাবও হাজির, যার মধ্যে আছে আমার যুগের লোকদের জন্য উপদেশ এবং সে কিতাবগুলোও হাযির, যেগুলোর মধ্যে ছিল আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য নসীহত।"[২৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সত্য থেকে বেখবর, কাজেই মুখ ফিরিয়ে আছে।[২৫] আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি এ অহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।*

২০. অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের কাছে বিরক্তিকর নয়। এমন নয় যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্লাহর বন্দেগী করতে করতে তাদের মনে কোনো প্রকার মলিনতার সৃষ্টি হয়। মূলে لايستحسرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে استحسار এর মধ্যে ক্লান্তির বাহুল্য পাওয়া যায় এবং এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের ক্লান্তি যা বিরক্তিকর কাজ করার ফলে সৃষ্টি হয়।

২১. মূলে ينشرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি انشار থেকে উদ্ভূত। 'ইনশার' মানে হচ্ছে কোনো পড়ে থাকা প্রাণহীন বস্তুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া। যদিও এ শব্দটিকে কুরআন মজীদে সাধারণত মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তবুও

www.banglabookpdf.blogspot.com



এর পারিভাষিক অর্থ বাদ দিলে মূল আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি এ শব্দটি এখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এবং যাদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিষ্প্রাণ বস্তুর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? যদি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ শক্তি না থেকে থাকে আর আরবের মুশরিকরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, এ শক্তি কারো মধ্যে নেই—তাহলে তারা তাদেরকে ইলাহ ও মাবুদ বলে মেনে নিচ্ছে কেন?

২২. এটি একটি সরল ও সোজা যুক্তি আবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণও। এটি এত সহজ সরল কথা যে, একজন মরুচারী বেদুঈন, সরল গ্রামবাসী এবং মোটা বুদ্ধির অধিকারী সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। কথাটি হচ্ছে, একটি মামুলি ছোট্ট গৃহের যদি দুজন গৃহকর্তা হয় তাহলে সে গৃহের ব্যবস্থাপনা চারদিনও ভালোভাবে চলতে পারে না। আর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি হচ্ছে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা পৃথিবীর ভূগর্ভ স্তর থেকে নিয়ে দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই একটি বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর অসংখ্য ও অগণিত জিনিসগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সমতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না থাকতো তাহলে এ ব্যবস্থাটি এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না। আর কোনো প্রবল প্রতাপান্বিত আইন এ অসংখ্য বস্তু ও শক্তিকে পূর্ণ সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য না করতে থাকা পর্যন্ত এসব কিছু সম্ভব নয়। এখন এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, বহু স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসকের রাজ্যে একই আইন এ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা সহকারে চলতে পারে? নিয়ম ও শৃংখলা যে বজায় আছে এটাই নিয়ম পরিচালকের একক অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে। আইন ও শৃংখলার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা নিজেই একথার সাক্ষ দেয় যে, ক্ষমতা একই সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত রয়েছে এবং এ সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিভক্ত নয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল ৪৭ ও সূরা আল মু'মিনূন ৮৫ টীকা।)

২৩. "রব্বুল আরশ" অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসক ও মালিক।

২৪. প্রথম যুক্তি দু'টি ছিল বুদ্ধিভিত্তিক এবং এখন এ যুক্তিটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনভিত্তিক ও প্রামাণ্য। এর অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো জাতির পয়গম্বরের প্রতি নাযিল হয়েছে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি খুলে একথা দেখিয়ে দাও যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের সামান্যতম অধিকারী এবং অন্য কেউ ইবাদাত ও বন্দেগীর সামান্যতমও হকদার। তাহলে তোমরা এ কোন্ ধরনের ধর্ম তৈরি করে রেখেছো যার সমর্থনে বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রমাণ নেই এবং আসমানী কিতাবগুলোও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করে না?

২৫. তারা জ্ঞানের নয় অজ্ঞতার কারণে নবীর কথাকে আমল দেয় না। প্রকৃত সত্য তারা জানে না, তাই যারা বুঝাতে চায় তাদের কথার প্রতি দৃষ্টি দেবার দরকারই মনে করে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾

*এরা বলে, "করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেন।"[২৬] সুবহানাল্লাহ! তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তাঁর হুকুমে কাজ করে। যাকিছু তাদের সামনে আছে এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে সবই তিনি জানেন। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[২৭] আর তাদের মধ্যে যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দান করবো, আমার এখানে এটিই যালেমদের প্রতিফল।*

২৬. এখানে আবার ফেরেশতাদেরই কথা বলা হয়েছে। আরবের মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো। পরবর্তী ভাষণ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে যায়।

২৭. মুশরিকরা দু'টি কারণে ফেরেশতাদেরকে মাবুদে পরিণত করতো। এক, তাদের মতে তারা ছিল আল্লাহর সন্তান। দুই, তাদেরকে পূজা (খোশামোদ তোশামোদ) করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য শাফায়াতকারীতে (সুপারিশকারী) পরিণত করতে চাচ্ছিল। যেমন -

وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (يونس : ١٨) এবং

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (الزمر : ٣)

এ আয়াতগুলোতে এ দুটি কারণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এ জায়গায় এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী আকীদা বিশ্বাস খণ্ডন করতে গিয়ে এ সত্যটির ওপর জোর দিয়ে থাকে যে, যাদেরকে তোমরা শাফায়াতকারী গণ্য করছো তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং তাদের গোচরে ও অগোচরে যেসব কথা আছে আল্লাহ সেগুলো জানেন। এ থেকে একথা হৃদয়ংগম করানোই উদ্দেশ্য যে, তারা যখন প্রত্যেক মানুষের সামনের-পেছনেরও গোপন-

www.banglabookpdf.blogspot.com



أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

৩ রুকূ'

*যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করলাম[২৮] এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে।[২৯] তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) মানে না? আর আমি পৃথিবীতে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে[৩০] এবং তার মধ্যে চওড়া পথ তৈরি করে দিয়েছি,[৩১] হয়তো লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নেবে।[৩২] আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ,[৩৩] কিন্তু তারা এমন যে, এ নিদর্শনাবলীর[৩৪] প্রতি দৃষ্টিই দেয় না। আর আল্লাহই রাত ও দিন তৈরি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[৩৫]*

প্রকাশ্য অবস্থা জানে না তখন তারা শাফায়াত করার একচ্ছত্র ও শর্তহীন অধিকার কেমন করে লাভ করতে পারে? কাজেই ফেরেশতা, নবী, সৎলোক প্রত্যেকের শাফায়াত করার এখতিয়ার অবশ্য আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ। আল্লাহ তাঁদের কাউকে কোনো ব্যক্তির পক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি দিলে তবেই তিনি তার পক্ষে শাফায়াত করতে পারবেন। নিজেই অগ্রণী হয়ে তাঁরা যে কোনো ব্যক্তির শাফায়াত করতে পারেন না। আর যখন শাফায়াত শোনা বা না শোনা এবং তা কবুল করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তখন এ ধরনের ক্ষমতাহীন শাফায়াতকারীর সামনে মাথা নোয়ানো এবং প্রার্থনার হাত পাতা কিভাবে সমীচীন ও উপযোগী হতে পারে? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ঃ ৮৫-৮৬ টীকা)

২৮. মূলে رتق ও فتق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'রত্‌ক' মানে হচ্ছে একত্র হওয়া, একসাথে থাকা, একজন অন্য জনের সাথে জুড়ে থাকা। আর "ফাত্‌ক" মানে

www.banglabookpdf.blogspot.com



ফেড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা, আলাদা করা। বাহ্যত এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের (MASS) আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ১৩, ১৪, ১৫ টীকা।)

২৯. এ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পানিকে জীবনের উৎপাদক (Cause of life) ও প্রাণের উৎসে পরিণত করেছেন। এরি মধ্যে এবং এ থেকে করেছেন জীবনের সূচনা। কুরআনের অন্য জায়গায় এ বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নূর ঃ ৪৫)

৩০. সূরা আন নাহল-এর ১২ টীকায় এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

৩১. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে এমন গিরিপথ, ঝরণা ও নদী তৈরি করে দিয়েছি যার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার ও পৃথিবীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে চলাফেরা করার জন্য রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অংশকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যার ফলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে যায় বা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

৩২. এটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর এ অর্থও হয় যে, লোকেরা পৃথিবীতে চলাফেরা করার পথ পাবে, আবার এ অর্থও হয় যে, তারা এই জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, কলাকৌশল, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা দেখে মূল সত্যে পৌঁছে যাবার পথ পাবে।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল হিজর ৮, ১০, ১১ ও ১২ টীকা দেখুন।

৩৪. অর্থাৎ আকাশে যে নিদর্শনগুলো আছে সেগুলোর দিকে।

৩৫. كُلٌّ ও يَسْبَحُوْنَ শব্দগুলোই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এর অর্থ শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও। নয়তো বহুবচনের পরিবর্তে একবচন ব্যবহার করা হতো। فَلَكٌ শব্দটি আমাদের ভাষায় চক্র শব্দের সমার্থক। আরবী ভাষায় এটি আসমান বা আকাশ শব্দের পরিচিত অর্থই প্রকাশ করে। "সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে"—এ থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোনো জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটিগুলো নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোনো প্রবহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোনো বস্তু যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। (আরো বেশী ব্যাখার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন ৩৭ টীকা দেখুন।)

প্রাচীন যুগে লোকদের কাছে আকাশ ও পৃথিবীর একত্র হওয়া (رَتْق) ও পৃথক হয়ে যাওয়া (فَتْق) পানি থেকে প্রত্যেক সজীব সত্তাকে সৃষ্টি করা এবং গ্রহ নক্ষত্রের এক একটি 'ফালাকে' সাঁতার কাটার ভিন্ন অর্থ ছিল। বর্তমান যুগে পদার্থবিদ্যা (Physics)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا
تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ
أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

*আর[৩৬] (হে মুহাম্মাদ!) অনন্ত জীবন তো আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানুষকে দেইনি ; যদি তুমি মরে যাও তাহলে এরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৩৭] আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি,[৩৮] শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।*

*এ সত্য অস্বীকারকারীরা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। বলে, "এ কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে ?"[৩৯] অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা করুণাময়ের যিক্‌রের অস্বীকারকারী।[৪০]*

জীববিদ্যা (Biology) ও জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) অত্যাধুনিক তথ্যাবলী আমাদের কাছে তাদের অর্থ ভিন্নতর করে দিয়েছে। আমরা বলতে পারি না আগামীতে মানুষ যেসব তথ্য সংগ্রহ করবে তার ফলে এ শব্দগুলোর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মোট কথা বর্তমান যুগের মানুষ এ তিনটি আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক তথ্যাবলী অনুযায়ী পাচ্ছে।

এখানে একথাটি অনুধাবন করে নিতে হবে যে, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে নিয়ে كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত ভাষণে শিরক খণ্ডন করা হয়েছে এবং أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে নিয়ে فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে তাওহীদের জন্য ইতিবাচক (Positive) যুক্তি দেয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সামনে বিশ্ব-জাহানের এই যে ব্যবস্থা আছে, এর মধ্যে কি কোথাও এক আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো কোনো সৃষ্টি কৌশল তোমরা দেখতে পাচ্ছো ? একাধিক ইলাহদের কর্মকুশলতায় কি এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং এমন শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে বিশ্ব-জাহান চলতে পারে ? এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাটি সম্পর্কে কি কোনো বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারেন যে, এটা একজন খেলোয়াড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তিনি নিছক নিজের ফূর্তি ও আনন্দ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য কয়েকটি পুতুল বানিয়ে নিয়েছেন, কিছুক্ষণ খেলা করার পর আবার সেগুলো ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন ? এসব কিছু তোমরা নিজেদের

www.banglabookpdf.blogspot.com



চোখে দেখছো এবং এরপরও নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করছো ? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নবী তোমাদের সামনে যে তাওহীদী মতবাদ পেশ করছেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ? এসব নিদর্শনের উপস্থিতিতে তোমরা বলছো فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ (এ নবী কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক) নবী তাওহীদের দাওয়াতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য এ নিদর্শনগুলো কি যথেষ্ট নয় ?

৩৬. এখান থেকে আবার ভাষণের মোড় ঘুরে যাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে যে সংঘাত চলছিল সেদিকে।

৩৭. যে সমস্ত হুমকি ধমকি, বদদোয়া ও হত্যার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাগত জানানো হতো এ হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত জবাব। একদিকে ছিল কুরাইশ নেতারা। তারা প্রতিদিন তাঁর এ প্রচার কার্যের জন্য তাঁকে হুমকি দিতে থাকতো এবং তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বিরোধী আবার বসে বসে যে কোনোভাবে তাঁকে খতম করে দেবার কথাও ভাবতো। অন্যদিকে যে গৃহের কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করতো সে গৃহের সবাই তার শত্রু হয়ে যেতো। মেয়েরা দাঁতে দাঁত পিশে তাঁকে অভিশাপ দিতো ও বদদোয়া করতো। আর গৃহের পুরুষরা তাঁকে ভয় দেখাতো। বিশেষ করে হাবশায় হিজরতের পরে মক্কার ঘরে ঘরে বিলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ এমন একটি বাড়ি পাওয়া কঠিন ছিল যেখান থেকে একজন পুরুষ বা মেয়ে হিজরত করেনি। এরা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অভিযোগ করে বলতো, এ লোকটি আমাদের পরিবার ধ্বংস করে দিয়েছে। এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, ওদের কোনো পরোয়া না করে তুমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করে যাও।

৩৮. অর্থাৎ দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-ধনাঢ্যতা, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে ভালো অবস্থায় তোমরা অহংকারী, জালেম, আল্লাহ বিস্মৃত ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাও কিনা। খারাপ অবস্থায় হিম্মত ও সাহস কমে যাওয়ায় নিম্নমানের ও অবমাননাকর পদ্ধতি এবং অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বসো কি না। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ রকমারী অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ভুল করা উচিত নয়। সে যে অবস্থারই সম্মুখীন হোক, তাকে অবশ্যই পরীক্ষার এ দিকটি সামনে রাখতে হবে এবং সাফল্যের সাথে একে অতিক্রম করতে হবে। কেবলমাত্র একজন বোকা ও সংকীর্ণমনা লোকই ভাল অবস্থায় ফেরাউনে পরিণত হয় এবং খারাপ অবস্থা দেখা দিলে মাটিতে নাক-খত দিতে থাকে।

৩৯. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে বিরূপ কথা বলে। এখানে আরো এতটুকু কথা বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটি তাদের বিদ্রুপের বিষয়বস্তু বর্ণনা করছে না বরং বিদ্রূপ করার কারণ ও ভিত্তিভূমির ওপর আলোকপাত করছে। একথা সুস্পষ্ট যে, এ বাক্যটি মূলত কোনো বিদ্রূপাত্মক বাক্য নয়। বিদ্রূপ তারা অন্যভাবে করে থাকবে এবং এজন্য কোনো অন্য ধরনের ধ্বনি দিয়েও বাক্য উচ্চারণ করে থাকবে, তবে তিনি তাদের মনগড়া উপাস্যদের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতেন বলেই তারা এভাবে মনের ঝাল মিটাতো।

www.banglabookpdf.blogspot.com



خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

*মানুষ দ্রুততাপ্রবণ সৃষ্টি।[৪১] এখনই আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি নিজের নিদর্শনাবলী, আমাকে তাড়াহুড়া করতে বলো না।[৪২]—এরা বলে, "এ হুমকি কবে পূর্ণ হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?" হায়! যদি এ কাফেরদের সেই সময়ের কিছু জ্ঞান থাকতো যখন এরা নিজেদের মুখ ও পিঠ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং এদেরকে কোথাও থেকে সাহায্যও করা হবে না। সে আপদ তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হঠাৎ এমনভাবে চেপে ধরবে যে, তারা তার প্রতিরোধও করতে পারবে না। এবং মুহূর্তকালের অবকাশও লাভ করতে সক্ষম হবে না। তোমার পূর্বের রাসূলদেরকেও বিদ্রূপ করা হয়েছে কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যা নিয়ে বিদ্রূপ করতো, শেষ পর্যন্ত তারই কবলে তাদেরকে পড়তে হয়েছে।*

৪০. অর্থাৎ মূর্তি ও বানোয়াট ইলাহদের বিরোধিতা তাদের কাছে এত বেশী অপ্রীতিকর যে, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবমাননা করে, কিন্তু তারা যে আল্লাহ বিমুখ এবং আল্লাহর নামোল্লেখে তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, নিজেদের এ অবস্থার জন্য তাদের লজ্জাও হয় না।

৪১. মূলে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হয়, "মানুষকে দ্রুততা প্রবণতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" কিন্তু এই শাব্দিক অর্থ বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যেমন নিজের ভাষায় বলি, অমুক ব্যক্তি জ্ঞানের সাগর এবং লোকটি পাষাণ হৃদয়, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায় বলা হয়, তাকে অমুক জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর অর্থ হয়, অমুক জিনিসটি তার প্রকৃতিগত। এখানে خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ বলে যে অর্থ নেয়া হয়েছে অন্য জায়গায় وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا "মানুষ দ্রুততা প্রবণ প্রমাণিত হয়েছে" (বনী ইসরাঈল ঃ ১১) বলে সেই একই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖؗ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪ রুকূ'

*হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, কে তোমাদের রাতে ও দিনে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ?[৪৩] কিন্তু তারা নিজেদের রবের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাদের কাছে কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমার মুকাবিলায় তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে, না আমার সমর্থন লাভ করে। আসল কথা হচ্ছে, তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমি জীবনের উপায়-উপকরণ দিয়েই এসেছি। এমনকি তারা দিন পেয়ে গেছে।[৪৪] কিন্তু তারা কি দেখে না, আমি বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীকে সংকুচিত করে আনছি ?[৪৫] তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ?[৪৬] তাদেরকে বলে দাও, "আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি"— কিন্তু বধিররা ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।*

৪২. পরবর্তী ভাষণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে "নিদর্শনাবলী" বলতে কি বুঝাচ্ছে। তারা যেসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তার মধ্যে আল্লাহর আযাব, কিয়ামত ও জাহান্নামের বিবরণও ছিল। তারা বলতো, এ ব্যক্তি প্রতিদিন আমাদের ভয় দেখায়, বলে, আমাকে অস্বীকার করলে আল্লাহর আযাব আপতিত হবে, কিয়ামতে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করা হবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন অস্বীকার করছি এবং হেসে কুঁদে বেড়াচ্ছি, কোনো আযাব আসতে দেখা যাচ্ছে না এবং কোনো কিয়ামতও হচ্ছে না। এ আয়াতগুলোয় এরই জবাব দেয়া হয়েছে।

৪৩. অর্থাৎ যদি রাতের বা দিনের কোনো সময় অকস্মাৎ আল্লাহর মহাপরাক্রমশালী হাত তোমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে তখন তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিশালী সহায়ক ও সাহায্যকারী তোমাদের কে আছে ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى وَهٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ أَنْزَلْنٰهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٥٠﴾

*আর যদি তোমার রবের আযাব তাদেরকে সামান্য স্পর্শ করে যায়,[৪৭] তাহলে তারা তৎক্ষণাত চিৎকার দিয়ে উঠবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।*

*কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওযন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম যুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।[৪৮]*

*পূর্বে[৪৯] আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও 'যিকির'[৫০] এমনসব মুত্তাকীদের কল্যাণার্থে[৫১] যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসেবে নিকেশের) সে সময়ের[৫২] ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর এখন এ বরকত সম্পন্ন যিকির আমি (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করো ?*

৪৪. অর্থাৎ আমার এ মেহেরবানী ও প্রতিপালন থেকে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, এসব কিছু তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং এগুলো ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই। নিজেদের সমৃদ্ধি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে এমনই মত্ত হয়ে গেছে যে, তাদের মনে কখনো একথা একবারও জাগেনী যে, উপরে আল্লাহ বলে একজন আছেন, যিনি তাদের ভাঙা-গড়ার ক্ষমতা রাখেন।

৪৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'আদের ৪১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রা'আদ, ৬০ টীকা)। এখানে এ প্রেক্ষাপটে এটি অন্য একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর চারদিকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



একটি বিজয়ী ও পরাক্রান্ত শক্তির কর্মতৎপরতার নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, আবার কখনো প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরম এবং কখনো অন্য কিছু দেখা দেয়। এভাবে আকস্মিক বিপদ-আপদ মানুষের সমস্ত কীর্তি ও কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়ে যায়। হাজার হাজার, লাখো লাখো লোক মারা যায়। জনবসতী ধ্বংস হয়ে যায়। সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেতগুলো বিধ্বস্ত হয়। উৎপাদন কমে যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। মোট কথা মানুষের জীবন ধারণের উপায় উপকরণের কখনো এদিক থেকে আবার কখনো ওদিক থেকে ঘাটতি দেখা দেয়। নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেও মানুষ এ ক্ষতির পথ রোধ করতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আস সাজদাহ ৩৩ টীকা)

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের সমস্ত জীবনোপকরণ আমার হাতে রয়েছে, আমি যে জিনিসটি চাই কমিয়ে দিতে পারি, যেটি চাই বন্ধ করে দিতে পারি, সে ক্ষেত্রে তারা কি আমার মোকাবিলায় বিজয়ী হবার এবং আমার পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার ক্ষমতা রাখে ? এ নিদর্শনাবলী কি তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করে যে, তাদের শক্তি চিরস্থায়ী, তাদের আয়েশ-আরাম কোনোদিন নিশেষিত হবে না এবং তাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই ?

৪৭. সে আযাব যা দ্রুত নিয়ে আসার জন্য তারা জোরেশোরে দাবি জানাচ্ছে এবং বিদ্রূপের স্বরে বলছে, নিয়ে এসো সেই আযাব, কেন তা আমাদের ওপর নেমে আসছে না ?

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ ৮-৯টীকা। এই দাঁড়িপাল্লা কোন ধরনের হবে তা অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন। মোটকথা সেটি এমন কোনো জিনিস হবে, যা বস্তু ওজন করার পরিবর্তে মানুষের নৈতিক গুণাবলী, কর্মকাণ্ড ও তার পাপ-পুণ্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর নৈতিক দিক দিয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে। পুণ্যবান হলে কি পরিমাণ পুণ্যবান এবং পাপী হলে কি পরিমাণ পাপী। মহান আল্লাহ এর জন্যে আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে "দাঁড়িপাল্লা" শব্দ এ জন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এর ধরনটি হবে দাঁড়িপাল্লার সাথে সাঞ্জস্যশীল অথবা এ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লাহ যেমন দুটি জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আমার ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাহও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজকর্ম যাচাই করে কোনো প্রকার কমবেশী না করে তার মধ্যে পুণ্যের না পাপের কোন দিকটি প্রবল তা একদম হুবহু বলে দেয়।

৪৯. এখান থেকে নবীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। একের পর এক বেশ কয়েক জন নবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যে প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা এসেছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত কথাগুলো অনুধাবন করানোই যে এর উদ্দেশ্য তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

এক ঃ পূর্বের সকল নবীই মানুষ ছিলেন, তাঁরা কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, ইতিহাসে আজ এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৫ রুকূ'

*এরও আগে আমি ইবরাহীমকে শুভ বুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে খুব ভালোভাবেই জানতাম।[৫৩] সে সময়ের কথা স্মরণ করো[৫৪] যখন, সে তার নিজের বাপকে ও জাতিকে বলেছিল ঃ "এ মূর্তিগুলো কেমন, যেগুলোর প্রতি তোমরা ভক্তিতে গদগদ হচ্ছো ?" তারা জবাব দিল ঃ "আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি।" সে বললো, "তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই অবস্থান করছিল।" তারা বললো, "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার প্রকৃত মনের কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো ?"[৫৫]*

দুই ঃ আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করছেন পূর্বে নবীগণও সেই একই কাজ করতে এসেছিলেন। এটিই ছিল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

তিন ঃ নবীদের সংগে আল্লাহ বিশেষ ব্যবহার করেন ও বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তারা বড় বড় বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন। বছরের পর বছর বিপদের মুখোমুখি হতে থাকেন। একক ও ব্যক্তিগত বিপদে এবং বিরোধীদের সৃষ্ট বিপদেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা লাভ করেন। তিনি তাঁদের প্রতি নিজের রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তাঁদের দোয়া কবুল করেন ও কষ্ট দূর করেন। তাঁদের বিরোধীদেরকে পরাজিত করেন এবং অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

চার ঃ মহান আল্লাহর প্রিয়তম ও তাঁর দরবারে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর পক্ষ থেকে বড় বড় বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করার পরও তাঁরা ছিলেন বান্দা ও মানুষই। তাঁদের কেউই খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী হননি। মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা ভুলও করতেন। রোগগ্রস্তও হয়ে পড়তেন। পরীক্ষায়ও তাঁদের ফেলা হতো। এমনকি ভুলচুকও তাঁদের দ্বারা হয়ে যেতো। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে শুধরে দেয়া হতো।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৫০. এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে তাওরাতের পরিচয় দান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মানদণ্ড, মানুষকে সত্য-সরল পথ দেখাবার আলোকবর্তিকা এবং মানব জাতিকে তার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেবার উপদেশ।

৫১. অর্থাৎ যদিও তা পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু তা থেকে কার্যত লাভবান তারাই হতে পারতো যারা ছিল এসব গুণে গুণান্বিত।

৫২. যার আলোচনা এই মাত্র উপরে করা হলো অর্থাৎ কিয়ামত।

৫৩. আমি এখানে "رشـد" শব্দের অনুবাদ করেছি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" রুশদ এর অর্থ হচ্ছে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে সঠিক কথা বা পথ অবলম্বন করা এবং বেঠিক কথা ও পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। এ অর্থের প্রেক্ষিতে "রুশদ" এর অনুবাদ "সত্যনিষ্ঠা"ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু রুশ্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা নয় বরং এমন সত্যজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করে যা হয় সঠিক চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহারের ফলশ্রুতি তাই আমি "শুভবুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান" এই দু'টি শব্দকে একত্রে এর অর্থের কাছাকাছি পেয়েছি।

"ইবরাহীমকে তার সত্যজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি দান করেছিলাম।" অর্থাৎ সে যে সত্যের জ্ঞান ও শুভবুদ্ধির অধিকারী ছিল তা আমিই তাকে দান করেছিলাম।

"আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম।" অর্থাৎ আমি চোখ বন্ধ করে তাকে এ দান করিনি। আমি জানতাম সে কেমন লোক । সব জেনেশুনেই তাকে দান করেছিলাম। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ "আল্লাহ ভালো জানেন নিজের রিসালাত কাকে সোপর্দ করবেন।" (আনআম ঃ ১২৪) এর মধ্যে কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে আপত্তি করতো তার প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। তারা বলতো এ ব্যক্তির মধ্যে এমন কি অসাধারণ বৈশিষ্ট আছে যে, আল্লাহ আমাদের বাদ দিয়ে তাকেই রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন ? এর জবাব কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র এতটুকু সূক্ষ্ম ইংগিত করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্ন ইবরাহীম সম্পর্কেও হতে পারতো! বলা যেতে পারতো যে, সারা ইরাক দেশে একমাত্র ইবরাহীমকেই কেন এ অনুগ্রহে অভিসিক্ত করা হলো ? কিন্তু আমি জানতাম ইবরাহীমের মধ্যে কি যোগ্যতা আছে। তাই তার সমগ্র জাতির মধ্য থেকে একমাত্র তাকেই এ অনুগ্রহ দান করার জন্য বাছাই করা হয়।

ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র সীরাতের বিভিন্ন দিক সূরা বাকারার ১২৪ থেকে ১৪১ ও ২৫৮ থেকে ২৬০, আন'আমের ৭৪ থেকে ৮১, তওবার ১১৪, হূদের ৬৯ থেকে ৭৪, ইবরাহীমের ৩৫ থেকে ৪১, আল হিজরের ৫১ থেকে ৬০ এবং আন নহলের ১২০ থেকে ১২৩ আয়াতে আলোচিত হয়ছে। এর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হবে।

৫৪. সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তা পড়ার আগে একথাগুলো মনের মধ্যে তাজা করে নিতে হবে যে, কুরাইশরা হযরত ইবরাহীমের সন্তান ছিল। কাবাঘর তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। সারা আরবে কাবার কেন্দ্রীয় ভূমিকা তাঁর সাথে সম্পর্কের কারণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইবরাহীমের আওলাদও ইবরাহিমী কাবার খাদেম হবার

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

*সে জবাব দিল, "না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং এদের স্রষ্টা। এর স্বপক্ষে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ দিচ্ছি। আর আল্লাহর কসম, তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।"[৫৬] সে অনুসারে সে সেগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো[৫৭] এবং শুধুমাত্র বড়টিকে ছেড়ে দিল, যাতে তারা হয়তো তার দিকে ফিরে আসতে পারে।[৫৮] (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ অবস্থা দেখে) বলতে লাগলো, "আমাদের ইলাহদের এ অবস্থা করলো কে, বড়ই জালেম সে।"*

*(কেউ কেউ) বললো, "আমরা এক যুবককে এদের কথা বলতে শুনেছিলাম, তার নাম ইবরাহীম।" তারা বললো, "তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো সবার সামনে, যাতে লোকেরা দেখে নেয়" (কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হয়)।[৫৯]*

কারণেই কুরাইশরা যাবতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। আজ এ যুগে এবং আরবের বহু দূরবর্তী এলাকার পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনী শুধুমাত্র একটি শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই দেখা যায় কিন্তু যে যুগে ও পরিবেশে প্রথম প্রথম একথা বলা হয়েছিল, তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে অনুভূত হবে যে, করাইশদের ধর্ম ও তাদের পৌরহিত্যের ওপর এটা এমন একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাত ছিল, যা একেবারে তার মর্মমূলে আঘাত হানতো।

৫৫. এ বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, 'তুমি কি আমাদের সামনে সত্য পেশ করছো, না খেলা করছো ?" কিন্তু এর আসল অর্থ ওটাই যা উপরে অনুবাদে বলা হয়েছে। নিজেদের ধর্মের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তারা গুরুত্ব সহকারে কেউ একথা বলতে পারে বলে কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা বললো, তুমি নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলা-তামাশা করছো, না কি প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমার চিন্তাধারা ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالُوٓا ءَاَنتَ فَعَلۡتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبۡرٰهِيۡمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلۡ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيۡرُهُمۡ هٰذَا فَسۡـَٔلُوۡهُمۡ اِنۡ كَانُوۡا يَنۡطِقُوۡنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوٓا اِلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ فَقَالُوٓا اِنَّكُمۡ اَنۡتُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوۡا عَلٰى رُءُوۡسِهِمۡ ۚ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنۡطِقُوۡنَ ﴿٦٥﴾

*(ইবরাহীমকে নিয়ে আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করলো, "ওহে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের ইলাহদের সাথে এ কাণ্ড করেছো ?" সে জবাব দিল, "বরং এসব কিছু এদের এ সরদারটি করেছে, এদেরকেই জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।"৬০ একথা শুনে তারা নিজেদের বিবেকের দিকে ফিরলো এবং (মনে মনে) বলতে লাগলো, "সত্যিই তোমরা নিজেরাই যালেম।" কিন্তু আবার তাদের মত পাল্টে গেলো৬১ এবং বলতে থাকলো, "তুমি জানো, এরা কথা বলে না।"*

৫৬. অর্থাৎ যদি তোমরা যুক্তির সাহায্যে কথা বুঝতে অপারগ হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাদেরকে কার্যত দেখিয়ে দেবো যে, এরা অসহায়, সামান্যতম ক্ষমতাও এদের নেই এবং এদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে একথা তাদের সামনে কেমন করে প্রমাণ করবেন, এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় দেননি।

৫৭. অর্থাৎ যে সময় পূজারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীরা উপস্থিত ছিল না সে সময় সুযোগ পেয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের কেন্দ্রীয় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

৫৮. "তার দিকে" কথাটির মধ্যে যে ইংগিত রয়েছে তা বড় মূর্তিটির দিকেও হতে পারে আবার হযরত ইবরাহীমের দিকেও। যদি প্রথমটি হয় তাহলে এটি হবে হযরত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের প্রতি একটি বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষের সমার্থক। অর্থাৎ যদি তারা মনে করে থাকে সত্যিই এরা ইলাহ, তাহলে তাদের এ বড় ইলাহটির ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত যে, সম্ভবত বড় ইলাহ কোনো কারণে ছোট ইলাহদের প্রতি বিরূপ হয়ে গিয়ে তাদের সবাইকে কচুকাটা করে ফেলেছেন। অথবা বড় ইলাহটিকে জিজ্ঞেস করো যে, হুযুর ! আপনার উপস্থিতিতে একি ঘটে গেলো ? কে এ কাজ করলো ? আপনি তাকে বাধা দিলেন না কেন ? আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, এ কাজের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীমের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিজেদের মূর্তিগুলোর এ দুরবস্থা দেখে হয়তো তাদের দৃষ্টি আমার দিকে ফিরে আসবে এবং তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তখন তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৫৯. এভাবে হযরত ইবরাহীমের মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। ব্যাপারটিকে তিনি শুধু পুরোহিত ও পূজারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। এভাবে এ পুরোহিতরাও ফেরাউনের মতো একই ভুল করলো। ফেরাউন যাদুকরদের সাথে হযরত মূসা (আ)-কে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করেছিল, এরাও হযরত ইবরাহীমের মামলা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষকে একত্র করলো। সেখানে হযরত মূসা সবার সামনে একথা প্রমাণ করার সযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি যা কিছু এনেছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা। এখানে হযরত ইবরাহীমকেও তাঁর শত্রুরাই সুযোগ দিয়ে দিল যেন জনগণের সামনে তাদের ধোঁকাবাজীর তেলেসমাতি ছিন্নভিন্ন করতে পারেন।

৬০. এ শেষ বাক্যটি স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, প্রথম বাক্যে হযরত ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গার দায় যে বড় মূর্তিটির ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তার দ্বারা মিথ্যা বলা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি নিজের বিরোধীদেরকে প্রমাণ দর্শাতে চাচ্ছিলেন। তারা যাতে জবাবে নিজেরাই একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ উপাস্যরা একেবারেই অসহায় এবং এদের দ্বারা কোনো উপকারের আশাই করা যায় না। তাই তিনি একথা বলেছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য যে বাস্তব ঘটনা বিরোধী কথা বলে তাকে মিথ্যা গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ মিথ্যা বলার নিয়তে সে এমন কথা বলে না এবং তার বিরোধীও একে মিথ্যা মনে করে না। বক্তা প্রমাণ নির্দেশ করার জন্য একথা বলে এবং শ্রোতাও একে সেই অর্থেই গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের এক বর্ণনায় একথা এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জীবনে তিনবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে এটি একটি "মিথ্যা।" দ্বিতীয় "মিথ্যা" হচ্ছে, সূরা সাফ্‌ফাতে হযরত ইবরাহীমের "إِنِّي سَقِيمٌ" কথাটি। আর তৃতীয় "মিথ্যাটি" হচ্ছে তাঁর নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচিত করানো। একথাটি কুরআনে নয় বরং বাইবেলের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে। এক শ্রেণীর বিদ্বানদের "রেওয়ায়াত" প্রীতির ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের কাছে বুখারী ও মুসলিমের কতিপয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতাই বেশী প্রিয় এবং এর ফলে যে একজন নবীর ওপর মিথ্যা বলা অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে, তার কোনো পরোয়াই তাদের নেই। অপর একটি শ্রেণী এই একটিমাত্র হাদীসকে ভিত্তি করে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, সমস্ত হাদীসের স্তূপ উঠিয়ে দূরে ছুঁড়ে দাও। কারণ এর মধ্যে যতো আজেবাজে ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। অথচ কোনো একটি বা কতিপয় হাদীসের মধ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাবার কারণে সমস্ত হাদীস অনির্ভরযোগ্য হয়ে যাবে—এমন কোনো কথা হতে পারে না। আর হাদীস শাস্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা মজবুত হওয়ার ফলে এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, তার "মতন" (মূল হাদীস) যতই আপত্তিকর হোক না কেন তাকে চোখ বন্ধ করে "সহী" বলে মেনে নিতে হবে। বর্ণনা পরম্পরা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হবার পরও এমন অনেক কারণ থাকতে পারে, যার

www.banglabookpdf.blogspot.com



ফলে একটি "মতন" ত্রুটিপূর্ণ আকারে উদ্ধৃত হয়ে যায় এবং এমন সব বিষয়বস্তু সম্বলিত হয় যে, তা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃত হতে পারে না। তাই সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরার সাথে সাথে "মতন"-ও দেখা অপরিহার্য। যদি মতনের মধ্যে সত্যিই কোনো দোষ থেকে থাকে তাহলে এরপরও অযথা তার নির্ভুলতার ওপর জোর দেয়া মোটেই ঠিক নয়।

যে হাদীসটিতে হযরত ইবরাহীমের তিনটি "মিথ্যা কথা" বর্ণনা করা হয়েছে সেটি কেবলমাত্র এ কারণে আপত্তিকর নয় যে, এটি একজন নবীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছে বরং এ কারণেও এটি ত্রুটিপূর্ণ যে, এখানে যে তিনটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই বিতর্কিত। এর মধ্যে একটি "মিথ্যার" অবস্থা তো পাঠক এইমাত্র দেখলেন। সামান্য বুদ্ধি জ্ঞানও যার আছে তিনি কখনো এই প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীমের এই বক্তব্যকে "মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নাউযুবিল্লাহ আমরা এমন ধারণা তো করতেই পারি না যে, তিনি এই বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝবেন না এবং খামাখাই একে মিথ্যা ভাষণ বলে আখ্যায়িত করবেন। আর إِنِّىْ سَقِيْمٌ সংক্রান্ত ঘটনাটির ব্যাপারে বলা যায়, এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ছিলেন এবং তিনি সামান্যতম অসুস্থতায়ও ভুগছিলেন না। একথা কুরআনে কোথাও বলা হয়নি এবং আলোচ্য হাদীসটি ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এ আলোচনা আসেনি। এখন বাকী থাকে স্ত্রীকে বোন বলার ঘটনাটি। এ ব্যাপরটি এত বেশী উদ্ভট যে, কাহিনীটি শোনার পর কোনো ব্যক্তি প্রথমেই বলে বসবে এটা কোনো ঘটনাই হতে পারে না। এটি বলা হচ্ছে তখনকার কাহিনী যখন হযরত ইবরাহীম নিজের স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসরে যান। বাইবেলের বর্ণনামতে তখন হযরত ইবরাহীমের বয়স ৭৫ বছর ও হযরত সারার বয়স ৬৫ বছরের কিছু বেশী ছিল। এ বয়সে হযরত ইবরাহীম ভীত হলেন মিসরের বাদশাহ এ সুন্দরীকে লাভ করার জন্য তাঁকে হত্যা করবেন। কাজেই তিনি স্ত্রীকে বললেন, যখন মিসরীয়রা তোমাকে ধরে বাদশাহর কাছে নিয়ে যেতে থাকবে তখন তুমি আমাকে নিজের ভাই বলবে এবং আমিও তোমাকে বোন বলবো, এর ফলে আমি প্রাণে বেঁচে যাবো। (আদি পুস্তক ঃ ১২ অধ্যায়) হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যাটির ভিত্তি এই সুস্পষ্ট বাজে ও উদ্ভট ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে হাদীসের 'মতন' এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্য সম্বলিত তাকেও আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি বলে মেনে নেবো কেমন করে—তা তার 'সনদ' যতই ত্রুটিমুক্তি হোক না কেন ? এ ধরনের একপেশে চিন্তা বিষয়টিকে বিকৃত করে অন্য এক বিভ্রান্তির উদ্ভট ঘটায় যার প্রকাশ ঘটাচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আমার লিখিত বই রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ড , কতিপয় হাদীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার জবাব নিবন্ধের ১২ নং জবাব)

৬১. মূলে نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ (মাথা নিচের দিকে উলটিয়ে দেয়া হলো) বলা হয়েছে । কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, তারা লজ্জায় মাথা নত করলো। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও বর্ণনা ভংগী এ অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। বক্তব্য পরম্পরা ও বক্তব্যের ধরনের প্রতি নজর দিলে যে সঠিক অর্থটি পরিষ্কার বুঝা যায় সেটি হচ্ছে এই যে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا
حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

*ইবরাহীম বললো, "তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব জিনিসের পূজা করছো যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি ? ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যের তোমরা পূজা করছো তাদেরকে। তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নেই ?" তারা বললো, "পুড়িয়ে ফেলো একে এবং সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।" আমি বললাম ঃ "হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"[৬২] তারা চাচ্ছিল ইবরাহীমের ক্ষতি করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যর্থ করে দিলাম। আর আমি তাকে ও লূতকে[৬৩] বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৬৪]*

হযরত ইবরাহীমের জবাব শুনে প্রথমেই তারা মনে মনে ভাবলো, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই তো জালেম। কেমন অসহায় ও অক্ষম দেবতাদেরকে তোমরা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছো, যারা নিজমুখে তাদের ওপর কি ঘটে এবং কে তাদেরকে ভেঙ্গে চুরে রেখে দিয়েছে একথা বলতে পারে না। যারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে না তারা তোমাদেরকে কিভাবে বাঁচাবে। কিন্তু এর পরপরই আবার তাদের ওপর জিদ ও মূর্খতা চড়াও হয়ে গেলো এবং জিদের বৈশিষ্ট অনুযায়ী তা চড়াও হবার সাথে সাথেই তাদের বুদ্ধি উল্টোমুখী হয়ে গেলো। মস্তিষ্ক সোজা ও সঠিক চিন্তা করতে করতে হঠাৎ উল্টো চিন্তা করতে আরম্ভ করলো।

৬২. শব্দাবলী পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এবং পূর্বাপর বক্তব্যও এ অর্থ সমর্থন করছে যে, তারা সত্যিই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। অন্যদিকে আগুনের কুণ্ড তৈরি হয়ে যাবার পর তারা যখন হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে ফেলে দেয় তখন মহান আল্লাহ আগুনকে হুকুম দেন সে যেন ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তাঁর কোনো ক্ষতি না করে। বস্তুত কুরআনে সুস্পষ্টভাবে যেসব মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এটিও তার অন্তরভুক্ত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ মু'জিযাগুলোকে সাধারণ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য জোড়াতালি

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۷۲﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿۷۳﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿۷۴﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾

*আর তাকে আমি ইসহাককে দান করলাম এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুব[৬৫] এবং প্রত্যেককে করলাম সৎকর্মশীল। আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথনির্দেশনা দিতো এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায কায়েম করার ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমার ইবাদাত করতো।[৬৬]*

*আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম[৬৭] এবং তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা বদ কাজে লিপ্ত ছিল—আসলে তারা ছিল বড়ই দুরাচারী পাপিষ্ঠ জাতি—আর লূতকে আমি নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে নিয়েছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত।*

দিয়ে কৃত্রিম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার মতে আল্লাহর জন্যও বিশ্ব-জাহানের প্রচলিত নিয়মের বাইরে অস্বাভাবিক কোনো কিছু করা সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে, আমি জানতে চাই যে, সে আল্লাহকে মেনে নেয়ার কষ্টই বা করতে যাচ্ছে কেন ? আর যদি সে এ ধরনের জোড়াতালির ব্যাখ্যা এ জন্য করে থাকে যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত যুক্তিবাদীরা এ ধরনের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, জনাব! তথাকথিত সেসব যুক্তিবাদীকে যে কোনোভাবেই হোক স্বীকার করাতেই হবে, এ দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে কে চাপিয়ে দিয়েছিল ? কুরআন যেমনটি আছে ঠিক তেমনিভাবে যে তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তার স্বীকৃতি আদায় করার জন্য কুরআনকে তার চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা, যখন কুরআনের মূল বক্তব্যে প্রতিটি শব্দ এ ঢালাইয়ের বিরোধিতা করছে, তখন এটা কোন্ ধরনের প্রচার এবং কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি একে বৈধ মনে করতে পারে ? (বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আনকাবুত ৩৯ টীকা)

www.banglabookpdf.blogspot.com



৬৩. বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নাহূরা ও হারান নামে হযরত ইবরাহীমের দুই ভাই ছিল। হযরত লূত ছিলেন হারানের ছেলে। (আদি পুস্তক ১১ঃ২৬) সূরা আনকাবুতে হযরত ইবরাহীমের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূতই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। (দেখুন ২৬ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোনো এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।

৬৫. অর্থাৎ ছেলের পরে পৌত্রকেও নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি।

৬৬. বাইবেলে হযরত ইবরাহীমের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোনো উল্লেখ নেই। বরং তাঁর জীবনের ইরাকী যুগের কোনো ঘটনাই এ গ্রন্থে স্থান পেতে পারেনি। নমরূদের সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘাত, পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনা এবং সবশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য হওয়া—এসবের কোনোটিই বাইবেলের আদিপুস্তক লেখকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার যোগ্যতা লাভ করেনি। তিনি কেবলমাত্র তাঁর দেশ ত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাও এমন ভংগীতে যেমন একটি পরিবার পেটের ধান্দায় এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনায় এর চাইতেও মজার যে পার্থক্য তা হচ্ছে এই যে, কুরআনের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের মুশরিক পিতা তাঁর প্রতি জুলুম করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বাইবেল বলে, তাঁর পিতা নিজেই পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূদেরকে নিয়ে হারানে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। (আদি পুস্তক ১১ ঃ ৭-৩২) তারপর অকস্মাত একদিন আল্লাহ হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "তুমি হারান ত্যাগ করে কেনানে গিয়ে বসবাস করো এবং "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব। যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব ; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (১২ ঃ ১-৩) বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি বাইবেল প্রণেতার এমন অনুগ্রহ দৃষ্টি কেমন করে হলো ?

অবশ্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীমের জীবনের ইরাকী যুগের যে বিস্তারিত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে তালমূদে তার বেশীর ভাগ আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় বর্ণনা একত্র করলে শুধুমাত্র কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশেই পার্থক্য দেখা যাবে না বরং একথা পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তালমূদের বর্ণনা বহু স্থানে বেখাপ্পা এবং বাস্তবতা ও যুক্তি বিরোধী। অন্যদিকে কুরআন একদম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে হযরত ইবরাহীমের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পেশ করে। সেখানে কোনো অর্থহীন ও আজেবাজে কথা নেই। বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য আমি এখানে তালমূদের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি। এর ফলে যারা কুরআনকে বাইবেল ও ইহুদীবাদী সাহিত্যের চর্বিতচর্বণ গণ্য করে থাকেন তাদের বিভ্রান্তির ধূম্রজাল বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীমের জন্মদিনে জ্যোতিষীরা আকাশে একটি আলামত দেখে তারেহ-এর গৃহে যে শিশুর জন্ম হয়েছে তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। তদনুসারে সে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারেহ নিজের ক্রীতদাসের পুত্রকে তার বিনিময়ে প্রদান করে তাকে বাঁচায়। এরপর তারেহ নিজের স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে একটি পর্বত গুহায় লুকিয়ে রাখে। সেখানে তারা দশ বছর অবস্থান করে। এগার বছর বয়সে হযরত ইবরাহীমকে সে হযরত নূহের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি হযরত নূহ ও তাঁর পুত্র সামের তত্বাবধানে বাস করতে থাকেন। এ সময়ে হযরত ইবরাহীম তাঁর আপন ভাইয়ের মেয়ে সারাহকে বিয়ে করেন। সারাহ তাঁর চেয়ে বয়সে ৪২ বছরের ছোট ছিল। (বাইবেল একথা স্পষ্ট করে বলেনি যে, সারাহ হযরত ইবরাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। আদি পুস্তক ১১ ঃ ২৯ এবং ১৭ ঃ ১৭)

তারপর তালমূদ বলছে, হযরত ইবরাহীম পঞ্চাশ বছর বয়সে হযরত নূহের গৃহ ত্যাগ করে নিজের পিতার গৃহে চলে আসেন। এখানে তিনি দেখেন পিতা মূর্তিপূজারী এবং গৃহে বারো মাসের হিসেবে বারোটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি প্রথমে পিতাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। তাকে বুঝাতে অক্ষম হয়ে একদিন ঘরোয়া মূর্তি মন্দিরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। তারেহ গৃহে এসে নিজের দেবতাদের এ অবস্থা দেখে সোজা নমরূদের কাছে চলে যায়। সেখানে অভিযোগ করে, পঞ্চাশ বছর আগে আমার গৃহে যে সন্তান জন্মেছিল আজ সে আমার ঘরে এ কাজ করেছে, আপনি এর বিহিত ব্যবস্থা করুন। নমরূদ হযরত ইবরাহীমকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি কঠোর জবাব দেন। নমরূদ তখনই তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় তারপর শলা-পরামর্শ করে ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য নিজের পরিষদের সামনে পেশ করে। পরিষদের সদস্যরা পরামর্শ দেয় এ ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হোক। তাই একটি বিরাট আগুনের কুণ্ড তৈরি করা হয় এবং হযরত ইবরাহীমকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর ভাই ও শ্বশুর হারানকেও নিক্ষেপ করা হয়। কারণ নমরূদ যখন তারেহকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এ ছেলেকে তো আমি এর জন্মের দিনেই হত্যা করতে চেয়েছিলাম, তুমি তখন একে বাঁচিয়ে এর বিনিময় অন্য শিশু হত্যা করিয়েছিলে কেন ? এর জবাবে তারেহ বলে, আমি হারানের কথায় এ কাজ করেছিলাম। তাই এ কাজ যে করেছিল তাকে ছেড়ে দিয়ে পরামর্শদাতাকে হযরত ইবরাহীমের সাথে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই হারান জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় কিন্তু হযরত ইবরাহীমকে লোকেরা দেখে তিনি তার মধ্যে নিশ্চিন্তে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নমরূদকে এ ব্যাপারে জানানো হয়। সে এসে স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলে, "ওহে আসমানের ইলাহর বান্দা ! আগুন থেকে বের হয়ে এসো এবং আমার সামনে দাঁড়াও।" হযরত ইবরাহীম বাইরে আসেন। নমরূদ তার ভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে বহু মূল্যবান নজরানা দিয়ে বিদায় করে।

এরপর তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম দু'বছর পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর নমরূদ একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। তার জ্যোতিষীরা এর তাবীর বর্ণনা করে বলে, ইবরাহীম আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হবে কাজেই তাকে হত্যা করুন। সে তাঁকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠায়। কিন্তু স্বয়ং নমরূদের প্রদত্ত একজন গোলাম আল ইয়াযার

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

৬ রুকূ'

*আর এ একই নিয়ামত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল,[৬৮] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ[৬৯] থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর এমন সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।*

*আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।[৭০]*

*দাউদের সাথে আমি পর্বতরাজী ও পক্ষীকুলকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,[৭১] এ কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।*

পূর্বাহ্নেই তাকে এ পরিকল্পনার খবর দেয়। ফলে হযরত ইবরাহীম পালিয়ে হযরত নূহের কাছে আশ্রয় নেন। সেখানে তারেহ এসে তাঁর সাথে গোপনে দেখা করতে থাকে। শেষে পিতাপুত্র পরামর্শ করে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। হযরত নূহ ও সামও এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন। এভাবে তারেহ স্বীয় পুত্র ইবরাহীম, পৌত্র লূত এবং পৌত্রি ও পুত্রবধু সারাহকে নিয়ে উর থেকে হারান চলে আসে। (তালমূদ নির্বাচিত অংশ, এইচ, পোলানো লণ্ডন, পৃষ্ঠা ৩০-৪২)

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ বর্ণনা দেখে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি একথা বলতে পারে যে, এটি কুরআনের উৎস হতে পারে ?

৬৭. মূলে "হুকুম ও ইলম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন সাধারণত হুকুম ও ইলম দান নবুওয়াত দান করার সমার্থক হয়। "হুকুম" অর্থ প্রজ্ঞাও হয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও হয়, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব করার বিধিসংগত অনুমতি (Authority) লাভও হয়। আর "ইলম"-এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য ও যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। হযরত লূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন সূরা আ'রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

৬৮. হযরত নূহের দোয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দোয়া করেছিলেন اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ। "পরওয়ারদেগার ! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার ঃ ১০) এবং رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا "হে আমার রব। পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।" (সূরা নূহ ঃ ২৬)

৬৯. "মহাবিপদ" অর্থ একটি অসৎ কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্লাবন। হযরত নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হুদ ২৫-৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ।

৭০. বাইবেলে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়নি। ইহুদী সাহিত্যেও আমরা এর কোনো চিহ্ন দেখি না। মুসলমান তাফসীরকারগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির শস্যক্ষেতে অন্য এক ব্যক্তির ছাগলগুলো রাতের বেলা ঢুকে পড়ে। সে হযরত দাউদের কাছে অভিযোগ করে। তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছাগলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিয়ে দেবার ফায়সালা শুনিয়ে দেন। হযরত সুলায়মান এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো ততদিন পর্যন্ত ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে যতদিন না সে আবার নিজের ক্ষেত শস্যে পূর্ণ করে নিতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলছেন, সুলায়মানকে এ ফায়সালাটি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মোকদ্দমার এ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীসেও এ বিবরণ আসেনি তাই একথা বলা যেতে পারে না যে, এ ধরনের মামলায় এটিই ইসলামী শরীয়াতের প্রামাণ্য আইন। এ কারণেই হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও অন্যান্য ইসলামী ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে যে, যদি কারো ক্ষেত অন্যের পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা এবং দিতে হলে কোন্ অবস্থায় হবে এবং কোন্ অবস্থায় হবে না, তাছাড়া কিভাবে এ ক্ষতিপূরণ করা হবে। ?

এ প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) এ বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, নবীগণ নবী হবার এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষই হতেন। আল্লাহর সার্বভৌম

www.banglabookpdf.blogspot.com



কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে থাকতো না। এ মোকদ্দমার ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে হযরত দাউদকে সাহায্য করা হয়নি। ফলে তিনি ফায়সালা করার ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে হযরত সুলায়মানকে অহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে তিনি সঠিক ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ দু'জনই নবী ছিলেন। সামনের দিকে এ উভয় নবীর যেসব দক্ষতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাও একথা বুঝাবার জন্যে যে, এসব আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতা এবং এ ধরনের দক্ষতার কারণে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যায় না।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতিও জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দুজনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। বুখারীতে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

"যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু'টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবী (স) বলেছেন ঃ "বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক, যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।"

৭১. মূলে مَعَ دَاوُدَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, لِدَاوُدَ বলা হয়নি। অর্থাৎ "দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য" নয় বরং "তাঁর সাথে" পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

"আমি তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সাঁঝে তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর পাখিদেরকেও অনুগত করা হয়েছিল। তারা একত্র হতো, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মাহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করতো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۞ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۞ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۞

*আর আমি তাকে তোমাদের উপকারার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্প শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে,[৭২] তাহলে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে?[৭৩] আর সুলাইমানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম[৭৪] আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি। আর শয়তানের মধ্য থেকে এমন অনেককে আমি তার অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য কাজও করতো, আমিই ছিলাম এদের সবার তত্ত্বাবধায়ক।[৭৫]*

সূরা সাবায় এর ওপর অতিরিক্ত বলা হয়েছে يَا جِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ "পাহাড়গুলোকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম যে, তাঁর সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।" এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তাঁর উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় গুঞ্জরিত হতো, পাখিরা থেমে যেতো এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। এ অর্থের সমর্থন একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেন لقد اوتى مزمارا من مزامير ال داود অর্থাৎ এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।

সূরা সাবায় এর ওপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ

www.banglabookpdf.blogspot.com



"আর আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি (এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছি) যে, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করো এবং বুনন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করো।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ হযরত দাউদকে লোহা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম নির্মাণের কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ আয়াতের অর্থের ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে লৌহ যুগ (Iron age) শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। আর এটিই ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ। প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের হিত্তী (Hittites) জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গলাবার ও নির্মাণের একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে লোহা তৈরি হতো তা সোনা রূপার মতো এত বেশী মূল্যবান হতো যে, তা সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেত না। পরে ফিলিস্তিনীরা এ পদ্ধতি জেনে নেয় এবং তারাও একে গোপন রাখে। তালুতের রাজত্বের পূর্বে হিত্তী ও ফিলিস্তিনীরা বনী ইসরাঈলকে যেভাবে উপর্যুপরী পরাজিত করে ফিলিস্তীন থেকে প্রায় বেদখল করে দিয়েছিল বাইবেলের বর্ণনা মতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, তারা লোহার রথ ব্যবহার করতো এবং তাদের কাছে লোহার তৈরি অন্যান্য অস্ত্রও থাকতো। (যিহোশূয় ১৭ ঃ ১৬, বিচারকর্তৃগণ ১ ঃ ১৯, ৪ ঃ ২-৩) খৃষ্ট পূর্ব ১০২০ অব্দে তালূত যখন আল্লাহর হুকুমে বনী ইসরাঈলদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাদেরকে পরপর কয়েকবার পরাজিত করে ফিলিস্তীনের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন। তারপর হযরত দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খৃঃ পূঃ) শুধুমাত্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দানই নয় বরং সিরিয়ারও বড় অংশে ইসরাঈলী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তীনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র উন্মোচিত হয়েই থেমে যায়নি বরং লৌহ নির্মাণের এমন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্রও তৈরি হতে থাকে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আদূম এলাকা আকরিক লোহায় (Iron ore) সমৃদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এ এলাকায় যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয় তার ফলে এমন অনেক জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লী বসানো ছিল। আকাবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লী পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমনসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের অত্যাধুনিক যুগের Blast Furnace এ প্রয়োগ করা হয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সবার আগে ও সবচেয়ে বেশী করে এ নতুন আবিষ্কারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকবেন। কারণ কিছুকাল আগেই আশপাশের শত্রু জাতিরা এ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর জাতির জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল।

৭৩. হযরত দাউদ সম্পর্কে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৫১ আয়াত ও বনী ইসরাঈল ৭, ৬৩ টীকা।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৭৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা সাবায় এভাবে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আর সুলায়মানের জন্য আমি বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।"

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাদ-এ। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ .

"কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।"

এ থেকে জানা যায়, বাতাসকে হযরত সুলায়মানের হুকুমে এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোনো স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান তাঁর রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসয়ূন জাবের বন্দর থেকে তাঁর বাণিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ থেকে তাঁর নৌবহর (যাকে বাইবেলে তর্শীশী নৌবহর বলা হয়েছে) পশ্চিম দেশসমূহে যেতো। ইসয়ুন জাবের তাঁর সময়ের যে বিশাল চুল্লী পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোনো চুল্লী আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়নি। প্রত্নতত্ব বিশেষজ্ঞগণের মতে এখানে আদুমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে আশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সূরা সাবায় যে কথা বলা হয়েছে وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (আর আমি তার জন্য গলিত ধাতুর ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম) তার ওপর আলোকপাত হয়। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে হযরত সুলায়মানের জন্য এক মাসের পথ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহকে "বশীভূত" করার অর্থ অনুধাবন করা যায়। সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরোপুরি অনুকূল বাতাসের ওপর নির্ভর করতো। মহান আল্লাহ হযরত সুলায়মানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো। তবুও যদি বাতাসের ওপর হযরত সুলায়মানকে হুকুম চালাবার কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে যেমন تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ (তার হুকুমে চলতো) এর শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের জন্য এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি নিজের রাজ্যের মালিক। নিজের যে কোনো বান্দাকে যে কোনো ক্ষমতা তিনি চাইলে দিতে পারেন। তিনি কাউকে কোনো ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দান করলে আমাদের মনকষ্টের কোনো কারণ নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৭৫. সূরা সাবা-য় এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ ........ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۞ - سبا : ١٢-٤١

“আর জিনদের মধ্য থেকে এমন জিনকে আমি তার জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার হুকুম অমান্য করতো আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। তারা তার জন্য যেমন সে চাইতো প্রাসাদ, মূর্তি, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ় ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো।............তারপর যখন আমি সুলায়মানকে মৃত্যু দান করলাম, এই জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানালো কেবল মাটির পোকা (অর্থাৎ ঘূণ) যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। তাই যখন সে পড়ে গেলো তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি সত্যিই অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘ সময় সময় আবদ্ধ থাকতো না।” এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সুলায়মানকে যেসব জিনের ওপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যারা তাঁর বিভিন্ন কাজ করে দিতো তারা এমন পর্যায়ের জিন ছিল যাদের সম্পর্কে আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। এখন যে ব্যক্তি সতর্ক দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পড়বে এবং নিজের পূর্বাহ্নের বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার অনুসারী না হয়ে পড়বে, সে নিজেই দেখে নিতে পারে যেখানে কুরআন নির্বিশেষে “শয়তান” ও “জিন” শব্দ ব্যবহার করে সেখানে তার অর্থ হয় কোন্ ধরনের সৃষ্টি এবং আরবের মুশরিকরা যাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতো কুরআনের দৃষ্টিতে তারা কোন ধরনের জিন।

আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণ একথা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন যে, হযরত সুলায়মানের জন্য যেসব জিন ও শয়তানকে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল তারা মানুষ ছিল এবং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলীর মধ্যে তাদের এ ধরনের জটিল অর্থ করার শুধু যে, কোনো অবকাশই নেই তাই নয় বরং কুরআনের যেখানেই এ ঘটনাটি এসেছে সেখানে আগে পিছের আলোচনা ও বর্ণনাভংগীই এ অর্থের পথে পরিষ্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। হযরত সুলায়মানের জন্য ইমারত নির্মাণকারীরা যদি মানুষই হয়ে থাকবে তাহলে তাদের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের কথা কুরআন মজীদে এমন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

*আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম।[৭৬] স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, "আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।"[৭৭] আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম[৭৮] এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।[৭৯]*

মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের গগণচুম্বী ইমারতগুলো পর্যন্ত কোনটি মানুষ তৈরি করেনি ? অথচ কোনো বাদশাহ, ধনকুবের ও বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ীর জন্য এমন ধরনের "জিন" ও "শয়তান" সরবরাহ করা হয়নি যা হযরত সুলামানের জন্য করা হয়েছিল।

৭৬. হযরত আইয়ুবের (আ) ব্যক্তিত্ব, সময়, জাতীয়তা সব বিষয়েই মতবিরোধ আছে। আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে ইসরাঈলী গণ্য করেন। কেউ বলেন, তিনি মিসরীয়। আবার কেউ বলেন, আরব ছিলেন। কারো মতে, তিনি ছিলেন হযরত মূসার পূর্ববর্তীকালের লোক। কেউ বলেন, তিনি হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মানের (আ) আমলের লোক। আবার কেউ তাঁকে তাঁদেরও পরবর্তীকালের পুরাতন নিয়মে সংযোজিত ইয়োব তথা আইয়ুবের সিফর বা আইয়ুবের সহীফা। তার ভাষা, বর্ণনা ভংগী ও বক্তব্য দেখে এসব বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এ ইয়োব বা আইয়ুবের সহীফার অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য এবং এর বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনা থেকে এত বেশী ভিন্নতর যে, উভয়কে একসাথে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কাজেই আমরা এর ওপর একটুও নির্ভর করতে পারি না। বড় জোর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যদি কিছু হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, ইয়াসইয়াহ (যিসাই) নবী ও হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবীর সহীফায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সহীফা দু'টি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইয়াসইয়াহ নবী খৃষ্টপূর্ব অষ্টম এবং হিযকীইল নবী খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম শতক বা এরও পূর্বের নবী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সূরা নিসার ১৬৩ ও সূরা আনআমের ৮৪ আয়াতে যেভাবে তাঁর আলোচনা এসেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওহাব

www.banglabookpdf.blogspot.com



ইবনে মুনাববিহের এ বর্ণনাও একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র ঈসূর বংশধর ছিলেন।

৭৭. দোয়ার ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন—"তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোনো জিনিসের দাবী নেই। দোয়ার এই ভংগিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। "আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।" এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

৭৮. সূরা সাদের চতুর্থ রুকূতে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন :

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ.

"নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।"

এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণাধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোনো মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনাও এর সমর্থক। বাইবেল বলছে, তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল। (ইয়োব ২ : ৭)

৭৯. এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ হযরত আইয়ুবকে এমনভাবে পেশ করেছে যার ফলে তাঁকে সবরের প্রতিমূর্তি মনে হয়। এরপর কুরআন বলছে, তাঁর জীবন ইবাদাতকারীদের জন্য একটি আদর্শ। অন্যদিকে বাইবেলের আইয়ুবের সহীফা (ইয়োব) পড়লে সেখানে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠবে যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার এবং নিজের বিপদের জন্য আপাদমস্তক ফরীয়াদী হয়ে আছেন। বারবার তাঁর মুখ থেকে এ বাক্যটি নিঃসৃত হচ্ছে : "বিলুপ্ত হোক সেদিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল।" "আমি কেন গর্ভে মরে যাইনি ?" "মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্র আমি কেন প্রাণত্যাগ করিনি ?" বারবার তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন "সর্বশক্তিমানের বান আমার ভিতরে প্রবিষ্ট, আমার আত্মা তাঁরই বিষপান করছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।" "হে মনুষ্য দর্শক, আমি যদি পাপ করে থাকি, তবে আমার কর্মে তোমার কি হয় ? তুমি কেন আমাকে তোমার শর লক্ষ করেছো ? আমিতো আপনার ভার আপনি হয়েছি। তুমি আমার অধর্ম ক্ষমা কর না কেন ? আমার অপরাধ দূর কর না কেন ?" "আমি ঈশ্বরকে বলবো আমাকে দোষী করো না ; আমাকে বল আমার সাথে কি কারণে বিবাদ করছো। এটা কি ভাল যে, তুমি উপদ্রব করবে ? তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ

www.banglabookpdf.blogspot.com



করবে ? দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হবে ?" তাঁর তিন বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিলাভ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনেন না। তিনি তাদের পরামর্শের জবাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকেন। এবং তাদের শত বুঝাবার পরও জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, আল্লাহর এ কাজের মধ্যে কোনো প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নেই, আছে শুধু একটা জুলুম, যা আমার মতো মুত্তাকী ও ইবাদাতকারী ব্যক্তির প্রতি করা হচ্ছে। তিনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন এই বলে যে, একদিকে দুষ্কৃতকারীদেরকে অনুগৃহীত করা হয় এবং অন্যদিকে সুকৃতিকারীদেরকে জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করা হয়। নিজের সৎকর্মগুলোকে তিনি এক এক করে গণনা করেন তারপর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাঁকে যেসব কষ্ট দিয়েছেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন এবং এরপর বলেন, আল্লাহর কাছে যদি কোনো জবাব থাকে তাহলে তিনি বলুন কোন্ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার সাথে এ ব্যবহার করা হয়েছে? নিজের স্রষ্টা ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ ধীরে ধীরে এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে, শেষে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কথার জবাব দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা চুপ করে যান। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কথা নিরবে শুনছিলেন, মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইয়ুবকে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে তিরস্কার করতে থাকেন যে, "তিনি তো আল্লাহকে নয় বরং নিজেকে সঠিক গণ্য করছেন।" এ ভাষণ শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে আল্লাহ নিজেই বলে ওঠেন এবং তারপর তাঁর ও আইয়ুবের মধ্যে খুব মুখোমুখী বিতর্ক হতে থাকে। এ পুরো কাহিনীটি পড়তে পড়তে আমরা একবারও অনুভব করি না যে, আমরা এমন এক অতুলনীয় ধৈর্যশীল নবীর অবস্থা ও কথা পড়ছি যার চিত্র কুরআন ইবাদাতকারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হিসেবে পেশ করছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এ পুস্তকের প্রথম অংশ এক ধরনের কথা বলে, মাঝখানের অংশ বলে ভিন্ন কথা এবং শেষে ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য কিছু। এ তিন অংশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নেই। প্রথম অংশ বলে, আইয়ুব একজন বড়ই সত্যনিষ্ঠ, খোদাভীরু ও কুকর্ম ত্যাগকারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সংগে তিনি এতই ধনাঢ্য ছিলেন যে, "পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড়লোক।" একদিন আল্লাহর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর নিজের) পুত্রগণ হাজির হন। তাদের সাথে শয়তানও আসে। আল্লাহ সেই মজলিসে তার বান্দা আইয়ুবের জন্য গর্ব করেন। শয়তান বলে, আপনি তাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তারপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আর কি করবে ? তার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো একবার ছিনিয়ে নেন তারপর দেখুন সে যদি আপনার মুখের ওপর আপনাকে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে আমার নাম শয়তান নয়। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তার সব কিছু তোমার হস্তগত করে দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তার শারীরীক কোনো ক্ষতি করো না। শয়তান গিয়ে আইয়ুবের সমস্ত ধন-দওলত ও পরিবার পরিজন ধ্বংস করে দেয়। আইয়ুব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র একাই থেকে যান। কিন্তু এতে আইয়ুবের মনে কোনো দুঃখ ও ক্ষোভ জাগেনি। তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন এবং বলেন, "আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলংগ এসেছি এবং উলংগই ফিরে যাবো ; খোদাই দিয়েছেন আবার খোদাই নিয়েছেন, খোদার নাম ধন্য হোক।" আবার এক দিন আল্লাহর দরবারে একই ধরনের একটি মজলিস বসে। তাঁর ছেলেরা আসে, শয়তানও আসে। আল্লাহ

www.banglabookpdf.blogspot.com



শয়তানকে বলেন, আইয়ুব কেমন সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে দেখে নাও। শয়তান বলে, আচ্ছা, জনাব, তার শরীরকে একবার বিপদগ্রস্থ করে দেখুন সে আপনার মুখের ওপর আপনার কুফরী করবে। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে যাও, তাকে তোমার হাতে দেয়া হচ্ছে, তবে তার প্রাণটি যেন সংরক্ষিত থাকে। অতপর শয়তান ফিরে যায়। সে "আইয়ুবকে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ফোড়ায় ভরে দেয়।" তার স্ত্রী তাকে বলে, "এখনো কি তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? আল্লাহকে অমান্য করো এবং প্রাণত্যাগ করো।" তিনি জবাব দেন, "তুমি মূঢ়া স্ত্রীর মতো কথা বলছো। আমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে শুধু সুখ পাবো, দুঃখ পাবো না।"

এ হচ্ছে আইয়ুবের সহীফার (ইয়োব পুস্তক) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। কিন্তু এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে একটি ভিন্নতর বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। এটি বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব অধ্যায়ে হযরত আইয়ুবের ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপের একটি ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে একথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুবের সম্পর্কে আল্লাহর অনুমান ভুল ও শয়তানের অনুমান সঠিক ছিল। তারপর বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ের শেষের দিকে আল্লাহর সাথে একচোট তর্ক বিতর্ক করার পর ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর তিরস্কার ও ধমক খেয়ে আইয়ুব তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং তিনি তা গ্রহণ করে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। এরপর তাকে পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ দান করেন। এ শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে মনে হবে আইয়ুব ও আল্লাহ উভয়েই শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তারপর নেহাত নিজের কথা রাখার জন্যই আল্লাহ ধমক দিয়ে তাকে মাফ চাইতে বাধ্য করেন এবং মাফ চাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন, যাতে শয়তানের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে না হয়।

এ পুস্তকটি নিজ মুখেই একথা ঘোষণা করছে যে, এটি আল্লাহর বা হযরত আইয়ুবের বাণী নয়। বরং হযরত আইয়ুবের জামানার বইও নয় এটি। তাঁর ইন্তেকালের শত শত বছর পরে কোনো এক ব্যক্তি আইয়ুবের ঘটনাকে ভিত্তি করে "ইউসুফ যোলায়খা" ধরনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তাতে আইয়ুব (ইয়োব) তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিলদদ, নামাথীয় সোফর, বুষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে তাদের মুখ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আসলে তিনি নিজের মনগড়া দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার কাব্য প্রতিভা ও চমৎকার বর্ণনা ভংগীর যতই প্রশংসা করতে পারেন করুন কিন্তু তাকে পবিত্র কিতাব ও আসমানী সহীফার অন্তরভুক্ত করার কোনো অর্থ নেই। আইয়ুব আলাইহিস সালামের জীবনী ও সীরাতের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু সম্পর্ক আছে "ইউসুফ যোলায়খা"র সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের। বরং সম্ভবত অতটুকুও নেই। বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে যেসব ঘটনা বলা হয়েছে তার মধ্যে সঠিক ইতিহাসের একটি উপাদান পাওয়া যায়। কবি তা শ্রুতি থেকে গ্রহণ করে থাকবেন, যা তাঁর যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল অথবা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমন কোনো সহীফাহ থেকে নিয়ে থাকবেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

*আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরীস[৮০] ও যুলকিফ্‌লকে[৮১] দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিল এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিল সৎকর্মশীল।*

*আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম।[৮২] স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল[৮৩] এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না।[৮৪] শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো ঃ[৮৫] "তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।" তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।*

৮০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা রূমের ৩৩ টীকা।

৮১. "যুলকিফ্‌ল"-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "ভাগ্যবান" এবং অর্থ হচ্ছে নৈতিক মাহাত্ম ও পরকালীন সওয়াবের দৃষ্টিতে ভাগ্যবান, পার্থিব স্বার্থ ও লাভের দৃষ্টিতে নয়। এটি সংশ্লিষ্ট মনীষীর নাম নয় বরং তাঁর উপাধি। কুরআন মজীদে দু'জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। দু'জায়গায়ই তাঁকে এ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছে, নামের সাহায্যে নয়।

কে এই যুলকিফ্‌ল ? কি তাঁর পরিচয় ? কোন্ দেশ ও জাতির সাথে তাঁর সম্পর্কে ছিল ? তিনি কোন্ যুগের লোক ছিলেন ? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের উক্তিগুলো বড় বেশী বিক্ষিপ্ত। কেউ বলেন, এটি হযরত যাকারিয়ার (আ) দ্বিতীয় নাম (অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল কথা। কারণ, তাঁর আলোচনা এর পরই সামনের দিকে আসছে)। কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ)। কেউ ইউশা' ইবনে নূনের নাম নেন। কেউ বলেন, তিনি আল ইয়াসা (অথচ এটিও ভুল। কারণ, সূরা সা'দ-এ তাঁর কথাও "যুলকিফ্‌ল"-এর কথা আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে।) কেউ তাঁকে হযরত আল ইয়াসার (আ) খলীফা বলেন। আবার কারোর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ুবের ছেলে। হযরত আইয়ুবের (আ)

www.banglabookpdf.blogspot.com



পরে তিনি নবী হন এবং তাঁর আসল নাম ছিল বিশর। আল্লামা আলূসী তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি হিযকিইল (যিহিস্কেল) নবী। বনী ইসরাঈলদের পরাধীনতার (৫৯৭ খৃঃ পূঃ) যুগে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন এবং খাবুর (কবার) নদীর তীরে একটি জনপদে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।"

এ বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের ভিত্তিতে তিনি যথার্থই কোন্ নবী ছিলেন নিশ্চিত নির্ভরতার সাথে বলা যেতে পারে না। বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণ হিযকিইল নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এ মত গ্রহণের পক্ষে আমি কোনো ন্যায় সংগত যুক্তি-প্রমাণ পেলাম না। তবুও এর সপক্ষে কোনো যথাযথ প্রমাণ পেলে এ মতটিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ, বাইবেলের হিযকিইল সহীফাটি দেখলে মনে হয় যথার্থই এ আয়াতে তাঁর যে প্রশংসা করা হয়েছে তিনি তার হকদার অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ। জেরুসালেম শেষবার ধ্বংস হবার আগে বখতে নসরের হাতে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। বখতে নসর ইরাকে ইসরাঈলী কয়েদীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল খাবুর (কবার) নদীর তীরে এর নাম ছিল তেলআবীব। এ স্থানেই ৫৯৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে হযরত হিযকিইল নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। অবিশ্রান্তভাবে ২২ বছর ধরে তিনি একদিকে বিপদগ্রস্ত ইসরাঈলীদেরকে এবং অন্যদিকে জেরুসালেমের গাফেল ও অস্থির-বিহ্বল অধিবাসী ও শাসকদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। নবুওয়াতের নবম বছরে তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি নিজেই বলেন, "নয়নের প্রীতি পাত্র" ইন্তিকাল করেন। লোকেরা শোক প্রকাশের জন্য তাঁর বাড়িতে জমায়েত হয়। এদিকে তিনি নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের কথা বাদ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন। এ আযাব সে সময় তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল। (২৪ ঃ ১৫-২৭) বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তক এমন একটি পুস্তক যা পড়ে মনে হয় সত্যি এটি আল্লাহর কালাম।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুছ (আ)। কোথাও সরাসরি তাঁর নাম নেয়া হয়েছে আবার কোথাও "যুন্নুন" ও "সাহেবুল হূত" বা মাছওয়ালা উপাধির মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরতেন বা বেচতেন বলে তাঁকে মাছওয়ালা বলা হতো না বরং আল্লাহর হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে মাছওয়ালা। সূরা সাফ্‌ফাতের ১৪২ আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ৯৮-১০০ এবং আস সাফ্‌ফাত ৭৭-৮৫ টীকা।

৮৩. অর্থাৎ তিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনো হিজরত করার হুকুম আসেনি, যার ফলে তাঁর পক্ষে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করা জায়েয হতে পারতো।

৮৪. তিনি মনে করেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এসে যাচ্ছে। এখন আমাকে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। না হলে আমি নিজেও আযাবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবো। নীতিগতভাবে এ বিষয়টি তো পাকড়াওযোগ্য ছিল না। কিন্তু নবীর পক্ষে আল্লাহর হুকুম ছাড়া দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল পাকড়াওযোগ্য।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

*আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" কাজেই আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম।[৮৬] তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং আমার সামনে ছিল অবনত হয়ে।[৮৭]*

৮৫. অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার ওপর ছিল সাগরের অন্ধকার।

৮৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৩৭ থেকে ৪১ আয়াত টীকাসহ, সূরা মারয়াম ২ থেকে ১৫ আয়াত টীকাসহ। স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা। "সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তুমিই" মানে হচ্ছে, তুমি সন্তান না দিলে কোনো দুঃখ নেই। তোমার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট।

৮৭. এই প্রেক্ষাপটে যে উদ্দেশ্যে নবীদের উল্লেখ করা হয়েছে তা আবার স্মৃতিপটে জাগিয়ে তুলুন। হযরত যাকারিয়ার (আ) ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা হৃদয়ংগম করানো যে, এ সকল নবীই ছিলেন নিছক বান্দা ও মানুষ। ইলাহী সার্বভৌমত্বের সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। তারা অন্যদেরকে সন্তান দান করতেন না বরং নিজেরাই আল্লাহর সামনে সন্তানের জন্য হাত পাততেন। হযরত ইউনুসের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, একজন মহিমান্বিত নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাকে পাকড়াও করা হলো এবং যখন তিনি নিজের রবের সামনে অবনত হলেন তখন তাঁর প্রতি অনুগ্রহও এমনভাবে করা হয়েছে যে, মাছের পেট থেকে তাঁকে জীবিত বের করে আনা হয়েছে। হযরত আইয়ুবের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, নবীর বিপদে পড়া কোনো অভিনব ব্যাপার নয় এবং নবীও যখন বিপদে পড়েন তখন একমাত্র আল্লাহরই সামনে ত্রাণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি অন্যের ত্রাণকারী নন বরং আল্লাহর কাছে ত্রাণ ভিক্ষাকারী। তারপর এসব কথার সাথে সাথে একদিকে এ সত্যটি মনে বদ্ধমূল করতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল নবীই ছিলেন তাওহীদের প্রবক্তা এবং নিজেদের

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَالَّتِىٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝

*আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল,[৮৮] আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রূহ থেকে[৮৯] এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।[৯০]*

*তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু (নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে) লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।[৯১]—সবাইকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।*

প্রয়োজন তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে পেশ করতেন না আবার অন্যদিকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া কাম্য যে, আল্লাহ হামেশা অস্বাভাবিকভাবে নিজের নবীদেরকে সাহায্য করতে থেকেছেন। শুরুতে তাঁরা যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেনো শেষ পর্যন্ত অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।

৮৮. এখানে হযরত মার্‌য়াম আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে।

৮৯. হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

"আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরি করছি। কাজেই (হে ফেরেশতারা!) যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরি করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।" (সাদ ঃ ৭১-৭২)

একথাই হযরত ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

"আল্লাহর রসূল এবং তাঁর ফরমান, যা মার্‌য়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।" (১৭১ আয়াত)

সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

www.banglabookpdf.blogspot.com



"আর ইমরানের মেয়ে মার্‌য়াম যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম. আমি তার মধ্যে নিজের রূহ।" (১২ আয়াত)

এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদমের (আ) জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই সূরা আলে ইমরানে বলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ، خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

"ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে তৈরি করেন তারপর বলেন, "হয়ে যাও" এবং সে হয়ে যায়।" (৫৯ আয়াত)

এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে "নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি" শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেওয়াটা অলৌকিক ধরনের। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ২১২-২১৩ টীকা।

৯০. অর্থাৎ তারা মা ও ছেলে দু'জনের কেউই আল্লাহ বা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক ছিলেন না বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ছিলেন। তারা কোন্ অর্থে নিদর্শন ছিলেন ? এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা মার্‌য়াম ২১ এবং সূরা আল মু'মিনূন ৪৩ টীকা।

৯১. এখানে !তোমরা" শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবতাকে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানব জাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন ও জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আর তাঁদের সেই আসল দীন এই ছিল ঃ কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই বন্দেগী ও পূজা করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। কেউ এর কোনো একটি জিনিস নিয়েছে, কেউ অন্যটি, আবার কেউ তৃতীয়টি। এদের প্রত্যেকে আবার এই দীনের একটি অংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে এই অসংখ্য দীন ও মিল্লাতের সৃষ্টি হয়েছে। এখন অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত গড়েছেন এবং নবীগণ মানব জাতিকে এই বহুধর্ম ও বহু মিল্লাতে বিভক্ত করেছেন, এ ধরনের কথা নিছক বিভ্রান্ত চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব দীন ও মিল্লাত নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা নবীদের সৃষ্টি। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ দশটি বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা শিক্ষা দিতে পারেন না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿۹۴﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۹۵﴾ حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿۹۶﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۹۷﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿۹۸﴾

৭ রুকূ'

*কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন থাকা অবস্থায় সৎকাজ করে, তার কাজের অমর্যাদা করা হবে না এবং আমি তা লিখে রাখছি। আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার অধিবাসিরা আবার ফিরে আসবে, এটা সম্ভব নয়।[৯২] এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেয়া হবে, প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে তারা বের হয়ে পড়বে এবং সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে[৯৩] তখন যারা কুফরী করেছিল হঠাৎ তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম বরং আমরা দোষী ছিলাম।"[৯৪] অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের যেসব মাবুদকে তোমরা পূজা করো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন, সেখানেই তোমাদের যেতে হবে।[৯৫]*

৯২. এ আয়াতটির তিনটি অর্থ হয় ঃ

এক ঃ যে জাতি একবার আল্লাহর আযাবের মুখোমুখি হয়েছে সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তার পুনরুত্থান ও নব জীবন লাভ সম্ভব নয়।

দুই ঃ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার তার এই দুনিয়ায় ফিরে আসা এবং পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এরপর তো আল্লাহর আদালতেই তার শুনানি হবে।

তিন ঃ যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যভিচার, বাড়াবাড়ি ও সত্যের পথ নির্দেশনা থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়া এত বেশী বেড়ে-যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাকে আবার ফিরে আসার ও তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে না।

৯৩. ইয়াজুজ ও মাজুজের ব্যাখ্যা সূরা কাহাফের ৬২ ও ৬৯ টীকায় করা হয়েছে। তাদেরকে খুলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন মনে হবে কোনো হিংস্র পশুকে হঠাৎ খাঁচা বা বন্ধন মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। "সত্য ওয়াদা পুরা হবার সময় কাছে এসে যাবে" এর মধ্যে পরিষ্কার এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের এ বিশ্বব্যাপী আক্রমণ শেষ জামানায় হবে এবং এর পর দ্রুত কিয়ামত এসে যাবে। এ অর্থকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটিও আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেবে যা ইমাম মুসলিম হুযাইফা ইবনে আসীদিল গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ "কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা তার মধ্য থেকে দশটি আলামত দেখে নেবে ঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, মাটির পোকা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের আক্রমণ, তিনটি বৃহত্তম ভূমি ধ্বস (Land slide) একটি পূর্বে, অন্যটি পশ্চিমে ও তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে এবং সব শেষে ইয়ামন থেকে একটি ভয়াবহ আগুন উঠবে যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ এরপর কিয়ামত এসে যাবে।) অন্য এক হাদীসে ইয়াজুজ মাজুজের উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে সময় কিয়ামত এত বেশী নিকটবর্তী হবে যেন পূর্ণ গর্ভবর্তী মহিলা বলতে পারছে না কখন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, রাতে বা দিনে যে কোনো সময় (كالحامل المتم لايدرى اهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا او نهارا) কিন্তু কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা থেকে একথা পরিষ্কার হয় না যে, এরা দুয়ে মিলে একজোট হয়ে একসাথে দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতে পারে কিয়ামতের নিকটতর যুগে এরা দুয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হবে এবং তারপর এদের লড়াই একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ হবে।

৯৪. গাফলতির মধ্যে তবুও এক ধরনের ওজর পাওয়া যায়। তাই তারা নিজেদের গাফলতি বর্ণনা করার পর আবার নিজেরাই পরিষ্কার স্বীকার করবে, নবীগণ এসে আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই মূলত আমরা গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং দোষী ও অপরাধী ছিলাম।

৯৫. হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যাবারা আপত্তি করে বলেন যে, এভাবে তো কেবলমাত্র আমাদেরই মাবুদরা জাহান্নামে যাবে না বরং ঈসা, উযাইর ও ফেরেশতারাও জাহান্নামে যাবে, কারণ দুনিয়ায় তাদেরও ইবাদাত করা হয়। এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

كل من احب ان يعبد من دون الله فهو مع من عبده

"হাঁ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজে একথা পছন্দ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার বন্দেগী করা হোক সে তাদেরই সাথে হবে যারা তার বন্দেগী করেছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ
فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا
الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ
مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ
وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

*যদি তারা সত্যিই আল্লাহ হতো, তাহলে সেখানে যেতো না। এখন সবাইকে চিরদিন তারই মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে তারা হাঁসফাঁস করতে থাকবে[৯৬] এবং তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা কোনো কথা শুনতে পাবে না। তবে যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যি এ থেকে দূরে রাখা হবে,[৯৭] তার সামান্যতম খস্‌খসানিও তারা শুনবে না এবং তারা চিরকাল নিজেদের মনমতো জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে। সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও পেরেশান করবে না[৯৮] এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে এই বলে, "এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।"*

এ থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকেই উপাস্যে পরিণত করে অথবা যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যে, দুনিয়ায় তাদের বন্দেগী ও পূজা করা হচ্ছে এবং এ কর্মে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার কোনো দখল নেই, তাদের জাহান্নামে যাবার কোনো কারণ নেই। কারণ, তারা এ শিরকের জন্য দায়ী নয়। তবে যারা নিজেরাই উপাস্য ও পূজনীয় হবার চেষ্টা করে এবং মানুষের এ শিরকে যাদের সত্যি সত্যিই দখল আছে তারা সবাই নিজেদের পূজারী ও উপাসকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অনুরূপভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করায় তারাও জাহান্নামে যাবে। কারণ, এ অবস্থায় তারাই মুশরিকদের আসল মাবুদ হিসেবে গণ্য হবে, এ দুর্বৃত্তরা বাহ্যত যাদেরকে মাবুদ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল তারা নয়। শয়তানও এর আওতায় এসে যায়। কারণ, তার উদ্যোগে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করা হয় আসল উপাস্য তারা হয় না। বরং আসল উপাস্য হয় শয়তান নিজেই। কারণ, তার হুকুমের আনুগত্য করে এ কাজটি করা হয়। এ ছাড়াও পাথর, কাঠের মূর্তি ও অন্যান্য পূজা সামগ্রীও মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, যাতে তারা তাদের ওপর জাহান্নামের আগুন আরো বেশী করে জ্বালিয়ে দিতে সাহায্য করে। যাদের ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করছিল যে, তারা তাদের

www.banglabookpdf.blogspot.com



يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বাণ্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ, যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এ একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত এবং এ কাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আর যবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা। এর মধ্যে একটি বড় খবর আছে ইবাদাতকারী লোকদের জন্য।*[৯৯]

*হে মুহাম্মাদ! আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত।*[১০০]

সুপারিশকারী হবে, তারা উলটো তাদের আযাব কঠোরতর করার কারণে পরিণত হয়েছে দেখে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

৯৬. মূলে زَفِــيــر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভয়ংকর গরম, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন টানা টানা শ্বাস নিয়ে তাকে সাপের ফোঁসফোঁসানীর মতো করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের করে তখন তাকে "যাফীর" বলা হয়।

৯৭. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দুনিয়ায় নেকী ও সৌভাগ্যের পথ অবলম্বন করেছে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পূর্বাহ্নে ওয়াদা করেছেন যে, তারা এর আযাব থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদেরকে নাজাত দেয়া হবে।

৯৮. অর্থাৎ হাশরের দিন এবং আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়, যা সাধারণ লোকদের জন্য হবে চরম ভীতি ও পেরেশানীর সময়, নেকলোকেরা সে সময় একটি মানসিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে অবস্থান করবে। কারণ, সবকিছু ঘটতে থাকবে তাদের আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা অনুযায়ী। ঈমান ও সৎকাজের যে পুঁজি নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল তা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের মানোবল দৃঢ় করবে এবং ভয় ও দুঃখের পরিবর্তে তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে, শীঘ্রই তারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সুফল লাভ করবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৯৯. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে অনেকে ভীষণভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা এর এমন একটি অর্থ বের করে নিয়েছেন যা সমগ্র কুরআনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায় এবং দীনের সমগ্র ব্যবস্থাটিকেই শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়। তারা আয়াতের অর্থ এভাবে করেন যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যমীনের উত্তরাধিকার (অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও উপকরণাদির ভোগ-ব্যবহার) শুধুমাত্র সৎলোকেরাই লাভ করে থাকে এবং তাদেরকেই আল্লাহ এ নিয়ামত দান করেন। তারপর এ সার্বিক নিয়ম থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, সৎ ও অসতের মধ্যকার ফারাক ও পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকার । যে এ উত্তরাধিকার লাভ করে সে সৎ এবং যে এ থেকে বঞ্চিত হয় সে অসৎ। এরপর তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দুনিয়ায় ইতিপূর্বে যেসব জাতি পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করেছিল এবং যারা আজ উত্তরাধিকারী হয়ে আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এখানে কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, দুষ্কৃতিকারী সবাই এ উত্তরাধিকার আগেও লাভ করেছে এবং আজো লাভ করছে। কুরআন যেসব গুণকে কুফরী, ফাসেকী, দুষ্কৃতি, পাপ ও অসৎ বলে চিহ্নিত করেছে যেসব জাতির মধ্যে সেগুলো পাওয়া গেছে এবং আজো পাওয়া যাচ্ছে তারা এ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং এটি তাদেরকে দান করা হয়েছে এবং আজো দান করা হচ্ছে। ফেরাউন, নমরূদ থেকে শুরু করে এ যুগের কম্যুনিষ্ট শাসকরা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর বিরোধিতা করে বরং আল্লাহর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর পরেও তারা যমীনের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এ চিত্র দেখে তারা এ মত পোষণ করেন যে, কুরআন বর্ণিত সার্বিক নিয়ম তো ভুল হতে পারে না। কাজেই ভুল যা কিছু তা এ "সৎ" শব্দটির অর্থের মধ্যে রয়ে গেছে। অর্থাৎ মুসলমানরা এ পর্যন্ত "সালেহ" বা "সৎ" শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করে এসেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাই তারা সৎ শব্দটির একটি নতুন সংজ্ঞা তালাশ করছেন। এ শব্দটির এমন একটি অর্থ তারা চাচ্ছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভকারী সকল ব্যক্তি সমানভাবে "সৎ" গণ্য হতে পারে। তিনি আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক অথবা চেংগীস ও হালাকু যে কেউ হতে পারেন। এ নতুন অর্থ সন্ধান করার ক্ষেত্রে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন মতবাদ তাদেরকে সাহায্য করে। ফলে তারা কুরআনের "সৎ" (صلاح)-এর মতবাদকে ডারউইনী "যোগ্যতা" বা Fitness (صلاحيت)-এর মতবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এ সংশ্লিষ্ট তাফসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই ঃ যে ব্যক্তি বা দল দেশ জয় করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাবার এবং পৃথিবীর বস্তু সম্পদ ও জীবন যাপনের উপকরণাদি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে সে-ই হচ্ছে "আল্লাহর সৎ বান্দা।" তার এ কর্ম সমস্ত "ইবাদাত গুজার" মানব সমাজের জন্য এমন একটি বাণী যাতে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি ও দল যে কাজটি করছে সেটিই "ইবাদাত"। তোমরা যদি এ ইবাদাত না করো এবং পরিণামে পৃথিবীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে তোমাদেরকে "সৎলোক"দের মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাও বলা যেতে পারে না।

এ অর্থ গ্রহণ করার পর এদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, যদি "সততা" ও "ইবাদাতের" সংজ্ঞা এই হয়ে থাকে তাহলে ঈমান (আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান,

www.banglabookpdf.blogspot.com



রসূলের প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান) এর অর্থ কি ? ঈমান ছাড়া তো স্বয়ং এ কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর কাছে কোনো সৎকাজ গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাছাড়া এরপর কুরআনের এ দাওয়াতের কি অর্থ হবে যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করো ? আবার বারবার কুরআনের একথা বলার অর্থই বা কি যে, রসূলকে যে মানে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের যে আনুগত্য করে না সে কাফের, ফাসেক, শাস্তিলাভের অধিকারী এবং আল্লাহর দরবারে ঘৃণিত অপরাধী ? এ প্রশ্নগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যে, এরা যদি ঈমানদারীর সাথে এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন তাহলে অনুভব করতেন যে, এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার এবং সততার একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা ভুল করছেন। কিন্তু তারা নিজেদের ভুল অনুভব করার পরিবর্তে অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বদলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এ সবগুলোকে তাদের একটি আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। একটিমাত্র জিনিসকে সঠিকভাবে বসাবার জন্য তারা কুরআনের সমস্ত শিক্ষাকে ওলট-পালট করে দিয়েছেন। এর ওপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা তাদের এ "দীনের মেরামতি"র বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে তারা উলটো অভিযোগ আনছেন এই বলে যে, "নিজেরা পরিবর্তিত না হয়ে করছেন কুরআনের পরিবর্তন।" এটি আসলে বস্তুগত উন্নয়নেচ্ছার বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু লোক মারাত্মকভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ জন্য তারা কুরআনের অর্থ বিকৃত করতেও দ্বিধা করছেন না।

তাদের এ ব্যাখ্যার প্রথম মৌলিক ভুলটি হচ্ছে এই যে, তারা কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি ব্যাখ্যা করছেন যা কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষার বিরোধী। অথচ নীতিগতভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের এমন ব্যাখ্যাই সঠিক হতে পারে যা তার অন্যান্য বর্ণনা ও তার সামগ্রিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে অন্তত একবারও বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি একথা না জেনে পারেন না যে, কুরআন যে জিনিসকে নেকী, তা'কওয়া ও কল্যাণ বলছে তা "বস্তুগত উন্নতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার" সমার্থক নয়। আর "সৎ"-কে যদি "যোগ্যতা সম্পন্ন"-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ একটি আয়াত সমগ্র কুরআনের বিরোধী হয়ে ওঠে।

তাদের এ ভুলের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, তারা একটি আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা করে নিয়ে নির্দ্বিধায় ইচ্ছামতো যে কোনো অর্থ তার শব্দাবলী থেকে বের করে নিচ্ছেন। অথচ প্রত্যেকটি আয়াতের সঠিক অর্থ কেবলমাত্র সেটিই হতে পারে যা তার পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যদি এ ভুলটি তারা না করতেন তাহলে সহজেই দেখতে পেতেন যে, উপর থেকে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তু চলে আসছে সেখানে আখেরাতের জীবনে সৎকর্মশীল মু'মিন এবং কাফের ও মুশরিকদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়বস্তুর মধ্যে আকস্মিকভাবে দুনিয়ায় যমীনের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কোন্ নিয়মের ভিত্তিতে চলছে একথা বলার সুযোগ কোথায় পাওয়া গেলো ?

কুরআন ব্যাখ্যার সঠিক নীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ এর আগের আয়াতে যে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সে সৃষ্টিকালে যমীনের

www.banglabookpdf.blogspot.com



উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র সৎকর্মশীল লোকেরা। সেই চিরন্তন জীবনের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানের সাময়িক জীবন ব্যবস্থার অবস্থা বিরাজিত থাকবে না। এখানে বর্তমানে জীবন ব্যবস্থায় তো যমীনে জালেম ও ফাসেকদেরও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কিন্তু সেখানে তা হবে না। সূরা মু'মিনূনের ৪-১১ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় সূরা যুমারের শেষে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ কিয়ামত এবং প্রথম সিংগাধ্বনি ও দ্বিতীয় সিংগাধ্বনির কথা বলার পর নিজের ন্যায় বিচারের উল্লেখ করেছেন এবং তারপর কুফরীর পরিণাম বর্ণনা করে সৎলোকদের পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ج فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ○ - الزمر : ٧٣-٧٤

"আর যারা নিজেদের রবের ভয়ে তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা সেখানে পৌঁছে যাবে, তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা খুব ভালো থেকেছো, এখন এসো, এর মধ্যে চিরকাল থাকার জন্য প্রবেশ করো। আর তারা বলবে ঃ প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের সাথে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারি। কাজেই সর্বোত্তম প্রতিদান হচ্ছে সৎকর্মশীলদের জন্য।" (যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

দেখুন এ দু'টি আয়াত একই বিষয় বর্ণনা করছে এবং দু'জায়গায়ই যমীনের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক পরকালীন জগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত, ইহকালীন জগতের সাথে নয়।

এখন যবুরের প্রসংগে আসা যাক। আলোচ্য আয়াতে এর বরাত দেয়া হয়েছে। যদিও আমাদের পক্ষে একথা বলা কঠিন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যবুর নামে যে পুস্তকটি বর্তমানে পাওয়া যায় তা তার আসল অবিকৃত অবস্থায় আছে কি নেই। কারণ, এখানে দাউদের গীতের মধ্যে অন্য লোকদের গীতও মিশে একাকার হয়ে গেছে এবং মূল যবুরের কপি কোথাও নেই। তবুও যে যবুর বর্তমানে আছে সেখানেও নেকী, সততা, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহ নির্ভরতার উপদেশ দেয়ার পর বলা হচ্ছে ঃ

"কারণ দুরাচারগণ উচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে। আর ক্ষণকাল, পরে দুষ্টলোক আর নাই, তুমি তাহার স্থান তত্ব করিবে, কিন্তু সে আর নাই। কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে। ........... তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে। ............ ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে, তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে।" (দাউদের সংগীত ৩৭ ঃ ৯, ১০, ১১, ১৮, ২৯

www.banglabookpdf.blogspot.com



দেখুন এখানে ধার্মিকদের জন্য যমীনের চিরন্তন উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবগুলোর দৃষ্টিতে "খুলূদ", "তথা চির অবস্থান" ও চিরন্তন জীবন আখেরাতেই হয়ে থাকে, এ দুনিয়ায় নয়।

দুনিয়ায় যমীনের সাময়িক উত্তরাধিকার যে নিয়মে বণ্টিত হয় তাকে সূরা আ'রাফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

"যমীনের মালিক আল্লাহ, নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।" (১২৮ আয়াত)

আল্লাহর ইচ্ছার আওতায় মু'মিন ও কাফের, সৎ ও অসৎ এবং হুকুম পালনকারী ও হুকুম অমান্যকারী নির্বিশেষে সবাই এর উত্তরাধিকার লাভ করে। কর্মফল হিসেবে তারা এটা লাভ করে না বরং লাভ করে পরীক্ষা হিসেবে। যেমন এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

"আর তিনি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো।" (১২৯ আয়াত)

এ উত্তরাধিকার চিরন্তন নয়। এটি নিছক একটি পরীক্ষার ব্যাপার। আল্লাহর একটি নিয়মের আওতায় দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতিকে পালাক্রমে এ পরীক্ষায় ফেলা হয়। বিপরীতপক্ষে আখেরাতে এ যমীনেরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে এবং কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে তা যে নিয়মের ভিত্তিতে হবে তা হচ্ছে এই যে, "যমীনের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে একমাত্র সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে এর উত্তরাধিকারী করবেন। পরীক্ষা করার জন্য নয় বরং দুনিয়ায় তারা যে সৎ প্রবণতা অবলম্বন করেছিল তার চিরন্তন প্রতিদান হিসেবে।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৮৩ টীকা)।

১০০. এর আর একটি অনুবাদ হতে পারে, "আমি তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য রহমতে পরিণত করেই পাঠিয়েছি।" উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন আসলে মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। কারণ, তিনি এসে গাফলতিতে ডুবে থাকা দুনিয়াকে জাগিয়ে দিয়েছেন। তাকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফারাক করার জ্ঞান দিয়েছেন। দ্বিধাহীন ও সংশয় বিমুক্ত পদ্ধতিতে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য ধ্বংসের পথ কোন্‌টি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পথ কোন্‌টি। মক্কার কাফেররা নবীর (সা) আগমনকে তাদের জন্য বিপদ ও দুঃখের কারণ মনে করতো। তারা বলতো, এ ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, নখ থেকে গোশত আলাদা করে রেখে দিয়েছে। তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে ঃ অজ্ঞের দল! তোমরা যাকে দুঃখ ও কষ্ট মনে করো তা আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রহমত।

www.banglabookpdf.blogspot.com



قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي
أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ
إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُل رَّبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

*এদেরকে বলো, "আমার কাছে যে অহী আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ, তারপর কি তোমরা আনুগত্যের শির নত করছো ?" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, "আমি সোচ্চার কণ্ঠে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখন আমি জানি না, তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে[১০১] তা আসন্ন, না দূরবর্তী।" আল্লাহ সে কথাও জানেন যা সোচ্চার কণ্ঠে বলা হয় এবং তাও যা তোমরা গোপনে করো।[১০২] আমিতো মনে করি, হয়তো এটা (বিলম্ব) তোমাদের জন্য এটা পরীক্ষা[১০৩] এবং একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।*

*(শেষে) রসূল বললো ঃ "হে আমার রব! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা ! তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক।"*

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও। রিসালাতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে কোনো ধরনের আযাবের আকারে আল্লাহর যে পাকড়াও আসবে।

১০২. সূরার শুরুতে যেসব বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র ও নীরব কানাকানির কথা বলা হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানেও রসূলের মুখ দিয়ে এদের এ জবাব দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা যেসব কথা বলছো সেগুলো সবই আল্লাহ শুনছেন এবং তিনি সেগুলো জানেন। অর্থাৎ এমন মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে এবং এসবের জন্য আর কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

১০৩. অর্থাৎ এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছো। তোমাদের সামলে ওঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই

www.banglabookpdf.blogspot.com



পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো। তোমরা মনে করছো, নবীর সব কথা মিথ্যা। নয়তো ইনি যদি সত্য নবীই হতেন এবং যথার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতেন, তাহলে একে মিথ্যা বলার ও অমান্য করার পর আমরা কবেই পাকড়াও হয়ে যেতাম।

❐

www.banglabookpdf.blogspot.com



# আল হাজ্জ

## ২২

**নামকরণ**

চতুর্থ রুকূ'র দ্বিতীয় আয়াত وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

**নাযিলের সময়-কাল**

এ সূরায় মক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাস্‌সিরগণের মাঝে এর মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর একটি অংশ মক্কী যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট এর মধ্যে একক হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মক্কী জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ আয়াত وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ-এ এসে শেষ হয়ে গেছে।

এরপর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্তকার অংশটি মদীনা তাইয়েবায় নাযিল হয়েছে। এ অংশটি যে, হিজরতের পর প্রথম বছরেই যিলহজ্জ মাসে নাযিল হয়েছে তা মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে তা একথাই নির্দেশ করে এবং ৩৯-৪০ আয়াতের শানেনুযুল তথা নাযিলের কার্যকারণও এর প্রতি সমর্থন দেয়। সে সময় মুহাজিররা সবেমাত্র নিজেদের জন্মভূমি ও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জের সময় তাদের নিজেদের শহর ও হজ্জের সমাবেশের কথা মনে পড়ে থাকতে পারে। কুরাইশ মুশরিকরা যে তাদের মসজিদে হারামে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে একথা তাদের মনকে মারাত্মকভাবে তোলপাড় করে থাকবে। যে অত্যাচারী কুরাইশ গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধ করারও অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ ছিল এ আয়াতগুলোর নাযিলের যথার্থ মনস্তাত্বিক পটভূমি। এখানে প্রথমে হজ্জের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য মসজিদে হারাম নির্মাণ এবং হজ্জের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে

www.banglabookpdf.blogspot.com



শিরক করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর এ দুরাচারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদেরকে বেদখল করে দেশে এমন একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেখানে অসৎবৃত্তি প্রদমিত ও সৎবৃত্তি বিকশিত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের মতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। অন্যদিকে হাদীস ও সীরাতের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণ হয়, এ অনুমতির পরপরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে বাস্তব কর্মতৎপরতা শুরু করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি দাওয়ান যুদ্ধ বা আবওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

## বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় তিনটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ মক্কার মুশরিক সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমগণ এবং আপোষহীন সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ।

মুশরিকদেরকে সম্বোধন করার পর্বটি মক্কায় শুরু হয়েছে এবং মদীনায় এর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ভিত্তিহীন জাহেলী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদদের ওপর ভরসা করেছো যাদের কাছে কোনো শক্তি নেই এবং আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমাদের পূর্বে এ নীতি অবলম্বনকারীরা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমাদেরও অনিবার্যভাবে সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজের জাতির সবচেয়ে সৎলোকদেরকে জুলুম নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছো। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা থেকে তোমাদের বানোয়াট উপাস্যরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে বুঝাবার ও উপলব্ধি করাবার কাজও চলছে। সমগ্র সূরার বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উপদেশ প্রদানের কাজও চলেছে। এ সংগে শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখেরাতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

দ্বিধান্বিত মুসলমানরা, যারা আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর পথে কোনো প্রকার বিপদের মুকাবিলা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান ! আরাম, আয়েশ, আনন্দ ও সুখ লাভ হলে তখন আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে এবং তোমরা তাঁর বান্দা থাকো, কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে এবং কঠিন সংকটের মুকাবিলা করতে হয় তখনই আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না এবং তোমরাও তাঁর বান্দা থাকো না। অথচ নিজেদের এ নীতি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা এমন কোনো বিপদ, ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়েছে দু'টি পদ্ধতিতে। একটি ভাষণে সম্বোধন এমনভাবে করা হয়েছে যার লক্ষ তারা নিজেরাও এবং এ সংগে আরবের সাধারণ জনসমাজও। আর দ্বিতীয় ভাষণটির লক্ষ কেবলমাত্র মু'মিনগণ।

প্রথম ভাষণে মক্কার মুশরিকদের মনোভাব ও কর্মনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই কাউকে হজ্জ করার পথে বাধা দেবার অধিকার তাদের নেই। এ আপত্তি শুধু যে, যথার্থই ছিল তাই নয় বরং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তম অস্ত্রও ছিল। এর মাধ্যমে আরবের অন্যান্য সকল গোত্রের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশরা হারাম শরীফের খাদেম, না মালিক ? আজ যদি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একটি দলকে হজ্জ করতে বাধা দেয় এবং তাদের এ পদক্ষেপকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে কালকেই যে, তারা যার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তাকে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে না এবং তার উমরাহ ও হজ্জ বন্ধ করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এ প্রসংগে মসজিদুল হারামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাইকে এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ ঘরটি শিরক করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ কী ভয়ংকর কথা ! আজ সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ কিন্তু মূর্তি ও দেবদেবীর পূজার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের জুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সংগে মুসলমানরা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের নীতি কি হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে একথাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি সূরার মাঝখানে আছে এবং শেষেও আছে। শেষে ঈমানদারদের দলের জন্য "মুসলিম" নামটির যথারীতি ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরাই হচ্ছো ইবরাহীমের আসল স্থলাভিষিক্ত। তোমরা দুনিয়ায় মানব জাতির সামনে সাক্ষদানকারীর স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের নামায কায়েম, যাকাত দান ও সৎকাজ করে নিজেদের জীবনকে সর্বোত্তম আদর্শ জীবনে পরিণত করা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো উচিত।

এ সুযোগে সূরা বাকারাহ ও সূরা আনফালের ভূমিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। এতে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ②

*হে মানবজাতি! তোমাদের রবের গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই (ভয়ংকর) জিনিস।[১] যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে,[২] প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।[৩]*

১. এ প্রকম্পন হবে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার প্রকাশ। আর সম্ভবত এটা এমন সময় শুরু হবে যখন যমীন অকস্মাত উল্টে পড়তে শুরু করবে এবং সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। একথাই বর্ণনা করেছেন প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্য থেকে আলকামাহ ও শা'বী। তারা বলেছেন ঃ يكون ذلك عند طلوع الشمس من مغربها ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে একথাটিই জানা যায়। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এক ফুঁক হবে "ফাযা" তথা ভীতি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় ফুঁক "সা'আক" তথা সংজ্ঞা লোপকারী বিকট গর্জন এবং তৃতীয় ফুঁক হবে "কিয়াম লি-রব্বিল আলামীন" অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হবার ফুঁক। প্রথম ফুঁকটি সাধারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মরে পড়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তারপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, সে সময় পৃথিবীর অবস্থা হবে এমন একটি নৌকার মতো যা ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে অথবা এমন ঝুলন্ত প্রদীপের মতো

www.banglabookpdf.blogspot.com



যা বাতাসের ঝটকায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

"যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।" (আল হা-ক্কাহ ১৩-১৫)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ○

"যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো ?" (আয যিলযাল ১-৩)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ○ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ○ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ○ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ○

"যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্‌কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্‌কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হবে।" (আন নাযিআত ৬-৯)

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ○ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○

"যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।" (আল ওয়াকিআহ, আয়াত ৪-৬)

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ○ نِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ○

"যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়ো করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ?" (আল মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ১৭-১৮)

যদিও কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মতে এ কম্পনটি হবে এমন সময়ে যখন মৃতরা জীবিত হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাজির হবে, এবং এর সমর্থনে তাঁরা একাধিক হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন তবুও কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ হাদীস গ্রহণ করার পথে বাধা। কুরআন এর যে সময় বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এমন এক সময় যখন মায়েরা শিশু সন্তানদের দুধ পান করাতে করাতে তাদেরকে ফেলে রেখে পালাতে থাকবে এবং

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝٤ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ

*কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে[৪] এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ভাগ্যেই তো এটা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে। হে লোকেরা ! যদি তোমাদের মৃত্যু পরের জীবনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে,[৫] তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও।[৬] (এ আমি বলছি) তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও।*

গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের জীবনে কোনো মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাবে না এবং কোনো গর্ভবতীর গর্ভপাত হবার কোনো সুযোগও সেখানে থাকবে না। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সবরকমের সম্পর্ক খতম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সামনে হিসেব দিতে দাঁড়াবে। কাজেই আমি পূর্বেই যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি সেটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। যদিও তার বর্ণনা পরম্পরা দুর্বল কিন্তু কুরআনের সমর্থন তার দুর্বলতা দূর করে দেয়। অন্যদিকে অন্যান্য হাদীসগুলো বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে বেশী শক্তিশালী হলেও কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনার সাথে গরমিল থাকায় এগুলোকে দুর্বল করে দেয়।

২. আয়াতে مُرْضِعٌ এর পরিবর্তে مُرْضِعَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দিক দিয়ে উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, مُرْضِعٌ অর্থ হচ্ছে

www.banglabookpdf.blogspot.com



যে দুধ পান করায়। এবং مُرْضِعَةٌ এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে। কাজেই এখানে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, যখন কিয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশুসন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোনো মায়ের মনেও থাকবে না।

৩. একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাঁর গযবের কারণ হয় এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। এজন্য কিয়ামতের এ সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনার পর সামনের দিকে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৪. সামনের দিকের ভাষণ থেকে জানা যায়, এখানে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে বিতর্কের ওপর আলোচনা করা হচ্ছে তা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত নয় বরং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার এবং তাঁর পাঠানো শিক্ষাবলী সম্পর্কিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বীকৃতি চাচ্ছিলেন। এ বিষয়েই তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতেন। এ দু'টি বিশ্বাসের ওপর বিতর্ক শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে ঠেকতো তা এই ছিল যে, আল্লাহ কি করতে পারেন এবং কি করতে পারেন না, তাছাড়া এ বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্বের কর্তৃত্ব কি শুধুমাত্র এক আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত অথবা অন্য কতক সত্তারও এখানে প্রভুত্বের কর্তৃত্ব আছে ?

৫. এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ এমন একটি উপাদান থেকে তৈরি হয় যার সবটুকুই গৃহীত হয় মাটি থেকে এবং এ সৃজন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় শুক্র থেকে। অথবা মানব প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে। তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন সূরা সিজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ○

"মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।" (আস সাজদাহ, ৭-৮ আয়াত)

৬. এখানে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। আজকাল শুধুমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের বিভিন্ন স্তরের যেসব বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টিগোচর হতে পারে সেগুলো বর্ণনা করা হয়নি। বরং সেকালের সাধারণ বদ্দুরাও যেসব বড় বড় সুস্পষ্ট পরিবর্তনের কথা জানতো সেগুলো এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুক্র গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে স্থিতি লাভ করার পর প্রথমে জমাট রক্তের একটি পিণ্ড হয়। তারপর তা একটি গোশতের টুকরায় পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় কোনো আকৃতি সৃষ্টি হয় না। এরপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে মানবিক আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গর্ভপাতের বিভিন্ন অবস্থায় যেহেতু মানব সৃষ্টির এসব পর্যায় লোকেরা

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۝٧

*আর তোমাদের কাউকে কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর আবার কিছুই না জানে।[৭] আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে আছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য,[৮] তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। আর এই (একথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।[৯]*

প্রত্যক্ষ করতো তাই এদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি বুঝার জন্য সেদিন ভ্রূণতত্বের বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন ছিল না, আজো নেই।

৭. অর্থাৎ এমন বৃদ্ধাবস্থা যখন মানুষের নিজের শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের কোনো খোঁজ-খবর থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জ্ঞান দিতো বুড়ো হয়ে সে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাকে শিশুদের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। যে জ্ঞান জানা শোনা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ছিল তার গর্বের বস্তু তা এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, একটি ছোট ছেলেও তার কথায় হাসতে থাকে।

৮. এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোনো সম্ভাবনা নেই,—তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। দুই, আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই (First cause) নয় বরং তিনি প্রকৃত

www.banglabookpdf.blogspot.com



স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিন, তিনি কোনো খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য, তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়।

৯. এ আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মাটির ওপর বৃষ্টির প্রভাব এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকে পাঁচটি সত্য নির্ণয়ের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সত্যগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ আল্লাহই সত্য।

দুই ঃ তিনি মৃতকে জীবিত করেন।

তিন ঃ তিনি সর্বশক্তিমান।

চার ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই।

পাঁচ ঃ যারা মরে গেছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন।

এখন দেখুন এ নিদর্শনগুলো এ পাঁচটি সত্যকে কিভাবে চিহ্নিত করে।

সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজেরই জন্মের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে জানতে পারবে যে, এক একটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশল সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। একদল বলে, একটা অন্ধ, বধির এবং জ্ঞান ও সংকল্পহীন প্রকৃতি একটা ধরাবাধা আইনের ভিত্তিতে এসব কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে যে, এক একটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যেভাবে অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার মধ্যে একজন অতিশয় জ্ঞানী ও একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কেমন সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যে খাদ্য খায়, তার মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ লুকিয়ে থাকে না এবং তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে। এ খাদ্য শরীরে গিয়ে কোথাও চুল, কোথাও গোশত এবং কোথাও হাড়ে পরিণত হয়, আবার একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছে এই খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষে পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ থাকে। এ বীজগুলোর সংখ্যা এত অগণিত যে, একজন পুরুষ থেকে একবারে যে শুক্র নির্গত হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকেই স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলে মানুষের রূপ লাভ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু একজন জ্ঞানী সর্বশক্তিমান ও একচ্ছত্র শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ অসংখ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে কোনো বিশেষ সময় ছাটাই বাছাই করে এনে স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলনের সুযোগ দেয়া হয় এবং এভাবে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া চলে। তারপর গর্ভধারণের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বকোষের (Egg cell) মিলনের ফলে প্রথমদিকে যে জিনিসটি তৈরি হয় তা এত ছোট হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। এ ক্ষুদ্র জিনিসটি নয় মাস ও কয়েক দিন

www.banglabookpdf.blogspot.com



গর্ভাশয়ে লালিত হয়ে যে অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ গ্রহণ করে তার মধ্য থেকে প্রতিটি স্তরের কথা চিন্তা করলে মানুষের মন নিজেই সাক্ষ দেবে যে, এখানে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর বিচক্ষণ জ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কাজ করে চলছে। তিনিই সিদ্ধান্ত দেন, কাকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেন এবং কাকে রক্তপিণ্ডে অথবা গোশতের টুকরায় কিংবা অসম্পূর্ণ শিশুর আকারে খতম করে দেবেন। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কাকে জীবিত বের করবেন এবং কাকে মৃত। কাকে সাধারণ মানবিক আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন এবং কাকে অসংখ্য অস্বাভাবিক আকারের মধ্য থেকে কোনো একটি আকার দান করবেন। কাকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক অবয়ব দান করবেন আবার কাকে অন্ধ, বোবা, বধির বা লুলা ও পংগু বানিয়ে বের করে আনবেন। কাকে সুন্দর করবেন এবং কাকে কুৎসিত। কাকে পুরুষ করবেন এবং কাকে নারী। কাকে উচ্চ পর্যায়ের শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে পাঠাবেন এবং কাকে নির্বোধ ও বেকুফ করে সৃষ্টি করবেন। সৃজন ও আকৃতিদানের এ কাজটি প্রতিদিন কোটি কোটি নারীর গর্ভাশয়ে চলছে। এর মাঝখানে কোনো সময় কোনো পর্যায়েও এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং কোন্ পেটে কি জিনিস তৈরি হচ্ছে এবং কি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসবে এতটুকুও কেউ বলতে পারে না। অথচ মানব সন্তানদের কমপক্ষে শতকারা ৯০ জনের ভাগ্যের ফায়সালা এই স্তরগুলোতেই হয়ে যায় এবং এখানেই কেবল ব্যক্তিদেরই নয় জাতিসমূহেরও এমনকি সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যতের ভাঙাগড়া সম্পন্ন হয়। এরপর যেসব শিশু দুনিয়ায় আসে তাদের কাকে প্রথম শ্বাস নেবার পরই মরে যেতে হবে। কাকে বড় হয়ে যুবক হতে হবে এবং কার যৌবনের পর বার্ধক্যের পাট চুকাতে হবে? তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কে এ সিদ্ধান্ত নেয় ? এখানেও একটি প্রবল ইচ্ছা কার্যকর দেখা যায়। গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে অনভুব করা যাবে তাঁর কর্মতৎপরতা কোন্ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এরি ভিত্তিতে তিনি কেবল ব্যক্তিদেরই নয়, জাতির ও দেশের ভাগ্যেরও ফায়সালা করছেন। এসব কিছু দেখার পরও যদি আল্লাহ "সত্য" এবং একমাত্র আল্লাহই "সত্য" এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে তাহলে নিসন্দেহে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ নিদর্শনগুলো থেকে প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন" আল্লাহ কখনো মৃতদেরকে জীবিত করবেন, একথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে তিনি তো প্রতি মুহূর্তে মৃতকে জীবিত করছেন। যেসব উপাদান থেকে মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে এবং যেসব খাদ্যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, লোহা, চূন, কিছু লবণজাত উপাদান ও কিছু বায়ু এবং এ ধরনের আরো কিছু জিনিস। এর মধ্যে কোনো জিনিসেও জীবন ও মানবাত্মার বৈশিষ্টের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মৃত নির্জিব উপাদানগুলোই একত্র করে তাকে একটি জীবিত ও প্রাণময় অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর এসব উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের দেহে পরিবেশিত হয় এবং সেখানে এর সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় যাদের মিলনের ফলে প্রতিদিন জীবন্ত ও প্রাণময় মানুষ তৈরি হয়ে বের হয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com



আসছে। এরপর নিজের আশপাশের মাটির ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। পাখি ও বায়ু অসংখ্য জিনিসের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল এবং অসংখ্য জিনিসের মূল এখানে সেখানে মাটির সাথে মিশে পড়েছিল। তাদের কারো মধ্যেও উদ্ভিদ জীবনের সামন্যতম লক্ষণও ছিল না। মানুষের চারপাশের বিশুষ্ক জমি এ লাখো লাখো মৃতের কবরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখনই এদের ওপর পড়লো পানির একটি ফোঁটা অমনি চারদিকে জেগে উঠলো জীবনের বিপুল সমারোহ। প্রত্যেকটি মৃত বৃক্ষমূল তার কবর থেকে মাথা উঁচু করলো এবং প্রত্যেকটি নিষ্প্রাণ বীজ একটি জীবন্ত চারাগাছের রূপ ধারণ করলো। এ মৃতকে জীবিত করার মহড়া প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ নিদর্শগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে তৃতীয় যে জিনিসটি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান।" সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কথা বাদ দিন শুধুমাত্র আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির কথাই ধরা যাক। আর পৃথিবীরও সমস্ত তত্ত্ব ও ঘটনাবলীর কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষ ও উদ্ভিদেরই জীবনধারা বিশ্লেষণ করা যাক। এখানে তাঁর শক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখা যায় সেগুলো দেখার পর কি কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারেন যে, আজ আমরা আল্লাহকে যা কিছু করতে দেখছি তিনি কেবল অতটুকুই করতে পারেন এবং কাল যদি তিনি কারো কিছু করতে চান তাহলে করতে পারবেন না ? আল্লাহ তো তবুও অনেক বড় ও উন্নত সত্তা, মানুষের সম্পর্কেও বিগত শতক পর্যন্ত লোকদের ধারণা ছিল যে, এরা শুধুমাত্র মাটির ওপর চলাচলকারী গাড়িই তৈরি করতে পারে, বাতাসে উড়ে চলা গাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা এর নেই। কিন্তু আজকের উড়োজাহাজ-গুলো জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের "সম্ভাবনা"র সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাদের ধারণা কত ভুল ছিল। আজ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আজকের কাজগুলো দেখে তাঁর জন্য সম্ভাবনার কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বলতে থাকে যে, তিনি যা কিছু করছেন এছাড়া আর কিছু করতে পারেন না, তাহলে সে শুধুমাত্র নিজেরই মনের সংকীর্ণতার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর শক্তি তার বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম কথা অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আসবেই" এবং "আল্লাহ অবশ্যই মৃত লোকদেরকে জীবিত করে উঠাবেন"—একথা দু'টি উপরে আলোচিত তিনটি কথার যৌক্তিক পরিণতি। আল্লাহর কাজগুলোকে তাঁর শক্তিমত্তার দিক দিয়ে দেখলে মন সাক্ষ দেবে যে, তিনি যখনই চাইবেন সকল মৃতকে আবার জীবিত করতে পারবেন, ইতিপূর্বে যাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছিলেন। আর যদি তাঁর কার্যাবলীকে তাঁর প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষ্য দেবে যে, এ দুটি কাজও তিনি অবশ্যই করবেন। কারণ, এগুলো ছাড়া যুক্তির দাবী পূর্ণ হয় না এবং একজন প্রাজ্ঞ সত্তা এ দাবী পূর্ণ করবেন না, এটা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করছে তার ফল আমরা দেখি যে, সে যখনই নিজের টাকা পয়সা, সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয় তার কাছ থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে হিসেব অবশ্যই নেয়। অর্থাৎ আমানত ও হিসেব-নিকেশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সীমিত প্রজ্ঞাও কোনো অবস্থায় এ সম্পর্ককে উপেক্ষা

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

*আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান[১০] পথনির্দেশনা[১১] ও আলো বিকিরণকারী কিতাব[১২] ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে[১৩] আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়।[১৪] এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো। এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যত, যা তোমার হাত তোমার জন্য তৈরি করেছে, নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।*

করতে পারে না। তারপর এ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষ ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে থাকে। ইচ্ছাকৃত কাজের সাথে নৈতিক দায়িত্বের ধারণা সম্পৃক্ত করে। কাজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করে। ভালো কাজের ফল হিসেবে প্রশংসা ও পুরস্কার পেতে চায় এবং মন্দ কাজের দরুন শাস্তি দাবী করে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে নিজেরাই একটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যে স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে এ প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন একথা কি কল্পনা করা যেতে পারে ? একথা কি মেনে নেয়া যায় যে, নিজের এতবড় দুনিয়াটা এত বিপুল সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হাতে সোপর্দ করার পর তিনি ভুলে গেছেন এবং এর হিসেব কখনো নেবেন না ? কোনো সুস্থ বোধসম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি কি সাক্ষ দিতে পারে যে, মানুষের যে সমস্ত খারাপ কাজ শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায় অথবা যেসব খারাপ কাজের উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেয়া যেতে পারেনি, সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কখনো আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং যেসব ভালো কাজ তাদের ন্যায়সংগত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে সেগুলো চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামত ও মৃত্যু পরের জীবন জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনিবার্য দাবী। এ দাবী পূরণ হওয়া নয় বরং পূরণ না হওয়াটাই সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিরোধী ও অযৌক্তিক।

১০. অর্থাৎ ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

১১. অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোনো যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, অথবা কোনো জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১২. অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব থেকে লাভ করা যায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

২ রুকূ'

*আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর বন্দেগী করে,[১৫] যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে পিছনের দিকে ফিরে যায়[১৬] তার দুনিয়াও গেলো এবং আখেরাতও। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৭] তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার, এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত।*

১৩. এর তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ এক, মূর্খতাপ্রসূত জিদ ও হঠকারিতা। দুই, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তিন, যে ব্যক্তি বুঝায় ও উপদেশ দান করে তার কথায় কর্ণপাত না করা।

১৪. প্রথমে ছিল তাদের কথা যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট ছিল। আর এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট নয় বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

১৫. অর্থাৎ দীনি বৃত্তের মধ্যখানে নয় বরং তার এক প্রান্তে বা কিনারায় অথবা অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে। যেমন কোনো দো-মনা ব্যক্তি কোনো সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে সেনাদল বিজয়লাভ করছে তাহলে তাদের সাথে মিলে যায় আর যদি দেখে পরাজিত হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে।

১৬. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের মানসিক গঠন অপরিপক্ব, আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে লাভের শর্তে। তাদের ঈমান এ শর্তের সাথে জড়িত হয় যে, তাদের আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দীন তাদের কাছে কোনো স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোনো ইচ্ছা ও আশা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব হলে তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার দীন তাদের কাছে খুবই ভালো। কিন্তু যখনই কোনো আপদ বালাই নেমে আসে অথবা আল্লাহর পথে কোনো বিপদ, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হতে হয় কিংবা কোনো আকাংখা পূর্ণ হয় না তখনই আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, রসূলের রিসালাত ও দীনের সত্যতা কোনোটার ওপরই তারা নিশ্চিত থাকে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾

*সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চেয়ে নিকটতম[১৮] নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী।[১৯] (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে[২০] আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হবে ; আল্লাহ যা চান তাই করেন।[২১] যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না তার একটি রশির সাহায্যে আকাশে পৌঁছে গিয়ে ছিদ্র করা উচিত তারপর দেখা উচিত তার কৌশল এমন কোনো জিনিসকে রদ করতে পারে কিনা যা তার বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ।[২২]—এ ধরনেরই সুস্পষ্ট কথা সহযোগে আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথ দেখান।*

এরপর তারা এমন প্রতিটি বেদীমূলে মাথা নোয়াতে উদ্যোগী হয় যেখানে তাদের লাভের আশা ও লোকসান থেকে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

১৭. এখানে একটি অনেক বড় সত্যকে কয়েকটি কথায় প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আসলে দো-মনা মুসলমানদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়। কাফের যখন নিজের রবের মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং পরকাল থেকে বেপরোয়া ও আল্লাহর আইনের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে দৌড়াতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল হারালেও দুনিয়ার স্বার্থ কিছু না কিছু হাসিল করেই নেয়। আর মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও স্থৈর্য সহকারে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করে তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, তবুও যদি দুনিয়া একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতেই থাকে, আখেরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এ দো-মনা মুসলমান নিজের দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না এবং আখেরাতেও তার সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার মন ও মস্তিষ্কের কোনো এক প্রকোষ্ঠে আল্লাহ ও আখেরাতের

www.banglabookpdf.blogspot.com



অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, দুনিয়ার দিকে দৌড়াতে থাকলে এগুলো তার হাত টেনে ধরে। ফলে নিছক দুনিয়াবী ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফেরের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আখেরাতের কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে বিধিনিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখেরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে সে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়।

১৮. প্রথম আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ক্ষতিকে উপকারের চেয়ে নিকটতর বলা হয়েছে। কারণ, তাদের কাছে দোয়া চেয়ে এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সামনে হাত পাতার মাধ্যমে সে নিজের ঈমান সংগে সংগেই ও নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে বসে। তবে যে লাভের আশায় সে তাদেরকে ডেকেছিল তা অর্জিত হবার ব্যাপারে বলা যায়, প্রকৃত সত্যের কথা বাদ দিলেও প্রকাশ্য অবস্থার দৃষ্টিতে সে নিজেও একথা স্বীকার করবে যে, তা অর্জিত হওয়াটা নিশ্চিত নয় এবং বাস্তবে তা সংঘটিত হবার নিকটতর সম্ভাবনাও নেই। হতে পারে, আল্লাহ তাকে আরো বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য কোনো আস্তানায় তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, সে আস্তানায় সে নিজের ঈমানও বিকিয়ে দিয়ে এসেছে এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয়নি।

১৯. অর্থাৎ মানুষ বা শয়তান যে-ই হোক না কেন, যে তাকে এ পথে এনেছে সে নিকৃষ্টতম কর্মসম্পাদক ও অভিভাবক এবং নিকৃষ্টতম বন্ধু ও সাথী।

২০. অর্থাৎ যাদের অবস্থা উল্লেখিত মতলবী, ধান্দাবাজ, দো-মনা ও দৃঢ় বিশ্বাসহীন মুসলমানের মতো নয় বরং যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতকে মেনে নেবার ফায়সালা করে তারপর ভালো মন্দ যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক এবং বিপদের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ুক বা বৃষ্টিধারার মতো পুরস্কার ঝরে পড়ুক সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদে সত্যের পথে এগিয়ে চলে।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তিনি যাকে যা চান দিয়ে দেন এবং যার থেকে যা চান ছিনিয়ে নেন। তিনি দিতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। না দিতে চাইলে আদায় করারও কেউ নেই।

২২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু মতবিরোধ হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে ছাদের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

www.banglabookpdf.blogspot.com



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾

*যারা ঈমান এনেছে[২৩] ও যারা ইহুদী হয়েছে[২৪] এবং সাবেয়ী,[২৫] খৃষ্টান[২৬] ও অগ্নি পূজারীরা[২৭] আর যারা শিরক করেছে[২৮] তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন।[২৯] সব জিনিসই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে। তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত[৩০] সবকিছুই যা আছে আকাশে[৩১] ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ[৩২] ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে?[৩৩] আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই[৩৪] আল্লাহ যাকিছু চান তাই করেন।[৩৫]*

দুই ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে কোনো দড়ির সাহায্যে আকাশে যাবার ও সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

তিন ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে অহীর সূত্র কেটে দেবার ব্যবস্থা করুক।

চার ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না, সে আকাশে গিয়ে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

পাঁচ ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে নিজের গৃহের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

ছয় ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে পৌঁছে সাহায্য আনার চেষ্টা করে দেখুক।

www.banglabookpdf.blogspot.com



এর মধ্যে প্রথম চারটি ব্যাখ্যা তো পূর্বাপর আলোচনার সাথে সম্পর্কহীন। আর শেষ দুটি ব্যাখ্যা যদিও পূর্বাপর আলোচনার বিষয়বস্তুর নিকটতর তবুও বক্তব্যের যথার্থ লক্ষে পৌছে না। ভাষণের ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিনারায় দাঁড়িয়ে বন্দেগীকারী ব্যক্তিই একথা মনে করে। যতক্ষণ অবস্থা ভালো থাকে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত থাকে এবং যখনই কোনো আপদ-বিপদ বা বালা-মসিবত আসে অথবা তাকে এমন কোনো অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যা তার কাছে অপ্রীতিকর, তখনই সে আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং সব আস্তানার বেদীমূলে মাথা ঘষতে থাকে। এ ব্যক্তির এ অবস্থা কেন ? এর কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালায় সন্তুষ্ট নয়। সে মনে করে ভাগ্য ভাংগা-গড়ার মূল সূত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতেও আছে। তাই সে আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার ডালি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়। তাই বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ ধরনের চিন্তা করে সে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখে নিতে পারে, এমন কি আকাশ চিরে ওপরে ঢুঁ মারতে পারলে তাও করে দেখে নিতে পারে, তার কোনো কৌশল আল্লাহর তাকদীরের এমন কোনো ফায়সালাকে বদলাতে পারে কি না যা তার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকে। আকাশে পৌছে যাওয়া এবং ছিদ্র করা মানে হচ্ছে মানুষ যত বড় বড় প্রচেষ্টার কথা কল্পনা করতে পারে তার মধ্যে বৃহত্তম প্রচেষ্টা চালানো। এ শব্দগুলোর কোনো শাব্দিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

২৩. অর্থাৎ "মুসলমান" যারা আপন আপন যুগে আল্লাহর সকল নবীকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা পূর্ববর্তী নবীদের সাথে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদাররাও ছিল এবং তারাও ছিল যারা ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু "কিনারায়" অবস্থান করে বন্দেগী করতো এবং কুফর ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান ছিলো।

২৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৭২ টীকা।

২৫. প্রাচীন যুগে সাবেয়ী নামে দুটি সম্প্রদায় সর্বজন পরিচিত ছিল। এদের একটি ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুসারী। তারা ইরাকের উচ্চভূমিতে (অর্থাৎ আল জাযীরা) বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুগামী হিসেবে তারা মাথায় পানি ছিটিয়ে ধর্মান্তরিত হবার পদ্ধতি মেনে চলতো। তারকা পূজারী দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের হযরত শীশ ও হযরত ইদরিস আলাইহিমাস সালামের অনুসারী বলে দাবী করতো। তারা মৌলিক পদার্থের ওপর গ্রহের এবং গ্রহের ওপর ফেরেশতাদের শাসনের প্রবক্তা ছিল। হারান ছিল তাদের কেন্দ্র। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় দলটি নিজেদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এখানে প্রথম দলটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ সম্ভবত কুরআন নাযিলের সময় দ্বিতীয় দলটি এ নামে অভিহিত ছিল না।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৩৬ টীকা দেখুন।

২৭. অর্থাৎ ইরানের অগ্নি উপাসকগণ, যারা আলোক ও অন্ধকারের দুজন ইলাহর প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদেরকে যরদৃশতের অনুসারী দাবী করতো। মায্দাকের ভ্রষ্টতা

www.banglabookpdf.blogspot.com



তাদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল। এমন কি তাদের মধ্যে সহোদর বোনের সাথে বিয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

২৮. অর্থাৎ আরব ও অন্যান্য দেশের মুশরিকবৃন্দ, যারা ওপরের বিভিন্ন দলীয় নামের মতো কোনো নামে আখ্যায়িত ছিল না। কুরআন মজীদ তাদেরকে অন্যান্য দল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য "মুশরিক" ও "যারা শিরক করেছে" ধরনের পারিভাষিক নামে স্মরণ করছে। অবশ্য মু'মিনদের দল ছাড়া বাকি সবার আকীদা ও কর্মধারায় শিরক অনুপ্রবেশ করেছিল।

২৯. অর্থাৎ মানুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে যে মতবিরোধ ও বিবাদ রয়েছে এ দুনিয়ায় তার কোনো ফায়সালা হবে না। তার ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে তাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী এবং কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়া হবে। যদিও এক অর্থে দুনিয়ায় আল্লাহর কিতাবগুলোও এ ফায়সালা করে, কিন্তু এখানে ফায়সালা শব্দটি "বিবাদ মিটানো" এবং দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় সংগত বিচার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এক দলের পক্ষে এবং অন্য দলের বিপক্ষে যথারীতি ডিক্রি জারী করা হবে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আর রা'আদ, ২৪ টীকা, সূরা আন্ নহল, ৪১-৪২ টীকা।

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতা, নক্ষত্রমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য জগতে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব বা পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বায়ু ও আলোর মতো অ-বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ক্ষমতাহীন যাবতীয় সৃষ্টি।

৩২. অর্থাৎ যারা নিছক বাধ্য হয়েই নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, সানন্দে ও আনুগত্যশীলতা সহকারেও তাঁকে সিজদা করে। পরবর্তী বাক্যে তাদের মোকাবিলায় মানব সম্প্রদায়ের অন্য যে দলের কথা বলা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে নত হতে অস্বীকার করে। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির মতো তারাও প্রাকৃতিক আইনের বাঁধন মুক্ত নয় এবং সবার সাথে বাধ্য হয়ে সিজদা করার মধ্যে তারাও রয়েছে। নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনের কারণে তারা আযাবের অধিকারী হয়।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও কিয়ামতের দিনে এসব বিভিন্ন দলের বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে তবুও যথার্থ অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হলে যে কেউ আজো দেখতে পারে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শেষ ফায়সালা কার পক্ষে হওয়া উচিত। পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র একই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পূর্ণ শক্তিতে ও সর্বব্যাপীভাবে চলছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা একথারই সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে শুরু করে আকাশের বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই একটি আইনের শৃংখলে বাঁধা রয়েছে এবং তা থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক নড়ার ক্ষমতা কারোর নেই। মু'মিন তো অন্তর থেকেই তাঁর কাছে মাথা নত করে কিন্তু যে নাস্তিকটি তাঁর অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং যে মুশরিকটি প্রতিটি ক্ষমতাহীন সত্তার সামনে মাথা নত করে সেও বাতাস ও পানির মতো সমানভাবে তার আনুগত্য করতে বাধ্য। কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী অলী ও দেবদেবীর মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার সামান্যতম নামগন্ধও

www.banglabookpdf.blogspot.com



هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

*এ দু'টি পক্ষ এদের মধ্যে রয়েছে এদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।[৩৬] এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হয়ে গেছে,[৩৭] তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয়, পেটের ভেতরের অংশও গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখনই আবার তার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে, বলা হবে, এবার দহন জ্বালার স্বাদ নাও।*

নেই। তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও উপাস্য হবার মর্যাদা দান করা অথবা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর সম জাতীয় ও সদৃশ গণ্য করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কোনো শাসকবিহীন আইন, স্রষ্টাবিহীন প্রকৃতি ও পরিচালকবিহীন ব্যবস্থার পক্ষে এত বড় বিশ্ব-জাহানকে অস্তিত্ব দান করা, নিজেই তাকে সুষ্ঠ নিয়ম-শৃংখলার সাথে পরিচালনা করা এবং এ বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর কর্মকুশলতা দেখানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশ্ব-জাহানের এ উন্মুক্ত গ্রন্থটি সামনে থাকার পরও যে ব্যক্তি নবীদের কথা মানে না এবং বিভিন্ন মনগড়া বিশ্বাস অবলম্বন করে আল্লাহর ব্যাপারে বিরোধে প্রবৃত্ত হয় তার মিথ্যাশ্রয়ী হওয়া ঠিক তেমনিভাবে প্রমাণিত যেমন কিয়ামতের দিন প্রমাণিত হবে।

৩৪. এখানে লাঞ্ছনা ও সম্মান অর্থ সত্য অস্বীকার ও তার অনুসরণ। কারণ, লাঞ্ছনা ও সম্মানের আকারেই এর অনিবার্য ফল দেখা যায়। যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়। সে নিজে যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তার ভাগ্যে তাই লিখে দেন। তারপর আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে?

৩৫. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব। সূরা হজ্জের এ সিজদাটির ব্যাপারে সবাই একমত। তেলাওয়াতের সিজদার তত্বজ্ঞান, তাৎপর্য ও বিধান জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ১৫৭ টীকা।

www.banglabookpdf.blogspot.com



إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

*(অন্যদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে[৩৮] এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে[৩৯] এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহর পথ।[৪০]*

৩৬. এখানে আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধকারী সমস্ত দলগুলোকে তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুটি পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি পক্ষ নবীদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় পক্ষ নবীদের কথা মানে না এবং তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ রয়েছে এবং তাদের কুফরীর বিভিন্ন বিচিত্র রূপও পরিগ্রহ করেছে।

৩৭. ভবিষ্যতে যে বিষয়টির ঘটে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত তার প্রতি জোর দেবার জন্য সেটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন তা ঘটে গেছে। আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহীমের ৫০ আয়াতে سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইবরাহীম ৫৮ টীকা।

৩৮. তাদেরকে রাজকীয় ও জাঁকালো পোশাক পরানো হবে, এ ধারণা দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। কুরআন নাযিলের যুগে রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ধনীরা সোনা ও মণি-মুক্তার অলংকার পরতেন। আমাদের যুগেও উপমহাদেশের রাজা-মহারাজা ও নওয়াবরাও এ ধরনের অলংকার পরতেন।

৩৯. যদিও পবিত্র কথা শব্দের অর্থ ব্যাপক কিন্তু এখানে এর অর্থ হচ্ছে সে কালেমায়ে তাইয়েবা ও সৎ আকীদ-বিশ্বাস যা গ্রহণ করে সে মু'মিন হয়েছে।

৪০. যেমন ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আমার মতে এখানে সূরার মক্কী যুগে অবতীর্ণ অংশ শেষ হয়ে যায়। এ অংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কী সূরাগুলোর মতো। এর মধ্যে এমন কোনো আলামতও নেই যা থেকে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সম্ভবত

www.banglabookpdf.blogspot.com



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

*যারা কুফরী করেছে[৪১] এবং যারা (আজ) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে আর সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে[৪২] যাকে আমি তৈরি করেছি সব লোকের জন্য যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান।[৪৩] (তাদের নীতি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য) এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে যুলুমের পথ অবলম্বন করবে৪৪ তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদান করাবো।*

এর পুরো অংশটি বা এর কোনো একটি অংশ মাদানী যুগে নাযিল হয়। শুধুমাত্র এ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (এ দু'টি দল যাদের মধ্যে তাদের রবের ব্যাপারে বিরোধ আছে) আয়াতটির ব্যাপারে কোনো কোনো তাফসীরকার একথা বলেন যে, এটি মাদানী আয়াত। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা বদর যুদ্ধের দুই পক্ষকে এখানে দুই পক্ষ ধরেছেন। অথচ এটি কোনো মজবুত ভিত্তি নয়। কারণ, এখানে যে দুই পক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এর আগে ও পরে এমন কোনো জিনিস নেই যা থেকে এ ইংগিতকে বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়। শব্দগুলোর অর্থ ব্যাপক এবং পরবর্তী ইবারত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এখানে কুফর ও ঈমানের এমন বিরোধের কথা বলা হয়েছে যা শুরু থেকে চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর সম্পর্ক যদি বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে থাকতো তাহলে এর জায়গা হতো সূরা আনফালে, এ সূরায় নয় এবং এ বক্তব্য ধারার মধ্যেও নয়। এ তাফসীর পদ্ধতি যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, কুরআনের আয়াতগুলো একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কোনো প্রকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছাড়াই এমনিই যেখানে ইচ্ছা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনা ও শৃংখলা এ ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

৪১. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। পরবর্তী বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফেরদের কথা বলা হচ্ছে।

৪২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে হজ্জ ও উমরাহ করতে দেয় না।

৪৩. অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত, যার যিয়ারত থেকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com



এখানে ফিকাহর দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে ঃ

প্রথমত মসজিদে হারাম অর্থ কি ? এটা কি শুধু মসজিদকে বুঝাচ্ছে না সমগ্র মক্কা নগরীকে ?

দ্বিতীয়ত এখানে "আকিফ" (অবস্থানকারী) ও "বাদ" (বহিরাগত)-এর অধিকার সমান হবার অর্থ কি ?

এক দলের মতে এর অর্থ শুধু মসজিদ, সমগ্র মক্কা নগরী নয়। কুরআনের শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়। এখানে অধিকার সমান হবার অর্থ ইবাদাত করার সমান অধিকার। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে জানা যায় ঃ

يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِّى مِنْكُمْ مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اَوْ صَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ

"হে আবদে মান্নাফের সন্তানগণ ! তোমাদের যে কেউ জনগণের বিষয়াদির ওপর কোনো প্রকার কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তার পক্ষে রাতে ও দিনের কোনো সময় কোনো ব্যক্তির কাবাগৃহের তওয়াফ করা অথবা নামায পড়ায় বাধা দেয়া উচিত নয়।"

এ অভিমতের সমর্থকরা বলেন, মসজিদে হারাম বলতে পুরা হারাম শরীফ মনে করা এবং তারপর সেখানে সবদিক দিয়ে স্থানীয় অধিবাসী ও বাইর থেকে আগতদের অধিকার সমান গণ্য করা ভুল; কারণ মক্কার ঘরবাড়ী ও জমি জমার ওপর লোকদের মালিকানা, অধিকার, উত্তরাধিকার এবং কেনা-বেচা ও ইজারা দেবার অধিকার ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের আগমনের পরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে মক্কার কারাগার নির্মাণের জন্য সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার গৃহ চার হাজার দিরহামে কিনে নেয়া হয়। কাজেই এ সাম্য শুধুমাত্র ইবাদাতের ব্যাপারে, অন্য কোনো বিষয়ে নয়। এটি ইমাম শাফেঈ ও তাঁর সমমনা লোকদের উক্তি।

দ্বিতীয় দলটির মতে, মসজিদে হারাম বলতে মক্কার সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝনো হয়েছে। এর প্রথম যুক্তি হচ্ছে, এ সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতেই মক্কার মুশরিকদেরকে যে বিষয়ে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসলমানদের হজ্জে বাধা হওয়া। তাদের এ কাজকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, সেখানে সবার অধিকার সমান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হজ্জ কেবল মসজিদে হয় না বরং সাফা ও মারওয়া থেকে নিয়ে মিনা, মুযদালিফা, আরাফাত সবই হজ্জ অনুষ্ঠানের স্থানের অন্তরভুক্ত। তারপর কুরআনে শুধু এক জায়গায়ই নয়, অসংখ্য জায়গায় মসজিদে হারাম বলে সমগ্র হারাম শরীফ ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

www.banglabookpdf.blogspot.com



"মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার চাইতে বড় গুনাহ।"

(আল বাকারাহ ঃ ২১৭ আয়াত)

বলাবাহুল্য, এখানে মসজিদে হারামে যারা নামায পড়ায় রত তাদেরকে বের করা নয় বরং মক্কা থেকে মুসলমান অধিবাসীদেরকে বের করা বুঝানো হয়ছে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"এ সুবিধা তার জন্য যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয় ।"

(আল বাকারাহ ঃ ১৯৬)

এখানেও মসজিদে হারাম বলতে সমগ্র মক্কার হারাম শরীফ, নিছক মসজিদ নয়। কাজেই "মসজিদে হারাম" সাম্যকে শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে সাম্য গণ্য করা যেতে পারে না বরং এটি হচ্ছে মক্কার হারামের মধ্যে সাম্য।

তারপর এ দলটি আরো বলে, সাম্য ও সমান অধিকার শুধুমাত্র ইবাদাত, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নয় বরং মক্কার হারামে সকল প্রকার অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে। এ দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত। কাজেই এর এবং এর ইমারত-সমূহের ওপর কারো মালিকানা অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জায়গায় অবস্থান করতে পারে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না এবং কোনো উপবেশনকারীকে উঠিয়ে দিতেও পারে না। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা অসংখ্য হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কর্ম পেশ করে থাকেন। যেমন,

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بيوتها

"মক্কা মুসাফিরদের অবতরণস্থল, এর জমি বিক্রি করা যাবে না এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করাও যাবে না।"

ইবরাহীম নাখ্ঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই একটি (মুরসাল) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّٰهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ اِجَارَةُ بُيُوْتِهَا.

"মক্কাকে আল্লাহ হারাম গণ্য করেছেন। এর জমি বিক্রি করা এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করা হালাল নয়।"

(উল্লেখ করা যেতে পারে, ইবরাহীম নাখ্ঈর মুরসাল তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়া বর্ণিত হাদীস মারফূ' তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ সহ বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত)। কারণ, তাঁর সর্বজন পরিচিত নিয়ম হচ্ছে, যখন তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই (মুরসাল) কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তখন আসলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মাধ্যমেই বর্ণনা

www.banglabookpdf.blogspot.com



করেন। মুজাহিদও প্রায় এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 'আলকামাহ ইবনে ফাদলাহ বর্ণনা করেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমলে মক্কার জমিকে পতিত জমি মনে করা হতো। যার প্রয়োজন হতো এখানে থাকতো এবং প্রয়োজন ফুরালে অন্য কাউকে বসিয়ে দিতো।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) হুকুম দিয়েছিলেন যে, হজ্জের সময় মক্কার কোনো লোক নিজের দরজা বন্ধ করতে পারবে না। বরং মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের বাড়ির আঙিনা খোলা রাখার হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন এবং আগমনকারীদেরকে তাদের ইচ্ছামতো স্থানে অবস্থান করতে দেয়ার জন্য আঙিনায় দরজা বসাতে নিষেধ করতেন। আতাও এ একই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) একমাত্র সোহাইল ইবনে আমরকে আঙিনায় দরজা বসাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসায় ব্যাপদেশে তাঁকে নিজের উট সেখানে আটকে রাখতে হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মক্কার গৃহের ভাড়া নেয় সে নিজের পেট আগুন দিয়ে ভরে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি হচ্ছে, আল্লাহ মক্কার সমগ্র হারামকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবার অধিকার সমান। বাইরের লোকদের থেকে ভাড়া আদায় করার কোনো অধিকার মক্কার লোকদের নেই।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মক্কার গভর্ণরের নামে ফরমান জারি করেন যে, মক্কার গৃহের ভাড়া নেয়া যাবে না। কারণ, এটা হারাম।

এসব রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক তাবেঈ এমত পোষণ করেন এবং ফকীহগণের মধ্যে ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), সুফিয়ান সওয়ারী (র), আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহও এ মতের অনুসারী হয়েছেন যে, মক্কার জমি বেচা-কেনা করা এবং কমপক্ষে হজ্জ মওসূমে মক্কার গৃহের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ মক্কার গৃহসমূহের ওপর জনগণের মালিকানা অধিকার স্বীকার করেছেন এবং জমি হিসেবে নয়, গৃহ হিসেবে সেগুলো বেচা-কেনা বৈধ গণ্য করেছেন।

এ অভিমতটিই আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের কাছাকাছি মনে হয়। কারণ, আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের ওপর হজ্জ এ জন্য ফরয করেননি যে, এটা মক্কার মুসলমানদের উপার্জনের একটা উপায় হবে এবং যেসব মুসলমান ফরয পালনের জন্য বাধ্য হয়ে সেখানে যাবে তাদের কাছ থেকে সেখানকার গৃহমালিক ও জমি মালিকগণ ভাড়া আদায় করে লুটের বাজার গরম করবেন। বরং সেগুলো সকল ঈমানদারের জন্য ব্যাপকভাবে ওয়াকফকৃত। তার জমির ওপর কারোর মালিকানা নেই। প্রত্যেক যিয়ারতকারী তার ইচ্ছামত যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারে।

৪৪. এখানে নিছক কোনো বিশেষ কাজ নয় বরং এমন প্রত্যেকটি কাজই বুঝানো হয়েছে যা সত্য থেকে বিচ্যুত এবং জুলুমের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। যদিও সকল অবস্থায়

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ ধরনের কাজ করা পাপ কিন্তু হারাম শরীফে একাজ করা আরো অনেক বেশী মারাত্মক পাপ। মুফাস্‌সিরগণ বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়াকে পর্যন্ত হারাম শরীফের মধ্যে বেদীনী গণ্য করেছেন এবং একে এ আয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সমস্ত সাধারণ গোনাহ ছাড়া হারাম শরীফের মর্যাদার সাথে জড়িত যে বিশেষ বিধানগুলো আছে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা সুস্পষ্টভাবে গোনাহের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। যেমন ঃ

হারামের বাইরে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে অথবা এমন কোনো অপরাধ করে যার ফলে তার ওপর শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তারপর সে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয়, তাহলে যতক্ষণ সে সেখানে থাকে তার ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। হারামের এ মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে চলে আসছে। মক্কা বিজয়ের দিন শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য এ হুরমত উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল তারপর আবার চিরকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুরআন বলেছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا "যে এর মধ্যে প্রবেশ করলো সে নিরাপত্তাধীন হয়ে গেলো।" বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি আমরা নিজেদের পিতৃহন্তাকেও সেখানে পাই তাহলে তার গায়েও হাত দেবো না। এ কারণে অধিকাংশ তাবেঈ, হানাফী, হাম্বলী ও আহলে হাদীস উলামা হারামের বাইরে অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি হারামের মধ্যে দেয়া যেতে পারে না বলে মত পোষণ করেন।

সেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম। মক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "হে লোকেরা ! আল্লাহ সৃষ্টির শুরু থেকেই মক্কাকে হারাম করেছেন এবং আল্লাহর মর্যাদাদানের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এটি মর্যাদাসম্পন্ন তথা হারাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়।" তারপর তিনি বলেছিলেন, "যদি আমার এ যুদ্ধকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে কোনো ব্যক্তি এখানে রক্তপাত বৈধ করে নেয় তাহলে তাকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য এটা বৈধ করেছিলেন, তোমার জন্য নয়। আর আমার জন্যও এটা মাত্র একটি দিনের একটি সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল, আবার আজ গতকালের মতই তার হারাম হওয়ার হুকুম সেই একইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

সেখানকার প্রাকৃতিক গাছপালা কাটা যেতে পারে না। জমিতে স্বতঃ উৎপাদিত ঘাস তুলে ফেলা যেতে পারে না এবং পাখ-পাখালী ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার শিকার করাও যেতে পারে না। হারামের বাইরে শিকার করার জন্য সেখান থেকে প্রাণীদের তাড়িয়ে বাইরে আনাও যেতে পারে না। শুধুমাত্র সাপ, বিছা ইত্যাদি অনিষ্টকারী প্রাণীগুলো এর অন্তরভুক্ত নয়। আর ইযখির (এক ধরনের সুগন্ধি ঘাস) ও শুকনা ঘাসকে স্বতঃউৎপাদিত ঘাস থেকে আলাদা করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে সহী হাদীসসমূহে পরিষ্কার বিধান রয়েছে।

সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষেধ। যেমন আবু দাউদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ
بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ
بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾
لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

*স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কাবাঘর) জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম (এ নির্দেশনা সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও রুকূ'-সিজদা-কিয়ামকারীদের জন্য পবিত্র রাখো[৪৫] এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও, তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে চড়ে[৪৬] তোমার কাছে আসবে,[৪৭] যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায়[৪৮] এবং তিনি তাদেরকে যেসব পশু দান করেছেন তার উপর কয়েকটি নির্ধারিত দিনে আল্লাহর নাম নেয়[৪৯] নিজেরাও খাও এবং দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকেও খাওয়াও।[৫০]*

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস উঠাতে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহর নিয়তে আসে সে ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে অন্য কোনো নিয়তে সেখানে প্রবেশকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা অপরিহার্য কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইবনে আব্বাসের মত হচ্ছে, কোনো অবস্থায়ই ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করা যেতে পারে না। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি করে উক্তিও এ মতের সপক্ষে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র তাদের এই ইহরাম বাঁধতে হবে না যাদের নিজেদের কাজের জন্য বারবার সেখানে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাকি সবাইকে ইহরাম বাঁধতে হবে। এটি হচ্ছে ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর দ্বিতীয় উক্তি। তৃতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি মীকাতের (হারাম শরীফের মধ্যে প্রবেশের সময় যেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমানার মধ্যে বাস করে সে ইহরাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু মীকাতের সীমানার বাইরে অবস্থানকারীরা বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটি ইমাম আবু হানীফার উক্তি।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৪৫. কোনো কোনো মুফাস্‌সির হযরত ইবরাহীমকে (আ) যে ফরমান দেয়া হয়েছিল "পবিত্র রাখো" পর্যন্তই তা শেষ করে দিয়েছেন এবং "হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও" নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু বক্তব্যের ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এ সম্বোধনও হযরত ইবরাহীমের প্রতিই করা হয়েছে এবং তাঁকে কাবাঘর নির্মাণের সময় যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এটি তারই একটি অংশ। এ ছাড়াও এখানে বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে একথা বলা যে, প্রথম দিন থেকেই এ ঘরটি এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল এবং আল্লাহর বন্দেগীকারী সকল মানুষের এখানে আসার সাধারণ অনুমতি ছিল।

৪৬. মূলে ضامر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি বিশেষ করে শীর্ণ ও ক্ষীণকায় উটের প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য এমন সব মুসাফিরের ছবি তুলে ধরা যারা দূর-দূরান্ত থেকে চলে আসছে এবং পথে তাদের উটগুলো খাদ্য ও পানীয় না পাওয়ার কারণে শীর্ণকায় হয়ে গেছে।

৪৭. শুরুতে হযরত ইবরাহীমকে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এখানে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনের দিকে যা বলা হয়েছে তা এর সাথে বাড়তি সংযোজন। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে এ সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের এ অভিমতের কারণ হচ্ছে এই যে, "এই প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে" পর্যন্তই এই বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এটি কাবাঘর নির্মাণের কাজ শেষ হবার সময় বলা হয়ে থাকবে। (হযরত ইবরাহীমের কাবাঘর নির্মাণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারার ১২৫-১২৯, আলে ইমরান ৯৬-৯৭ এবং ইবরাহীম ৩৫-৪১ আয়াত)

৪৮. এখানে কেবলমাত্র দীনী কল্যাণের কথাই বলা হয়নি, এর সাথে পার্থিব কল্যাণও সংযুক্ত রয়েছে। এ কাবাঘর ও হজ্জের বরকতেই হযরত ইবরাহীমের (আ) যুগ থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছর ধরে আরবরা একটি ঐক্যকেন্দ্র লাভ করেছে। এটিই তাদের আরবীয় অস্তিত্বকে গোত্রবাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে। কেন্দ্রের সাথে এর সংযুক্তি এবং হজ্জের জন্য প্রতি বছর দেশের সব এলাকা থেকে লোকদের এখানে আসা যাওয়ার কারণে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক থাকে, তাদের মধ্যে আরব হবার অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং তারা চিন্তা ও তথ্য সরবরাহ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করে। তারপর এ হজ্জের বরকতেই আরবের যাবতীয় সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা অন্তত চারমাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেতো এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেতো যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারতো এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৮০-৮১ এবং আল মায়েদাহ ১১৩ টীকা।

ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দীনী কল্যাণের সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণও কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমত।

www.banglabookpdf.blogspot.com



কা'বা শরীফের নক্সা

www.banglabookpdf.blogspot.com
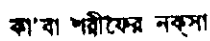


৪৯. পশু বলতে এখানে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উট, গুরু, ছাগল, ভেড়া যেমন সূরা আনআমের ১৪২-১৪৪ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের উপর আল্লাহর নাম নেবার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে যবেহ করা যেমন পরবর্তী বাক্য নিজেই বলে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে কুরবানীর জন্য সাধারণভাবে "পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া"র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব জায়গায়ই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। এভাবে যেন এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করা কাফের ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলমান যখনই পশু যবেহ করবে আল্লাহর নাম নিয়ে করবে এবং যখনই কুরবানী করবে আল্লাহর জন্য করবে।

কয়েকটি নির্ধারিত দিন বলতে কোন্ দিনের কথা বুঝানো হয়েছে ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে, এর অর্থ, যিলহজ্জের প্রথম দশটি দিন। ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, ইবরাহীম নখ্ঈ, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বহু সাহাবী ও তাবেঈনের এ মত উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)-ও এ মতের পক্ষে। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও (র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ, ইয়াওমুন নাহর (অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ) এবং তার পরের তিন দিন। এর সমর্থনে ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), ইবরাহীম নখ্ঈ, হাসান ও আতার উক্তি পেশ করা হয়। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও (র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তৃতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ তিন দিন তথা ইয়াওমুন নাহর (কুরবানীর ঈদের দিন) এবং এর পরের দু'দিন। এর সমর্থনে হযরত উমর (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আবু হুরাইরাহ (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) ও সাঈদ ইবনে জুবায়েরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। ফকীহগণের মধ্য থেকে সুফিয়ান সাওরী (র), ইমাম মালেক (র) ইমাম আবু ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। হানাফী ও মালেকী মাযহাবে এ মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু একক উক্তি আছে। যেমন কেউ কুরবানীর দিনগুলোকে পহেলা মহররমের দিন পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। কেউ শুধুমাত্র ইয়াওমুন নাহরের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কেউ ইয়াওমুন নাহরের পরে মাত্র আর একদিন কুরবানীর দিন হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এগুলো দুর্বল উক্তি। এসবের পেছনে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ নেই।

৫০. কেউ কেউ এ বক্তব্যের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, খাওয়া ও খাওয়ানো উভয়টিই ওয়াজিব। কারণ, এখানে আদেশসূচক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য একটি দলের মতে, খাওয়া হচ্ছে মুস্তাহাব এবং খাওয়ানো ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেঈ (র) এ মত প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় দল বলেন, খাওয়া ও খাওয়ানো দু'টোই মুস্তাহাব। খাওয়া মুস্তাহাব হবার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহেলী যুগে লোকেরা নিজেদের কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষেধ মনে করতো। আর খাওয়ানো এজন্য পছন্দনীয় যে, এর মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। এটি ইমাম আবু

www.banglabookpdf.blogspot.com



ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝

*তারপর নিজেদের ময়লা দূর করে,[৫১] নিজেদের মানত পূর্ণ করে[৫২] এবং এ প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।[৫৩]*

*এ ছিল (কাবা নির্মাণের উদ্দেশ্য) এবং যে কেউ আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে সম্মান করবে, তার রবের কাছে এ হবে তারই জন্য ভালো।[৫৪]*

*আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে,[৫৫] সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের বলে দেয়া হয়েছে।[৫৬] কাজেই মূর্তিসমূহের আবর্জনা থেকে বাঁচো,[৫৭] মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো,[৫৮] একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।[৫৯]*

হানীফার (র) মত। হাসান বসরী, আতা, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্ঈ থেকে ইবনে জারীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَكُلُوا مِنْهَا এর মধ্যে আদেশসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের কারণে খাওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ হুকুমটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا "যখন তোমরা ইহরামের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসো তখন আবার শিকার করো।" (আল মায়েদাহ ঃ ২) এবং فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ "তারপর যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো।" (আল জুমআহ ঃ ১০) এর অর্থ এই নয় যে, ইহরাম থেকে বের হয়ে শিকার করা এবং জুমআর নামায শেষে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া ওয়াজিব। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ এরপর এমনটি করার পথে কোনো বাধা নেই। অনুরূপভাবে এখানেও যেহেতু

www.banglabookpdf.blogspot.com



লোকেরা কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষিদ্ধ মনে করতো তাই বলা হয়েছে ঃ না, তা খাও অর্থাৎ এটা মোটেই নিষিদ্ধ নয়।

দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে আহার করানোর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তিকে আহার করানো যেতে পারে না। বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অভাবী না হলেও তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত। আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমার হাতে কুরবানীর পশু পাঠান এবং নির্দেশ দেন, কুরবানীর দিন একে যবেহ করবে, নিজে খাবে, মিসকীনদেরকে দেবে এবং আমার ভাইয়ের ঘরে পাঠাবে। ইবনে উমরও (রা) একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ একটি অংশ খাও, একটি অংশ প্রতিবেশীদেরকে দাও এবং একটি অংশ মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করো।

৫১. অর্থাৎ ইয়াওমুন নাহরে (১০ যিলহজ্জ) কুরবানীর কাজ শেষ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে, ক্ষৌরকর্ম করবে, গোছল করবে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে এবং ইহরাম অবস্থায় যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল সেগুলো খতম করে দেবে। تَفَثٌ এর আসল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সফরকালে যেসব ধূলো-ময়লা মানুষের গায়ে লেগে যায়। কিন্তু হজ্জ প্রসংগে যখন ধূলো-ময়লা দূর করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তখন এর সে একই অর্থ গ্রহণ করা হবে যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, হাজী যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ও কুরবানীর কাজ শেষ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চুল ও নখ কাটতে পারবেন না এবং শরীরের অন্য কোনো পরিচ্ছন্নতার কাজও করতে পারবেন না। (এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, কুরবানীর কাজ শেষ করার পর অন্যান্য যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না যতক্ষণ না "তাওয়াফে ইফাদাহ" শেষ করা হয়।)

৫২. অর্থাৎ এ সময়ের জন্য যে ব্যক্তি কোনো মানত করে।

৫৩. কাবাঘরের জন্য الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ। "আতীক" শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে প্রাচীন। দ্বিতীয় অর্থ স্বাধীন, যার ওপর কারোর মালিকানা নেই। তৃতীয় অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। এ তিনটি অর্থই এ পবিত্র ঘরটির বেলায় প্রযোজ্য।

তাওয়াফ বলতে "তাওয়াফে ইফাদাহ" অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত বুঝানো হয়েছে। ইয়াওমুন নাহরে (কুরবানীর দিন) কুরবানী করার ও ইহরাম খুলে ফেলার পর এ তাওয়াফ করা হয়। এটি হজ্জের রোকন তথা ফরযের অন্তরভুক্ত। আর যেহেতু ধূলা-ময়লা দূর করার হুকুমের সাথে সাথেই এর উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ বক্তব্য একথা প্রকাশ করে যে, কুরবানী করার এবং ইহরাম খুলে গোসল করে নেবার পর এ তাওয়াফ করা উচিত।

৫৪. আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা সাধারণ উপদেশ। আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশালী জিনিসের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একথা বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদে হারাম, হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হারামের যেসব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ বক্তব্যের সেগুলোই প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও রয়েছে যে, কুরাইশরা

www.banglabookpdf.blogspot.com



হারাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে, তাদের জন্য হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়ে হজ্জের কার্যক্রমের মধ্যে জাহেলী ও মুশরীকী রীতিনীতি অন্তরভুক্ত করে এবং আল্লাহর ঘরকে শিরকের আবর্জনায় দূষিত, কলুষিত করে এমন বহু মর্যাদাশালী জিনিসের মর্যাদা বিনষ্ট করে দিয়েছে যেগুলোর মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

৫৫. এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি ভুল ধারণা দূর করা। প্রথমত কুরাইশ ও আরবের মুশরিকরা "বাহীরা", "সায়েবা", "অসীলা" ও "হাম"কেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্য গণ্য করতো। তাই বলা হয়েছে, এগুলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা নয়। বরং তিনি সমস্ত গৃহপালিত পশু হালাল করেছেন। দ্বিতীয়ত ইহরাম অবস্থায় যেভাবে শিকার করা হারাম তেমনিভাবে যেন একথা মনে না করা হয় যে, গৃহপালিত জন্তু যবেহ করা ও খাওয়াও হারাম। তাই বলা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

৫৬. সূরা আনআম ও সূরা নাহলে যে হুকুম দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ মৃত, রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা পশু। আনআম, ১৪৫ ও নাহল, ১১৫ আয়াত।

৫৭. অর্থাৎ মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাকো যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অন্য কথায় বলা যায়, তা যেন নাপাক ও ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং কাছে যাবার সাথে সাথেই মানুষ তার সংস্পর্শ লাভ করে নাপাক ও নোংরা হয়ে যাবে।

৫৮. যদিও শব্দগুলো এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ থেকে প্রত্যেকটি মিথ্যা, অপবাদ ও মিথ্যা সাক্ষের হারাম হওয়া প্রমাণ হয় তবুও এ আলোচনায় বিশেষভাবে এমনসব বাতিল আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, রীতি-রেওয়াজ ও কল্পনা-কুসংস্কারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেগুলোর ওপর কুফরী ও শিরকের ভিত গড়ে উঠেছে। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে তাঁর বান্দাদেরকে অংশীদার করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এ থেকে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। আবার আরবের মুশরিকরা যে মিথ্যার ভিত্তিতে "বাহীরা", "সায়েবা" ও "হাম" ইত্যাদিকে হারাম গণ্য করতো তাও এ ফরমানের সরাসরি আওতাধীনে এসে যায়। যেমন সূরা আন নাহল-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ـ

"আর তোমাদের কণ্ঠ যে মিথ্যা বিধান দিয়ে থাকে যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এ ধরনের বিধান দিয়ে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করো না।" (১১৬ আয়াত)

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ সংগে মিথ্যা সাক্ষ ও মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। যেমন বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله

"মিথ্যা সাক্ষ দেওয়াকে আল্লাহর সাথে শিরক করার সমান পর্যায়ে রাখা হয়েছে।"

এরপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করেছেন। ইসলামী আইনে এ অপরাধটি শাস্তিযোগ্য। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদের (র) ফতোয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে এবং তাকে দীর্ঘকাল অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে। হযরত উমরও (রা) একথাই বলেছেন এবং কার্যত এ পদক্ষেপই নিয়েছেন। মাকহূলের বর্ণনা হচ্ছে হযরত উমর (রা) বলেন,

يضرب ظهره ويحلق راسه ويسخم وجهه ويطال حبسه

"তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমের নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত উমরের (রা) আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ফলে তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্য জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

৫৯. এ উপমায় আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাকে। এ অবস্থায় সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা হয় না এবং তার প্রকৃতি তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে চেনে না। মানুষ যদি নবী প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করে তাহলে সে জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি সহকারে এ প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে নিচের দিকে নয় বরং উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু শিরক (এবং শুধুমাত্র শিরকই নয় বরং জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদও) গ্রহণ করার সাথে সাথেই সে নিজের প্রকৃতির আকাশ থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে যায়। তখন সে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার যে কোনোটির মুখোমুখি হয়। একটি অবস্থা হচ্ছে, শয়তান ও বিপথে পরিচালনাকারী মানুষ, যাদেরকে এ উপমায় শিকারী পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারা, যাদেরকে বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো গভীর খাদে নিক্ষেপ করে।

মূলে "সহীক" শব্দ বলা হয়েছে এটি 'সাহক' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। "সাহক"-এর আসল মানে হচ্ছে পিষ্ট করা। কোনো জায়গাকে এমন অবস্থায় "সাহীক" বলা হয় যখন তা

www.banglabookpdf.blogspot.com



ذٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

*এ হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে নাও), আর যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত রীতিনীতির[৬০] প্রতি সম্মান দেখায়, তার সে কাজ তার অন্তরের আল্লাহভীতির পরিচায়ক।[৬১]*

*একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ঐ সমস্ত (কুরবানীর পশু) থেকে উপকারলাভের অধিকার আছে।[৬২] তারপর ওগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা এ প্রাচীন ঘরের নিকটেই।[৬৩]*

এতবেশী গভীর হয় যে, তার মধ্যে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা টুকরো টুকরো বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে চিন্তা ও নৈতিক চরিত্রের অধোপতনকে এমন গভীর খাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার মধ্যে পড়ে গিয়ে মানুষের সমস্ত কলকজা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন এটি কোনো কাজ হতে পারে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অথবা কোনো জিনিসও হতে পারে যেমন মসজিদ, কুরবানীর জন্য হাজীদের সংগে নেয়া উট ইত্যাদি। আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৫ টীকা।

৬১. অর্থাৎ এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরি চিহ্ন। তাইতো সে তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করছে। অন্য কথায় যদি কোনো ব্যক্তি জেনে বুঝে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করে তাহলে এটা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। অথবা সে আল্লাহকে স্বীকারই করে না কিংবা স্বীকার করলেও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে।

৬২. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাকে মনের তাকওয়ার আলামত হিসেবে চিহ্নিত করার পর এ বাক্যটি একটি বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে। হাজীদের সাথে আনা কুরবানীর পশুও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত। যেমন আরববাসীরা স্বীকার করতো এবং কুরআন নিজেই পরবর্তী পর্যায়ে বলছে ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ۔

"এবং এ সমস্ত কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত করেছি।"

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখানোর যে হুকুম উপরে দেয়া হয়েছে তার দাবী কি এই যে, কুরবানীর পশুগুলোকে যখন আল্লাহর ঘরের দিকে

www.banglabookpdf.blogspot.com



নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না ? তাদের পিঠে চড়া অথবা পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাদের দুধ পান করা কি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবার বিরোধী নয় ? আরবের লোকেরা একথাই মনে করতো। তারা এ পশুগুলোকে একেবারেই আরোহীশূন্য অবস্থায় সুসজ্জিত করে নিয়ে যেতো। পথে তাদের থেকে কোনো প্রকার লাভবান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিল পাপ। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে, কুরবানীর জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা এ পশুদের থেকে লাভবান হতে পারো। এটা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। একথাটিই এ সম্পর্কিত হযরত আবু হুরারাহ (রা) ও হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে এবং সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। তিনি বললেন, "ওর পিঠে সওয়ার হয়ে যাও" সে বললো, এটা হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া উট। বললেন, "তাতে কি, সওয়ার হয়ে যাও।"

মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ, দ্বাহহাক ও আতা খোরাসানী এ মত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে "একটি নির্দিষ্ট সময়" মানে হচ্ছে "যতক্ষণ" পর্যন্ত পশুকে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত ও কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত না করা হয়।" এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ এ পশুগুলো থেকে কেবলমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত লাভবান হতে পারে যতক্ষণ তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত করে না। যখনই তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু বানিয়ে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার নিয়ত করে তখনই তাদের থেকে আর কোনো প্রকার লাভবান হবার অধিকার তাদের থাকে না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথমত এ অবস্থায় ব্যবহার করার ও লাভবান হবার অনুমতি দেয়াটাই অর্থহীন। কারণ কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য পশুদের থেকে লাভবান হবার বা না হবার ব্যাপারে কবেই বা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে, সুস্পষ্ট অনুমতির মাধ্যমে তা দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয় ? তারপর আয়াত পরিষ্কার বলছে, এমন সব পশু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যাদের ওপর "আল্লাহর নিদর্শন" শব্দ প্রযুক্ত হয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এটি কেবলমাত্র তখনই হতে পারে যখন তাদেরকে কুরবানীর পশু গণ্য করা হবে।

অন্য তাফসীরকারগণ যেমন উরওয়া ইবনে যুবাইর ও আতা ইবনে আবি রিবাহ বলেন, "নির্দিষ্ট সময়" অর্থ হচ্ছে "কুরবানীর সময়।" কুরবানীর পূর্বে এ কুরবানীর পশুগুলো সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, এদের দুধও পান করা যায়, এদের বাচ্চাও গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এদের পশম ও চুল ইত্যাদিও কাটা যেতে পারে। ইমাম শাফেঈ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। হানাফীগণ যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটির সমর্থক তবুও সেখানে এতটুকু অবকাশ বের করেছেন যে, প্রয়োজনের শর্তে লাভবান হওয়া জায়েয।

৬৩. যেমন অন্য জায়গায় هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (সূরা মায়েদাহ ৯৫ আয়াত) এর অর্থ এই নয় যে, কাবাঘরে বা মসজিদে হারামে কুরবানী করতে হবে বরং সেখানে এর অর্থ হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। কুরআন যে কাবা, বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারাম শব্দ উচ্চারণ করে এ থেকে সাধারণত শুধুমাত্র কাবার ইমারত নয় বরং মক্কার হারাম অর্থ গ্রহণ করে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿۳۴﴾ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

*৫ রুকূ'*

*প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[৬৪] (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে,[৬৫] যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যাকিছু রিযিক তাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[৬৬]*

৬৪. এ আযাত থেকে দু'টি কথা জানা গেছে। এক, কুরবানী ছিল আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শরীয়াতের ইবাদাত ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বিশেষ। মানুষ যেসব পদ্ধতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করেছে সেগুলো সবাই গায়রুল্লাহর জন্য নিষিদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে দেয়াই হচ্ছে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদের অন্যতম মৌলিক দাবী। যেমন, মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে রুকূ' ও সিজদা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত একে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে আর্থিক নযরানা পেশ করেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকে নিষিদ্ধ করে যাকাত ও সদকা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। মানুষ বাতিল উপাস্যদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত কোনো একটি স্থানকে পবিত্র বা বায়তুল্লাহ গণ্য করে তার যিয়ারত ও তাওয়াফ করার হুকুম দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর নামে রোযা রেখেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকেও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে মানুষ তার নিজের মনগড়া উপাস্যদের জন্য পশু বলি করতে থেকেছে। আল্লাহর শরীয়াত পশু কুরবানীকেও গায়রুল্লাহর জন্য একেবারে হারাম এবং আল্লাহর জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছে।

দুই, এ আয়াত থেকে জানা গেছে, আল্লাহর নামে কুরবানী করাই হচ্ছে আসল জিনিস। কুরবানী কখন করা হবে, কোথায় করা হবে, কিভাবে করা হবে—এ নিয়মটির এ বিস্তারিত নিয়মাবলী মোটেই কোনো মৌলিক বিষয় নয়। বিভিন্ন যুগের, জাতির ও দেশের

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

*আর কুরবানীর উটকে[৬৭] আমি করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তরভুক্ত ; তোমাদের জন্য রয়েছে তার মধ্যে কল্যাণ।[৬৮] কাজেই তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে[৬৯] তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।[৭০] আর যখন (কুরবানীর পরে) তাদের পিঠ মাটির সাথে লেগে যায়[৭১] তখন তা থেকে নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা পরিতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তাদেরকেও যারা নিজেদের অভাব পেশ করে। এ পশুগুলোকে আমি এভাবেই তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭২]*

নবীদের শরীয়াতে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিস্তারিত বিষয়াবলীতে পার্থক্য ছিল। কিন্তু সবার মূল প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য একই রয়েছে।

৬৫. মূলে مُخْبِتِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে এর অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্থ ঃ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও বিনয়াবনত ভাব অবলম্বন করা। তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া।

৬৬. আল্লাহ কখনো হারাম ও নাপাক সম্পদকে নিজের রিযিক হিসেবে আখ্যায়িত করেননি, এর আগে আমরা একথা বলেছি। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে পাক-পবিত্র রিযিক ও যে হালাল উপার্জন আমি তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা খরচ করে। আবার খরচ করা মানেও সব ধরনের যা-তা খরচ নয় বরং নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করা, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীদেরকে সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। অযথা খরচ, ভোগ বিলাসিতার জন্য খরচ এবং লোক দেখানো খরচকে কুরআন "খরচ" গণ্য করছে না। বরং কুরআনের পরিভাষায় এ খরচকে অমিতব্যয়িতা ও ফজুল খরচ বলা হয়। অনুরূপভাবে কার্পণ্য ও সংকীর্ণমনতা সহকারে যা খরচ করা হয়, তার ফলে মানুষ নিজের পরিবার পরিজনদেরকেও সংকীর্ণতার মধ্যে রাখে এবং নিজেও নিজের মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না আর এই সংগে নিজের সামর্থ অনুযায়ী অন্যদেরকে সাহায্য করতেও পিছপা হয়। এ অবস্থায় মানুষ যদিও কিছু না

www.banglabookpdf.blogspot.com



কিছু খরচ করে কিন্তু কুরআনের ভাষায় এ খরচের নাম "ইনফাক" নয়। কুরআন একে বলে "কৃপণতা" ও মানসিক সংকীর্ণতা।

৬৭. মূলে بُدْن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর বিধানে গরুকেও উটের সাথে শামিল করেছেন। একটি উট কুরবানী করলে যেমন তা সাতজনের জন্য যথেষ্ট, ঠিক তেমনি সাতজন মিলে একটি গরু কুরবানী দিতে পারে। মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তা'তে বলা হয়েছে ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْاَضَاحِى الْبُدْنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।"

৬৮. অর্থাৎ তোমরা তা থেকে ব্যাপক হারে কল্যাণ লাভ করে থাকো। তোমাদের সেগুলো কেন করতে হবে সেদিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয় তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত, শুধুমাত্র নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেবার জন্যও যাতে মানুষ মনে মনে ও কার্যত একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এ সবই তাঁর। ঈমান ও ইসলাম হচ্ছে আত্মত্যাগের নাম। নামায ও রোযা হচ্ছে দেহ ও তার শক্তিসমূহের কুরবানীর নাম। যাকাত হচ্ছে আল্লাহ আমাদের বিভিন্নভাবে যেসব সম্পদ দিয়েছেন সেগুলোর কুরবানী। জিহাদ সময় এবং মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতাসমূহের কুরবানী। আল্লাহর পথে যুদ্ধ প্রাণের কুরবানী। এসব এক এক প্রকার নিয়ামত এবং এক একটি দানের জন্য কৃতজ্ঞতা। এভাবে পশু কুরবানী করার দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আমরা আল্লাহর এ বিরাট নিয়ামতের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেই। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্ট বহু প্রাণীকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তাদের পিঠে চড়ি। তাদের সাহায্যে চাষাবাদ ও মাল পরিবহন করি। তাদের গোশত খাই, দুধ পান করি এবং তাদের চামড়া, লোম, পশম, রক্ত, হাড় ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করি।

৬৯. উল্লেখ করা যেতে পারে, উটকে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হয়। তার একটি পা বেঁধে দেয়া হয় তারপর কণ্ঠনালীতে সজোরে বল্লম মারা হয়। সেখান থেকে রক্তের একটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেলে উট মাটির ওপর পড়ে যায়। 'সওয়াফ' বা দাঁড় করিয়ে রাখা বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, দাহহাক প্রমুখ ব্যাখ্যাতাগণ এর এ ব্যাখ্যায়ই করেছেন। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার উটকে বসিয়ে রেখে কুরবানী করতে দেখেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলেন ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

"পা বেঁধে তাকে দাঁড় করিয়ে দাও। এটা হচ্ছে আবুল কাশেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।"

আবু দাউদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে রেখে বাকি তিন পায়ের ওপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তারপর তার হল্‌কুমে বর্শা নিক্ষেপ করতেন। কুরআন নিজেও এ অর্থের প্রতি ইংগিত করেছে ঃ إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا "যখন তাদের পিঠ জমিতে ঠেকে যায়" একথা এমন অবস্থায় বলা হয় যখন পশু দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারপর জমির ওপর পড়ে যায়। অন্যথায় শুইয়ে দিয়ে কুরবানী করা অবস্থায় পিঠ তো আগে থেকেই জমির সাথে লেগে থাকে।

৭০. এ বাক্যটি আবার একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করলে কোনো পশু হালাল হয় না। তাই আল্লাহ "তাদেরকে যবেহ করো" না বলে বলছেন, "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও" এবং এর অর্থ হচ্ছে, পশু যবেহ করো। এ থেকে একথা আপনা আপনিই বের হয়ে আসে যে, ইসলামী শরীয়াতে আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু যবেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার পদ্ধতি এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।" আর ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ "যাতে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।"

হাদীসে কুরবানী করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন (১) بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।" (২) اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ـ

(৩) "আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা এমন সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। অবশ্যই আমার নামায ও কুরবানী এবং আমার বাঁচা ও মরা সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

*তাদের গোশতও আল্লাহর কাছে পৌছে না, তাদের রক্তও না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছে যায় তোমাদের তাকওয়া।[৭৩] তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর দেয়া পথনির্দেশনার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।[৭৪] আর হে নবী! সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।*

*নিশ্চয়ই[৭৫] আল্লাহ ঈমানদারদের সংরক্ষণ করেন,[৭৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে পসন্দ করেন না।[৭৭]*

৭১. লেগে যাওয়ার মানে শুধু এতটুক নয় যে, তারা মাটিতে পড়ে যায় বরং এ অর্থও এর অন্তরভুক্ত যে, তারা পড়ে গিয়ে স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ তড়পানো বন্ধ করে দেয় এবং প্রাণবায়ু পুরোপুরি বের হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যে,

مَا قُطِعَ (اَوْ مَا بَانَ) مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

"এখনো জীবিত আছে এমন পশুর যে গোশত কেটে নেয়া হয় তা মৃত পশুর গোশত (এবং হারাম)।"

৭২. কুরবানীর হুকুম কেন দেয়া হয়েছে, এখানে আবার সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন এ কুরবানী হচ্ছে সে বিরাট নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৭৩. জাহেলিয়াতের যুগে যেমন আরববাসীরা দেবদেবীর মূর্তিদের জন্য যেসব পশু কুরবানী দিতো সেগুলো নিয়ে গিয়ে আবার তাদেরই বেদীমূলে অর্ঘ দিতো, ঠিক তেমনি আল্লাহর নামে কুরবানী দেয়া জানোয়ারের গোশত কাবাঘরের সামনে এনে রাখতো এবং রক্ত তার দেয়ালে লেপটে দিতো। তাদের মতে, এ কুরবানী যেন আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট কুরবানীর গোশত ও রক্ত পেশ করার জন্য করা হতো। এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর সামনে যে আসল জিনিস পেশ করা হয় তা পশুর গোশত ও রক্ত নয় বরং তোমাদের তাকওয়া।" যদি তোমরা নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খালেস নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য কুরবানী করো,

www.banglabookpdf.blogspot.com



তাহলে এ প্রবণতা, নিয়ত ও আন্তরিকতার নযরানা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে অন্যথায় রক্ত ও গোশত এখানেই থেকে যাবে। একথাই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَلْوَانِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ـ

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও তোমাদের রঙ দেখেন না বরং তিনি দেখেন তোমাদের মন ও কার্যকলাপ।"

৭৪. অর্থাৎ অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে তার প্রকাশ ঘটাও ও ঘোষণা দাও। এরপর কুরবানীর হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পশুদের ওপর আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, শুধুমাত্র এ নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কুরবানী ওয়াজিব করা হয়নি। বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এগুলো যাঁর পশু এবং যিনি এগুলোর ওপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন, আমরা অন্তরে ও কাজে-কর্মেও তাঁর মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি দেবো, যাতে আমরা কখনো ভুল করে একথা মনে করে না বসি যে, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের সম্পদ। কুরবানী করার সময় যে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রকাশ ঘটে। যেমন সেখানে বলা হয় اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ হে আল্লাহ ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য উপস্থিত।

এ ক্ষেত্রে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, এ প্যারায় কুরবানীর যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র হাজীদের জন্য নয় এবং শুধুমাত্র মক্কায় হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নয় বরং প্রত্যেক সমর্থ মুসলমান যেখানেই সে থাকুক না কেন তার জন্য ব্যাপকভাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে, যাতে সে পশুদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন করতে এবং এই সংগে নিজের স্থানে হাজীদের অবস্থার সাথে শরীক হয়ে যেতেও পারে। হজ্জ সম্পাদন করার সৌভাগ্য না হলেও কমপক্ষে হজ্জের দিনগুলোতে আল্লাহর ঘরের সাথে জড়িত হয়ে হাজীগণ যেসব কাজ করতে থাকেন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা সেসব কাজ করতে থাকবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

এছাড়াও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানের সমগ্র সময়ে নিজেই প্রত্যেক বছর বকরা ঈদের সময় কুরবানী করতেন এবং তাঁরই সুন্নত থেকে মুসলমানদের মধ্যে এ পদ্ধতির প্রচলন হয়। মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

"যে ব্যক্তি সামর্থ রাখার পরও কুরবানী করে না তার আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছে না আসা উচিত।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



এ হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ শুধুমাত্র রেওয়ায়াতটির মারফূ' (অর্থাৎ যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে) অথবা মওকূপ (যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে) হবার ব্যাপারে দ্বিতমত ব্যক্ত করেছেন। (হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মতভেদ হয়নি) তিরমিযীতে ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَقَامَ رَسُوْلُ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দশ বছর থাকেন এবং প্রত্যেক বছর কুরবানী করতে থাকেন।"

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো তার আবার কুরবানী করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে কুরবানী করে তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে মুসলমানদের পথ পেয়ে গেছে।"

আর একথা সবার জানা যে, কুরবানীর দিন মক্কায় এমন কোনো নামায হতো না যার পূর্বে কুরবানী করা মুসলমানদের সুন্নাতের বিরোধী হতো এবং পরে করা হতো তার অনুকূল। কাজেই নিশ্চিতরূপেই এ উক্তি হজ্জের সময় মক্কায় নয় বরং মদীনায় করা হয়।

মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বকরা ঈদের নামায পড়ান এবং কোনো কোনো লোক তিনি কুরবানী করে ফেলেছেন মনে করে নিজেদের কুরবানী করে বসে। এ অবস্থা দেখে তিনি হুকুম দেন, যারা আমার পূর্বে কুরবানী করেছে তাদের আবার কুরবানী করতে হবে।

কাজেই একথা সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধে যে, বকরা ঈদের দিন সাধারণ মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় যে কুরবানী করে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত সুন্নাত। তবে এখানে এ কুরবানী ওয়াজিব অথবা শুধুমাত্র সুন্নাত নিছক এ বিষয়েই মতবিরোধ দেখা যায়। ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মাদ এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফও একে ওয়াজিব মনে করতেন। কিন্তু ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের সুন্নাত। সুফিয়ান সাওরীও বলতেন, কেউ কুরবানী না দিলে কোনো ক্ষতি নেই। তবুও উম্মতে মুসলিমার কোনো একজন আলেমও একথা বলেন না যে, মুসলমানরা একমত হয়ে যদি তা পরিহার করে তবুও কোনো ক্ষতি নেই। এ নতুন কথা

www.banglabookpdf.blogspot.com



শুধুমাত্র আমাদের যুগের কোনো কোনো লোকের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন যাদের জন্য নিজের প্রবৃত্তিই কুরআন এবং প্রবৃত্তিই সুন্নাত।

৭৫. এখান থেকে অন্য একটি বিষয়বস্তুর দিকে ভাষণটির মোড় ফিরে গেছে। প্রাসংগিক বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য একথা স্মরণ করা দরকার যে, এটি এমন এক সময়ের ভাষণ যখন হিজরতের পর প্রথমবার হজ্জের মওসুম এসেছিল। সে সময় একদিকে মুহাজির ও মদীনার আনসারদের কাছে এ বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিল যে, তাদেরকে হজ্জের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং হারম শরীফের যিয়ারতের পথ জোরপূর্বক তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মক্কায় মুসলমানদের ওপর যেসব জুলুম করা হয়েছিল শুধুমাত্র সেগুলোর আঘাতই তাদের মনে দগদগ করছিল তাই নয় বরং এ ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত শোকাহত ছিল যে, ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে এরপর এখন মদীনাতেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে বাস করতে দেয়া হচ্ছে না। এ সময় যে ভাষণ দেয়া হয় তার প্রথম অংশে কাবাগৃহ নির্মাণ, হজ্জ পালন ও কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একথা বলা হয় যে, এসব বিষয়ের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং জাহেলীয়াত এগুলোকে বিকৃত করে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নিয়ে নয় বরং সংস্কারের সংকল্প নিয়ে এ অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এগিয়ে আসার প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া এ সংগে মদীনায় কুরবানীর পদ্ধতি জারি করে মুসলমানদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয় যে, হজ্জের সময় নিজ নিজ গৃহেই কুরবানী করে শত্রুরা তাদেরকে যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে তাতে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আবার হজ্জ থেকে আলাদাভাবে কুরবানীকে একটি স্বতন্ত্র সুন্নাত হিসেবে জারী করে। এর ফলে যারা হজ্জ করার সুযোগ পাবে না তারাও আল্লাহর এ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার হক আদায় করতে পারবে। এরপর এখন দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদেরকে তাদের ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল এবং যে জুলুমের ধারা অব্যাহত ছিল তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

৭৬. মূলে مدافعت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উৎপত্তি হয়েছে دفع থেকে। এ শব্দটির আসল মানে হচ্ছে, কোনো জিনিসকে হটিয়ে দেয়া ও সরিয়ে দেয়া। কিন্তু যখন "দফা" করার পরিবর্তে "মুদাফা'আত" করার কথা বলা হবে তখন এর মধ্যে আরো দুটি অর্থ শামিল হয়ে যাবে। এক, কোনো শত্রুশক্তি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করছে। দুই, এ মোকাবিলা শুধুমাত্র একবারেই শেষ হয়ে যায়নি বরং যখনই আক্রমণকারী আক্রমণ করে তখনই এ প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করে। এ দুটি অর্থ সামনে রেখে বিচার করলে মু'মিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহর "মুদাফা'আত" করার অর্থ এই বুঝা যায় যে, কুফর ও ঈমানের সংঘাতে মুমিনরা একা ও নিসংগ হয় না বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে এক পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অনিষ্টকারকদের অনিষ্টকে তাদের থেকে দূরে সারিয়ে দিতে থাকেন। কাজেই এ আয়াতটি আসলে হকপন্থীদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো জিনিস হতে পারে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com



أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

৬ রুকূ’

*অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম[৭৮] এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।[৭৯] তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে[৮০] শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।"[৮১] যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদাতখানা[৮২] ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো।[৮৩] আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে।[৮৪] আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে।[৮৫] আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।[৮৬]*

৭৭. এ সংঘাতে আল্লাহ কেন হকপন্থীদের সাথে একটি পক্ষ হন এটি হচ্ছে তার কারণ। এর কারণ হচ্ছে, হকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত দ্বিতীয় পক্ষটি বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী। আল্লাহ তার কাছে যেসব আমানত সোপর্দ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে সে খেয়ানত করেছে এবং তাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও নেমকহারামির মাধ্যমে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়ে চলছে। কাজেই আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হক-পন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



৭৮. যেমন ইতোপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরে সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ـ (ايت : ١٩٠)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ ـ (ايت : ١٩١)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ (ايت : ١٩٣)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ـ (ايت : ٢١٦)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ (ايت : ٢٤٤)

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরীর প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে।

৭৯. অর্থাৎ এরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এ সত্ত্বেও আল্লাহ এদেরকে আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন এ অস্ত্রধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছিল তখন মুসলমানদের সমস্ত শক্তি কেবলমাত্র মদীনার একটি মামুলি ছোট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় মুহাজির ও আনসারদের মিলিত শক্তি সর্বসাকুল্যে এক হাজারও ছিল না। এ অবস্থায় কুরাইশদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল। আর কুরাইশরা একা ছিল না বরং আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রগুলোও তাদের পেছনে ছিল। পরে ইহুদীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এসময় "আল্লাহ অবশ্য তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে" একথা বলা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এর ফলে এমনসব মুসলমানদের মনেও সাহসের সঞ্চার হয়েছে যাদেরকে সমগ্র আরব শক্তির বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে মোকাবিলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং কাফেরদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে যে, তোমাদের মোকাবিলা আসলে আল্লাহর সাথে, ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সাথে নয়। কাজেই যদি আল্লাহর মোকাবিলা করার সাহস থাকে তাহলে সামনে এসো।

৮০. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা হজ্জের এ অংশটি অবশ্যই হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

৮১. এদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা সামনে রাখতে হবে ঃ

হযরত সোহাইব রুমী (রা) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো।

www.banglabookpdf.blogspot.com



যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরনের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ (রা) নিজেদের দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়েন, বনী মুগীরাহ (উম্মে সালামাহর পরিবারের লোকেরা) তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা আবু সালামাহকে বলে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো না। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে যান। এরপর বনী আবদুল আসাদ (আবু সালামাহর বংশের লোকেরা) এগিয়ে আসে এবং তারা বলে, শিশুটি আমাদের গোত্রের, তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও, এভাবে মা ও বাপ উভয়ের কাছ থেকে শিশু সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়। প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত উম্মে সালামাহ (রা) স্বামী ও সন্তানের শোকে ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বড়ই কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে নিজের শিশু সন্তানটি পুনরুদ্ধার করে মক্কা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন যে, একজন নিসংগ স্ত্রীলোক কোলে একটি ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে উটের পিঠে বসে আছেন। এমন পথ দিয়ে তিনি চলছেন যেখান দিয়ে সশস্ত্র কাফেলা যেতে ভয় পেতো।

আইয়াশ ইবনে রাবীআহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। হযরত উমরের (রা) সাথে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে যান। পিছে পিছে আবু জেহেল নিজের এক ভাইকে সংগে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। সে মায়ের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, আম্মাজান কসম খেয়েছেন আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। কাজেই তুমি গিয়ে একবার শুধু তাকে চেহারা দেখিয়ে দাও তারপর চলে এসো। তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মাতৃভক্তির আতিশয্যে তাদের সংগ নেন। পথে দুই ভাই মিলে তাকে বন্দী করে এবং তাকে নিয়ে মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বাঁধা ছিল এবং দুই ভাই চিৎকার করে যাচ্ছিল, "হে মক্কাবাসীরা ! নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে এমনিভাবে শায়েস্তা করো যেমন আমরা করেছি।" দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন দু:সাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকে এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও জালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

৮২. মূলে صَوَامِعُ، بِيَعٌ ও صَلَوَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। صومعة এমন জায়গাকে বলা হয় যেখানে খৃষ্টান রাহেব, যোগী, সন্ন্যাসী, সংসার বিরাগী সাধুরা থাকেন। "بيعة" শব্দটি আরবী ভাষায় খৃষ্টানদের ইবাদাতগাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। "صلوات" শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের নামায পড়ার জায়গা। ইহুদীরা নিজেদের ভাষায় একে বলে صلوتا "সলওয়াতা"। এটি আরামীয় ভাষার শব্দ। বিচিত্র নয় যে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



ইংরেজী ভাষার Salute ও Salutation শব্দ এর থেকে বের হয়ে প্রথম ল্যাটিন ও পরে ইংরেজী ভাষায় পৌঁছে গেছে।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ কোনো একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোনো একটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে শুধু দুর্গ, প্রাসাদ এবং রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে দেয়া হতো না বরং ইবাদাতগাহগুলোও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বল হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

"যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।" (২৫১ আয়াত)

৮৪. এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে, বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দীন কায়েম ও মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায় তারা আসলে আল্লাহর সাহায্যকারী। কারণ, এটি আল্লাহর কাজ। এ কাজটি করার জন্য তারা আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৫০ টীকা।

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহকে সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তালাভের অধিকারী লোকদের গুণাবলী হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ায় তাদেরকে রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে নামায কায়েম করবে। তাদের ধন-সম্পদ, বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যয়িত হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এ একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ এবং তার কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্টের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন জিনিসের নাম তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে।

৮৬. অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন সময় কার হাতে সোপর্দ করতে হবে এ ব্যাপারটির সিদ্ধান্ত আল্লাহ নিজেই নেন। অহংকারী বান্দারা এ ভুল ধারণা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের ভাগ্যের ফায়সালা তারা নিজেরাই করে। কিন্তু যে শক্তি একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল বৃক্ষে এবং একটি বিশাল বৃক্ষকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করে তার মধ্যেই এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, যাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখে লোকেরা মনে করে

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

*হে নবী! যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে,[৮৭] তাহলে ইতিপূর্বে নূহের জাতি, আদ, সামূদ, ইবরাহীমের জাতি, লূতের জাতি ও মাদয়ানবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং মূসার প্রতিও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। এসব সত্য অস্বীকারকারীকে আমি প্রথমে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি।[৮৮] এখন দেখে নাও আমার শাস্তি কেমন ছিল।[৮৯] কত দুষ্কৃতকারী জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উলটে পড়ে আছে, কত কূয়া[৯০] অচল এবং কত প্রাসাদ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।*

এদেরকে নড়াবার সাধ্য কারো নেই, তাদেরকে তিনি এমনিভাবে ভূপাতিত করেন যে, সারা দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষণীয় হয় এবং যাদেরকে দেখে কেউ কোনোদিন ধারণাই করতে পারে না যে, এরাও কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে তাদের মাথা তিনি এমনভাবে উঁচু করে দেন যে, দুনিয়ায় তাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা।

৮৮. অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো জাতিকেও নবীকে অস্বীকার করার সাথে সাথেই পাকড়াও করা হয়নি। বরং প্রত্যেককে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া হয়। তাদেরকে তখনই পাকড়াও করা হয় যখন ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় মক্কার কাফেররা যেন তাদের দুর্ভাগ্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে নবীর সতর্কবাণীগুলোকে নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি মনে না করে। মূলত এভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আল্লাহ তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এ অবকাশের সুযোগ যদি তারা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তাহলে তাদের পরিণামও তাই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের হয়েছে।

৮৯. মূলে نَكِيرِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্তি বা অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে এর পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায় না। এ শব্দের দুটি অর্থ হয়। এক, কোনো ব্যক্তির খারাপ মনোভাব ও মন্দ নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা। দুই, তাকে এমন শাস্তি দেয়া যার

www.banglabookpdf.blogspot.com



أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

*তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি, যার ফলে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয় ও শ্রবণকারী কানের অধিকারী হতো ? আসল ব্যাপার হচ্ছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, যা বুকের মধ্যে আছে।*[৯১]

*তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়ো করছে*[৯২] *আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছের একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়।*[৯৩] *কতই জনপদ ছিল দুরাচার, আমি প্রথমে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি। আর সবাইকে তো ফিরে আমারই কাছে আসতে হবে।*

ফলে তার অবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়, চেহারা এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যেন কেউ দেখে তাকে চিনতে না পারে। এ দুটি অর্থের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, "এখন দেখে নাও, তাদের এ নীতির কারণে যখন আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো তখন আমি তাদের অবস্থা পরিবর্তিত করে দিলাম।"

৯০. আরবে কূয়া ও জনবসতি প্রায় সমার্থক শব্দ। কোনো গোত্রের জনবসতির নাম নিতে হলে বলা হয় ماء بنى فلان অর্থাৎ অমুক গোত্রের কূয়া। একজন আরবের সামনে যখন বলা হবে কূয়াগুলো অকেজো পড়ে আছে তখন সে এর অর্থ এ বুঝবে যে জনবসতিগুলো জনশূণ্য ও পরিত্যক্ত।

৯১. মনে রাখতে হবে, কুরআন বিজ্ঞানের বই নয় বরং সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে। এখানে অযথা এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই যে, বক্ষস্থিত হৃদয় আবার চিন্তা করে কবে থেকে ? সাহিত্যের ভাষায় আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা বরং প্রায় সবরকমের কাজকেই মস্তিষ্ক, বক্ষদেশ ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এমনকি কোনো কথা মনে থাকার ব্যাপারটিও এভাবে বলা হয়, "সেটা তো আমার বুকে সংরক্ষিত আছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

*৭ রুকূ'*

*হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "ওহে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র (খারাপ সময় আসার আগেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৯৪] কাজেই যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।[৯৫] আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।*

*আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল ও নবী পাঠাইনি[৯৬] (যার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি যে) যখন সে তামান্না করেছে।[৯৭] শয়তান তার তামান্নায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।[৯৮] এভাবে শয়তান যাকিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে আল্লাহ তা দূর করে দেন এবং নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন,[৯৯] আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[১০০]*

৯২. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জ করছে। তারা বলছে যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর সত্য নবীকে অস্বীকার করার ফলে যে আযাব আসা উচিত এবং যার ব্যাপারে তুমি বারবার হুমকি দিয়েছো তা আসছে না কেন ?

৯৩. অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের সময় নির্ধারক ও পঞ্জিকার হিসেব অনুযায়ী হয় না। যেমন আজকে একটি ভুল বা সঠিক নীতি অবলম্বন করা হলো এবং কালই তার মন্দ বা ভালো ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেলো, এমন নয়। কোনো জাতিকে বলা হয়, অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফল দাঁড়াবে তোমাদের ধ্বংস। এর জবাবে তারা যদি এ যুক্তি পেশ করে যে, এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমাদের দশ বিশ-পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনো তো আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাহলে

www.banglabookpdf.blogspot.com



لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢبَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

*(তিনি এজন্য এমনটি হতে দেন) যাতে শয়তানের নিক্ষিপ্ত অনিষ্টকে পরীক্ষায় পরিণত করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে এবং যাদের হৃদয়বৃত্তি মিথ্যা-কলুষিত—আসলে এ যালেমরা শত্রুতায় অনেক দূরে পৌঁছে গেছে—এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জেনে নেয় যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে ; যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।*[১০১]

তারা হবে বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফলাফলের জন্য দিন, মাস ও বছর তো সামান্য ব্যাপার, শতাব্দীও কোনো বিরাট ব্যাপার নয়।

৯৪. আমি তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক নই বরং একজন সতর্ককারী মাত্র। সর্বনাশ ঘটার আগে তোমাদের সতর্ক করে দেয়াই আমার কাজ এর বেশী কোনো দায়িত্ব আমার ওপর নেই। পরবর্তী ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে কতদিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন এবং কবে কোন অবস্থায় শাস্তি দেবেন।

৯৫. "মাগফেরাত" বলতে বুঝানো হয়েছে অপরাধ, পাপ, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে চলা। আর "সম্মানজনক জীবিকা"র দু'টি অর্থ হয়। প্রথমত উত্তম জীবিকা দেয়া এবং দ্বিতীয়ত মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে জীবিকা দেয়া।

৯৬. রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা সূরা মারয়ামের ৩০ টীকায় আলোচিত হয়েছে।

৯৭. মূল শব্দটি হচ্ছে, تَمَنّٰى (তামান্না)। আরবী ভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের আশা-আকাংখা করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তেলাওয়াত অর্থাৎ কিছু পাঠ করা।

৯৮. "তামান্না" শব্দটি যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, শয়তান ও তার আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করলে এর অর্থ

www.banglabookpdf.blogspot.com



হবে, যখনই তিনি লোকদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছেন তখনই শয়তান সে সম্পর্কে লোকদের মনে নানা সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে, সেগুলোর অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ তাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং একমাত্র সঠিক অর্থটি ছাড়া বাকি সব ধরনের উল্টা-পাল্টা অর্থ লোকদেরকে বুঝিয়েছে।

৯৯. প্রথম অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে এই যে, আল্লাহ শয়তানের বিঘ্ন সৃষ্টি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নবীর তামান্না তথা আশা-আকাংখা (আর নবীর আশা-আকাংখা এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী এবং মিশন বাস্তবায়িত হবে) পূর্ণ করেন এবং নিজের আয়াতকে (অর্থাৎ নবীর সাথে তিনি যেসব অংগীকার করেছিলেন) পাকাপোক্ত ও মজবুত অংগীকারে পরিণত করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে, শয়তানের ঢুকানো সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি আল্লাহ দূর করে দেন এবং এক একটি আয়াত সম্পর্কে সে লোকদের মনে যেসব জটিলতা সৃষ্টি করে পরবর্তী কোনো অধিকতর সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়া হয়।

১০০. অর্থাৎ তিনি জানেন শয়তান কোথায় কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার কি প্রভাব পড়েছে. তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শয়তানী ফিতনার প্রতিবিধান করে।

১০১. অর্থাৎ শয়তানের ফিতনাবাজীকে আল্লাহ লোকদের জন্য পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসলকে আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করেছেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এসব জিনিস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের জন্য ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়. অন্যদিকে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী লোকেরা এসব কথা থেকে নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হবার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এগুলো শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ। এ জিনিসটি তাদেরকে একদম নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এটি নির্ঘাত কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত, নয়তো শয়তান এতে এতো বেশী অস্থির হয়ে পড়তো না।

বক্তব্য পরম্পরা সামনে রাখলে এ আয়াতগুলোর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এ সময় যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে বাহ্যজ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করছিল তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ দর্শকরা এটাই দেখছিল যে, এক ব্যক্তির বিপুল আকাংখা ছিল। তিনি আশা করছিলেন তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তের বছর ধরে নাউযুবিল্লাহ অনেক মাথা খোঁড়ার পর তিনি শেষমেষ নিজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সংগী সাথী নিয়ে প্রিয় স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলেন. এ অবস্থায় লোকেরা যখন তাঁর এ বক্তব্য দেখতো যেখানে তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর নবী এবং তিনি আমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করছেন আর এ সংগে কুরআনের এ ঘোষণাবলীও দেখতো, যাতে বলা হয়েছে, নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী জাতি আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয় তখন তাদের কাছে তাঁর ও কুরআনের সত্যতা সংশয়িত হয়ে যেতো। তাঁর বিরোধীরা এর ফলে গায়ে পড়ে নানা কথা বলতো। তারা বলতো, কোথায় গেলো সে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা ? কি হলো সে শাস্তির ভয় দেখাবার ? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হতো তা এখন আসে না কেন ? এর আগের আয়াতগুলোতে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। এবং এরি জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আগের আয়াতগুলোতে জবাবের লক্ষ ছিল

www.banglabookpdf.blogspot.com



কাফেরা এবং এ আয়াতগুলোতে এর লক্ষ হচ্ছে এমন সব লোক যারা কাফেরদের প্রচারণায় প্রভাবিত হচ্ছিল। সমগ্র জবাবের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

"কোনো জাতি কর্তৃক তার নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ব্যাপারটি ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বেও এমনটিই হয়েছে। তারপর এ মিথ্যা আরোপের পরিণামও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আকারে তোমাদের সামনে রয়েছে। শিক্ষা নিতে চাইলে এ থেকে নিতে পারো। তবে মিথ্যা আরোপ এবং নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথেই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা শুরু হয়ে যায়নি কেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যান সংগে সংগেই আযাব নিয়ে আসে একথা কবে বলা হয়েছিল ? আর আযাব নিয়ে আসা নবীর নিজের কাজ এ কথাইবা তিনি কবে বলেছিলেন ? এর ফায়সালা তো আল্লাহ নিজেই করেন এবং তিনি তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। ইতিপূর্বেও তিনি আযাব নাযিল করার আগে জাতিগুলোকে অবকাশ দিয়ে এসেছেন এবং এখনো দিচ্ছেন। এ অবকাশকাল যদি শত শত বছর পর্যন্তও দীর্ঘ হয় তাহলে এ থেকে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আযাব নাযিলের হুমকি দেয়া হয়েছিল তা অন্তরসারশূন্য প্রমাণিত হয় না।

তারপর নবীর আশা-আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ-সংশয়-আপত্তির প্রবল ঝড় সৃষ্টি হওয়াও কোনো নতুন কথা নয়। পূর্বে সকল নবীর দাওয়াতের মোকাবিলায় এসব কিছুই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ এসব শয়তানী ফিতনার মূলোচ্ছেদ করেছেন। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সত্যের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েছে। সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয়ের বিঘ্ন দূরীভূত হয়েছে। শয়তান ও তার সাংগ পাংগরা এসব কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর আয়াতকে মর্যাদাহীন করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকেই মানুষের মধ্যে আসল ও নকলের পার্থক্য করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। এ পথেই আসল ও নির্ভেজাল মানুষেরা সত্যের দাওয়াতের দিকে এগিয়ে আসে এবং ভেজাল ও মেকী লোকেরা ছাটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায়।"

পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে এ হচ্ছে এ আয়াতগুলোর পরিষ্কার ও সহজ সরল অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি রেওয়ায়াত এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যার ফলে কেবল এদের অর্থেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেনি বরং সমগ্র দীনের বুনিয়াদই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এখানে আমি এর আলোচনা এজন্য করছি যে, কুরআনের জ্ঞানানুশীলনকারীকে অবশ্যই কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে রেওয়ায়াতের সাহায্য গ্রহণ করার সঠিক ও বেঠিক পদ্ধতিগুলোর পার্থক্য ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং তাদের জানতে হবে রেওয়ায়াতের প্রতি মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অবৈধ বাড়াবাড়ির ফল কি হয় এবং কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী রেওয়ায়াত যাচাই করার সঠিক পদ্ধতি কি।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আকাংখা জাগে, আহা, যদি কুরআনে এমন কোনো আয়াত নাযিল হতো যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ঘৃণা দূর হয়ে যেতো এবং তারা কিছুটা

www.banglabookpdf.blogspot.com



কাছাকাছি এসে যেতো অথবা কমপক্ষে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন কড়া সমালোচনা না হতো যা তাদেরকে উত্তেজিত করে, এ আকাংখা তাঁর মনের মধ্যেই ছিল এমন সময় একদিন কুরাইশদের একটি বড় মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর সূরা নজম নাযিল হয় এবং তিনি তা পড়তে শুরু করেন। যখন তিনি أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى আয়াতে পৌঁছেন তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে নাকি বের হয়ে যায় : تِلْكَ الْغَرَانِقَةُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى এরা সব মহিয়সী দেবী, এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। এরপর তিনি সামনের দিকে সূরা নজমের আয়াতগুলো পড়ে যেতে থাকেন এমনকি সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুশরিক মুসলিম নির্বিশেষে সবাই সিজদা করে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতে থাকে, এখন আর মুহাম্মাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরাও তো একথাই বলতাম, আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা আর আমাদের এ দেবদেবীরা তাঁর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। সন্ধ্যায় জিব্রীল আসেন। তিনি বলেন, এ আপনি কি করলেন? এ দু'টি বাক্য তো আমি নিয়ে আসিনি। এতে তিনি বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন তখন মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন :

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ...... ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

এ বিষয়টি সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে রাখে। শেষে সূরা হজ্জের এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, তোমার পূর্বেও নবীদের সাথে এমনিতর ঘটনা ঘটতে থেকেছে। ওদিকে কুরআন শুনে কুরাইশের লোকেরাও নবীর সাথে সিজদা করেছে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কাছেও এভাবে পৌঁছে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার কাফেরদের সমঝোতা হয়ে গেছে তাই বহু মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে এসে তারা জানতে পারেন সমঝোতা ও সন্ধির খবরটি ভুল ছিল, ইসলাম ও কুফরের শত্রুতা আগের মতই অপরিবর্তিত আছে

এ ঘটনাটি ইবনে জারীর ও অন্যান্য বহু তাফসীরকার নিজেদের তাফসীর গ্রন্থে, ইবনে সা'দ তাবকাতে আল ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযুলে, মূসা ইবনে উকবাহ মাগাযীতে-ইবনে ইসহাক সীরাতে এবং ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, বাযযার, ইবনে মারদুইয়া ও তাবারানী নিজেদের হাদীস সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন। যেসব বর্ণনা পরম্পরায় এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুল আলীয়াহ, সা'ঈদ ইবনে জুবাইর, দ্বাহহাক, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে শিহাব, যুহরী ও ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য ইবনে আব্বাস ছাড়া এঁদের মধ্যে আর একজনও সাহাবী নেই। ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য ছোট-খাটো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য বাদ দিলেও দু'টি বড় বড় বিরোধ দেখা যায়। একটি হচ্ছে, মূর্তির

www.banglabookpdf.blogspot.com



প্রশংসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব শব্দ বেরিয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রায় প্রত্যেক বর্ণনায় অন্য বর্ণনা থেকে আলাদা। আমি এগুলো একত্র করার চেষ্টা করেছি। ফলে পনেরটি ইবারতে আলাদা আলাদা শব্দ পেয়েছি। দ্বিতীয় বড় বিরোধটি হচ্ছে, কোন্ বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ শব্দগুলো অহীর মাঝখানে শয়তান তাঁর মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং তিনি মনে করেন এও বুঝি জিব্রীল এনেছেন। কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ শব্দগুলো নিজের পূর্বের বাসনার প্রভাবে ভুলক্রমে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেছে। কোনোটায় বলা হয়েছে, সে সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এ অবস্থায় এ শব্দগুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। কারোর বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলেন এবং অস্বীকারমূলক জিজ্ঞাসা হিসেবেই বলেন। কারো বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাঁর আওয়াজের সাথে আওয়াজ মিলিয়ে এ শব্দগুলো বলে দেয় এবং মনে করা হয় তিনি এগুলো বলেছেন। আবার কারো মতে মুশরিকদের মধ্যে থেকে কেউ একথা বলে।

ইবনে কাসীর, বাইহাকী, কাযী আইয়ায, ইবনে খুযাইমা, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম রাযী, করতুবী, বদরুদ্দীন আইনী, শাওকানী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ মহোদয়গণ এ ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা গণ্য করেন। ইবনে কাসীর বলেন, "যতগুলো সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই মুরসাল[১] ও মুনকাতে[২]। কোনো সহীহ মুত্তাসিল[৩] সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি আমি পাইনি।" বাইহাকী বলেন, "হাদীস বিচারের যথার্থ পদ্ধতিতে এ ঘটনাটি প্রমাণিত নয়।" ইবনে খুযাইমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাতে তিনি বলেন, "এটি যিনদিকদের (যরোথুস্ত্রীয়পন্থী নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী) তৈরি করা।" কাযী আইয়ায বলেন, "এর দুর্বলতা এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, সিহাহে সিত্তার[৪] লেখকদের একজনও নিজের গ্রন্থে একে স্থান দেননি এবং কোনো সহীহ মুত্তাসিল ত্রুটিমুক্ত সনদ সহকারে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমেও এটি উদ্ধৃত হয়নি।" ইমাম রাযী, কাযী আবু বকর ও আলূসী এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে শক্তিশালী যুক্তির ভিত্তিতে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু অন্যদিকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতো উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস, আবু বকর জাস্সাসের ন্যায় খ্যাতিমান ফকীহ, যামাখশারীর মতো যুক্তিবাদী মুফাসসির এবং ইবনে জারীরের ন্যায় তাফসীর, ইতিহাস ও ফিকাহর ইমাম একে সহীহ বলে স্বীকার করেন এবং একেই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা গণ্য করেন। ইবনে হাজারের মুহাদ্দিস সুলভ যুক্তি হচ্ছে ঃ

১. মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের শেষের দিকে তাবেঈর পরে কোনো রাবী নেই এবং তাবেঈ নিজেই বলেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন।"

২. মুনকাতে ঃ যে হাদীসের কোনো স্তরে এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

৩. মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের কোনো স্তরে কোনো রাবী বাদ পড়েনি এবং সকল রাবীর নাম যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

৪. সিহাহে সিত্তা ঃ ছয়টি সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ যেমন, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

www.banglabookpdf.blogspot.com



"সাঈদ ইবনে জুবাইরের মাধ্যম ছাড়া বাকি অন্যান্য যেসব মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা হয় যঈফ[৫] আর নয়তো মুনকাতে।" কিন্তু মাধ্যমের সংখ্যাধিক্য একথা প্রকাশ করে যে, এর নিশ্চয়ই কোন মূল আছে। এছাড়াও এটি একটি মাধ্যমে মুত্তাসিল পদ্ধতিতে সহীহ সনদ সহকারেও বর্ণিত হয়েছে। বাযযার এটি উদ্ধৃত করেছেন। (এখানে ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ-উমাইয়াহ ইবনে খালেদ থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটির কথা বলা হয়েছে) অন্য দুটি মাধ্যমে যদিও মুরসাল বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর রাবীগণ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী পূর্ণ গুণ সম্পন্ন। তাবারী এ দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একটি উদ্ধৃত হয়েছে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে এবং অন্যটি মুতামির ইবনে সুলাইমান ও হাম্মাদ ইবনে সালামাহ কর্তৃক দাউদ ইবনে আবী হিন্দ থেকে এবং তিনি আবীল আলীয়াহ থেকে।"

সমর্থকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা তো এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরাও সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে সমালোচনার হক আদায় করেননি। একটি দল একে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাদের দৃষ্টিতে এর সনদ শক্তিশালী নয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, যদি সনদ শক্তিশালী হতো তাহলে তারা এ কাহিনীটি মেনে নিতেন। দ্বিতীয় দলটি একে এজন্য প্রত্যাখ্যান করেন যে, এর ফলে সমগ্র দীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় এবং দীনের প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় যে, নাজানি আরো কোথায় কোথায় শয়তানী কুমন্ত্রণা ও মিশ্রণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি তো কেবল এমনসব লোককে নিশ্চিত করতে পারে যারা আগে থেকে দৃঢ় ও পরিপক্ক ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু যারা প্রথম থেকেই সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন অথবা যারা এখন গবেষণা-অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঈমান আনা বা না আনার ফায়সালা করতে চান তাদের মনে তো যেসব জিনিসের কারণে এ দীন সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় সেগুলো প্রত্যাখ্যান করার অনুভূতি জাগতে পারে না। বরং তারা বলবেন, যখন কমপক্ষে একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং বহু তাবেঈ, তাবে'তাবেঈ ও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে একটি ঘটনার প্রমাণ হচ্ছে তখন তাকে শুধুমাত্র এজন্যই বা কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে যে, এর ফলে আপনার দীন সংশয়পূর্ণ হয়ে যায় ? এর পরিবর্তে আপনার দীনকেই বা সংশয়পূর্ণ মনে করা হবে না কেন যখন এ ঘটনাটি তাকে সংশয়পূর্ণ বলে প্রমাণ করছে।

এখন সমালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ের সঠিক পদ্ধতি চিহ্নিত করা দরকার, যার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে এর সনদ যতই শক্তিশালী বা দুর্বল হোক না কেন একে অগ্রহণযোগ্য গণ্য করা যেতে পারে।

---

৫. যঈফ ঃ যে হাদীসের রাবীর মধ্যে 'আদালত' ও 'যবৃত' গুণ যে কোনো পর্যায়েই থাকে না। আদালত মানে হচ্ছে (১) তাকওয়া ও পবিত্র গুণ থাকা, (২) মিথ্যা না বলা, (৩) কবীরা গুনাহ না করা (৪) অজ্ঞাতনামা না হওয়া অর্থাৎ দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা সম্ভব হয় না এবং (৫) শরীয়াত বিরোধী আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিদআতীও নয়। অন্যদিকে 'যবৃত' হচ্ছে এমন শক্তি যার সাহায্যে মানুষ শোনা বা লিখিত বিষয়কে ভুলে যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এবং ইচ্ছামতো তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে।—অনুবাদক

www.banglabookpdf.blogspot.com



প্রথম জিনিসটি হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ। এটি তাকে ভুল প্রমাণ করে কাহিনীটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, হাবশায় হিজরাত সম্পন্ন হয়ে যাবার পর ঘটনাটি ঘটে এবং এই ঘটনার খবর শুনে হাবশায় হিজরাতকারীদের একটি দল মক্কায় ফিরে আসে। এবার একটু তারিখের পার্থক্য বিবেচনা করুন।

০—নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায় হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম নববী সালের রজব মাসে। আর হাবশার মুহাজিরদের একটি দল সমঝোতার ভুল খবর শুনে তিন মাস পরে (অর্থাৎ একই বছর প্রায় শওয়াল মাসে) মক্কায় ফিরে আসে। এ থেকে জানা যায়, এটি নির্ঘাত পঞ্চম নববী সনের ঘটনা।

০—সূরা বনী ইসরাঈলের একটি আয়াতের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈল মি'রাজের পরে নাযিল হয়। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, ১১ বা ১২ নববী সালে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের পাঁচ ছয় বছর পর আল্লাহ তাঁর অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

০—আর পূর্বাপর বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি ১ হিজরী সনে নাযিল হয়। অর্থাৎ ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশের পরও যখন আরো দুই আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন ঘোষণা করা হয়, এ মিশ্রণ তো শয়তানী কুমন্ত্রণার মাধ্যমে ঘটে গিয়েছিল। আল্লাহ একে রহিত করে দিয়েছেন।

কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কি একথা মেনে নিতে পারে যে, মিশ্রণের কাজটি হলো আজ, তার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো ৬ বছর পর এবং মিশ্রণটি রহিত করার ঘোষণা হলো ৯ বছর পর ?

তারপর এ ঘটনায় বলা হয়েছে, এ মিশ্রণটি হয়েছিল সূরা নজমে এবং এভাবে হয়েছিল যে, শুরু থেকে নবী (স) আসল সূরার শব্দাবলী পাঠ করে আসছিল। হঠাৎ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ। বাক্যাংশে পৌঁছে তিনি নিজেই বা শয়তানী প্ররোচনায় এ বাক্য মিশিয়ে দিলেন এবং তারপর সামনের দিকে আবার সূরা নজমের আসল আয়াত পড়তে থাকলেন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মক্কার কাফেররা এটা শুনে খুশী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, এখন আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে বিরোধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সূরা নজমের বক্তব্য পরম্পরায় এ প্রক্ষিপ্ত বাক্যটি সংযুক্ত করে দেখুন তো কি দাঁড়ায় ঃ

"তারপর তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছো এই লাত, উযযা ও তৃতীয় একটি (দেবী) মানাত সম্পর্কে ? এরা হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাশালিনী দেবী। এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। তোমাদের জন্য হবে পুত্রগণ এবং তার (অর্থাৎ আল্লাহর) জন্য হবে কন্যাগণ ? এতো বড় অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারা। আসলে এগুলো কিছুই নয় তবে কতিপয় নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছে। আল্লাহ এগুলোর জন্য কোনো প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। লোকেরা নিছক অনুমান ও মনগড়া চিন্তার অনুসরণ করে চলছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা এসে গেছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com



দেখুন এ প্রারাগ্রাফটির মধ্যে রেখাচিহ্নিত বাক্যটির বক্তব্য কেমন পরিষ্কার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক কথায় বলে দেয়া হচ্ছে। যথার্থই তোমাদের এ দেবীগুলো উচ্চমর্যাদার অধিকারী, এদের সুপারিশ অবশ্যই আকাংখার বস্তু। অন্য কথায় উল্টা দিকে মুখ করে আবার তাদেরই ওপর আঘাত হানা হচ্ছে এই বলে যে, নির্বোধের দল! তোমরা আল্লাহর জন্য এ মেয়েদেরকে কেমন করে ঠিক করে রাখলে ? ধাপ্পা তো মন্দ নয়, তোমরা নিজেরা তো পেলে পুত্র আর আল্লাহর হিস্‌সায় কন্যা। এসব তোমাদের মনগড়া। এগুলোর সপক্ষে আল্লাহর কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে নেই। এটি একটি স্রেফ পরস্পর বিরোধী ভাষণ—যা কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান মানুষের মুখ থেকে বের হতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য এ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। মেনে নিন, শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে একথা মুখ দিয়ে বের করিয়েছেন। কিন্তু কুরাইশদের সে সমগ্র জনমণ্ডলী যারা একথা শুনছিল তারা কি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল যে, পরবর্তী বাক্যগুলোয় এই প্রশংসাপূর্ণ শব্দগুলোর সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের বার্তা শুনেও তারা একথাই মনে করতে থাকলো যে, তাদের দেবীদেরকে যথার্থই প্রশংসা করা হয়েছে ? সূরা নজমের শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে সে সমগ্র বক্তব্যই এ একটি মাত্র প্রশংসামূলক বাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে , কুরাইশের লোকেরা এগুলো শেষ পর্যন্ত শোনার পর সবাই মিলে একযোগে এ বলে চিৎকার করে বলে থাকবে যে, চলো আজ আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যকার বিরোধ খতম হয়ে গেছে ?

এতো হচ্ছে এ ঘটনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ! এর মাধ্যমে ঘটনাটি যে একেবারেই অর্থহীন ও বাজে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে। এরপর দ্বিতীয় যে জিনিসটি দেখার তা হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে তিনটি আয়াতের নাযিল হওয়ার যে কার্যকারণ বর্ণনা করা হচ্ছে কুরআনের বিন্যাসও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না ? ঘটনায় বলা হচ্ছে, সূরা নাজমে মিশ্রণ করা হয়েছিল। আর সূরা নাজম ৫ নববী সনে নাযিল হয়। এ মিশ্রণের বিরুদ্ধে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। আবার একে রহিত ও ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয় সূরা হজ্জের আলোচ্য আয়াতে। এখন অবশ্য দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটিই হয়ে থাকবে। মিশ্রণের ঘটনা যখন ঘটেছে তখনই ক্রোধ প্রকাশ ও রহিত করার আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে অথবা ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত সূরা বনী ইসরাইলের সাথে এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত সূরা হজ্জের সাথে নাযিল হয়েছে। যদি প্রথম অবস্থাটি হয়ে থাকে। তাহলে বলতে হয় বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। এ আয়াত দু'টি সূরা নাজমে সংযুক্ত করা হলো না বরং ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াতকে ছ'বছর পর্যন্ত এমনিভাবেই রেখে দেয়া হলো এবং সূরা বনী ইসরাঈল যখন নাযিল হলো তখনই তাকে এনে তার সাথে জুড়ে দেয়া হলো। তারপর আবার রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আরো দু–আড়াই বছর পর্যন্ত পড়ে রইলো এবং সূরা হজ্জ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোথাও সংযুক্ত করা হুলো না। কুরআনের বিন্যাস কি এভাবেই হয়েছে, এক সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় সেগুলো বিক্ষিপ্ত আকারে চারদিকে পড়ে থাকে এবং বছরের পর বছর পার হয়ে যাবার পর তাদের কোনটিকে কোন সূরার সাথে এবং কোন্‌টিকে অন্য সূরার সাথে জুড়ে দেয়া হয় ? কিন্তু যদি দ্বিতীয় অবস্থাটি হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত ঘটনার ৬ বছর পর এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আট নয় বছর পর নাযিল হয় তাহলে ইতিপূর্বে আমি যে,

www.banglabookpdf.blogspot.com



অসামঞ্জস্যের কথা বলে এসেছি তা ছাড়াও এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা হজ্জের মধ্যে এ আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সুযোগ কোথায় ?

এখানে এসে যথার্থ সমালোচনার তৃতীয় ধারাটি আমাদের সামনে আসে। অর্থাৎ কোনো আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে কুরআনের পূর্বাপর বক্তব্যও তা গ্রহণ করে কি না তা দেখতে হবে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূ পড়ে দেখুন। তার পূর্বের ও পরের বক্তব্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নিন। এ বক্তব্য পরম্পরায় নবীকে ছ'বছর আগের একটি ঘটনার জন্য শাসিয়ে দেবার সুযোগ কোথায় পাওয়া যায় ? اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ আয়াতে নবীকে কোনো প্রকার শাসানো হচ্ছে কিনা এবং আয়াতের শব্দাবলী কাফেরদের ফিতনায় নবীর জড়িয়ে পড়ার কথা বলছে, না তার প্রতিবাদ করছে—এ প্রশ্ন বাদ দিলেও এভাবে সূরা হজ্জও আপনার সামনে আছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বের বক্তব্যও পড়ুন এবং পরের বক্তব্যও। এ প্রেক্ষাপটে হে নবী ! ৯ বছর পূর্বে কুরআনে মিশ্রণ ঘটাবার যে কাজ তুমি করেছিলে, সে ব্যাপারে ভয় পেয়ো না, ইতিপূর্বেকার নবীদের সাথেও শয়তান এ ব্যবহার করে এসেছে এবং যখনই নবীরা এ ধরনের কাজ করে তখনই আল্লাহ তাকে রহিত করে নিজের আয়াতকে আবার শক্তিশালী ও তরতাজা করে দেন।"—এ ধরনের বক্তব্য কেমন করে এসে গেলো, এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

আমি এর আগেও বার বার বলেছি এবং এখানেও আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কোনো রেওয়ায়াত তার বর্ণনা পরম্পরা যতই সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল হোক না কেন তার 'মতন'[১] যখন তার ভুলের দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করতে থাকে এবং কুরআনের শব্দাবলী, পূর্বাপর বক্তব্য, বিন্যাস, সবকিছুই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে থাকে তখন তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ যুক্তিগুলো একজন সন্দেহবাদী ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানীকে অবশ্য নিশ্চিত করে দেবে। তিনি এ কাহিনীটি পুরোপুরি মিথ্যা বলে মেনে নেবেন। আর কোনো মু'মিন তো একে কখনো সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রকাশ্য দেখছেন এ রেওয়ায়াতটি কুরআনের একটি নয় বহু আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। একজন মুসলমানের পক্ষে একথা মেনে নেয়া বড়ই সহজ যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে। এর তুলনায় তারা কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজেই নিজের মানসিক আকাংখার তাড়নায় কুরআনে একটি শব্দও মেশাতে পারতেন অথবা তাঁর মনে কখনো মুহূর্তকালের জন্যও এ চিন্তা আসতে পারতো যে, তাওহীদের সাথে শিরকের কিছুটা মিশ্রণ ঘটিয়ে কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করা হোক কিংবা আল্লাহর ফরমানসমূহের ব্যাপারে তিনি কখনো এ আকাংখা পোষণ করতে পারতেন যে, আল্লাহ যেন এমন কোনো কথা বলে না বসেন যার ফলে কাফেররা নারাজ হয়ে যায় অথবা তাঁর কাছে এমন কোনো অসংরক্ষিত ও সংশয়পূর্ণ পদ্ধতিতে অহী আসতো যার ফলে জিব্রীলের সাথে সাথে শয়তানও তাঁর কাছে নিজের কোনো শব্দ প্রক্ষেপ করতো এবং তিনি তাকেও জিব্রীলের নিয়ে আসা শব্দ মনে করার ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকতেন। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথাই কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী। আমাদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যেসব আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আছে এগুলো তারও বিরোধী। এমন

১. বর্ণনা পরম্পরা বাদ দিয়ে হাদীসের মূল ভাষ্য।—অনুবাদক

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

*অস্বীকারকারীরা তো তার পক্ষ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ না তাদের ওপর কিয়ামত এসে পড়বে অকস্মাত অথবা নাযিল হয়ে যাবে একটি ভাগ্যাহত[১০২] দিনের শাস্তি। সেদিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হবে তারা যাবে নিয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে আর যারা কুফরী করে থাকবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে থাকবে তাদের জন্য হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।*

ধরনের রেওয়ায়াতের পেছনে দৌড়ানো থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, নিছক সনদের সংযোগ রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা কিংবা বর্ণনাসূত্রের আধিক্য দেখে কোনো মুসলমানকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে এমন কঠিন কথাও স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

এত বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করার সাথে জড়িত থাকতে দেখে মনে যে সন্দেহ জাগে এ প্রসংগে তা দূর করে দেয়া সংগত মনে করি। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে, যদি এ ঘটনাটির মূলে কোনো সত্য না-ই থাকে তাহলে নবী ও কুরআনের বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ হাদীসের এত বিপুল সংখ্যক রাবীদের মাধ্যমে যাদের মধ্যে বড় বড় খ্যাতিমান নির্ভরযোগ্য বুযর্গও রয়েছেন, কেমন করে বিস্তার লাভ করলো ? এর জবাব হচ্ছে, হাদীসের বিপুল সম্পদের মধ্যেই আমরা এর কারণ খুঁজে পাই। বুখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদে আসল ঘটনাটি এভাবে এসেছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজম তেলাওয়াত করেন। সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সিজদা করে। আসল ঘটনা শুধু এতটুকুই ছিল। আর এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। প্রথমত কুরআনের শক্তিশালী বক্তব্য এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী বর্ণনা ভংগী, এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে এর যাদুকরী প্রকাশের পর যদি তা শুনে উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ জিনিসটির জন্যই তো কুরাইশরা বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

*৮ রুকূ'*

*আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে ভালো জীবিকা দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা। তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবেন যা তাদেরকে খুশী করে দেবে, নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল।[১০৩] এতো হচ্ছে তাদের অবস্থা, আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ঠিক যেমন তার সাথে করা হয়েছে তেমনি এবং তারপর তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন,[১০৪] আল্লাহ গোনাহমাফকারী ও ক্ষমাশীল।[১০৫]*

তবে মনে হয়, পরে কুরাইশরা নিজেদের এ সাময়িক ভাবাবেগের জন্য কিছুটা লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অথবা কিছু লোক নিজেদের এ কাজের এ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকবে যে, জনাব আমরা তো মুহাম্মাদের মুখ থেকে নিজেদের মাবুদদের প্রশংসায় কিছু কথা শুনেছিলাম, যে কারণে আমরা তার সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলাম। অন্যদিকে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কাছে এভাবে পৌঁছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। কারণ লোকেরা তাঁকে এবং মুশরিক ও মু'মিনদেরকে একসাথে সিজদা করতে দেখেছিল। এ গুজব এতো বেশী ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রায় ৩৩ জন মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। এক শতাব্দীর মধ্যে এ তিনটি কথা অর্থাৎ কুরাইশদের সিজদা, এ সিজদার এ ব্যাখ্যা এবং হাবশার মুহাজিরদের ফিরে আসা একসাথে মিশে একটি কাহিনীর আকার ধারণ করে এবং অনেক মুত্তাকী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য লোকও এ ঘটনা বর্ণনা করতে থাকেন। মানুষ যাই হোক না কেন মূলত মানুষই। বড় বড় সৎকর্মপরায়ণ ও জ্ঞানবান লোকেরাও অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি করে বসেন এবং তাদের এ ভুল সাধারণ লোকের ভুলের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণকারীরা এদের সঠিক কথার সাথে সাথে ভুল কথাগুলোও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নেয়। আর মন্দ চরিত্রের লোকেরা এদের ভুলগুলো বাছাই করে করে একত্র করে এবং এগুলোকে প্রমাণ হিসেবে

www.banglabookpdf.blogspot.com



ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

*এসব[১০৬] এজন্য যে, আল্লাহই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১০৭] এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[১০৮] এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা।[১০৯] আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান। তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে জমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ?[১১০] আসলে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[১১১] যাকিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে সব তাঁরই। নিসন্দেহে তিনিই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।[১১২]*

পেশ করে বলতে থাকে, এদের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছেছে সবই আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য।

১০২. মূলে আছে عَقِيْمٌ শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "বন্ধ্যা" দিনকে বন্ধ্যা বলার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন যার মধ্যে কোনো রকম কলাকৌশল কার্যকর হয় না। প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রত্যেকটা আশা নিরাশায় পরিণত হয়। দুই, এমন দিন যার পরে রাত দেখা আর ভাগ্যে জোটে না। উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, এমন দিন যেদিন কোনো জাতির ধ্বংসের ফায়সালা হয়ে যায়। যেমন যেদিন নূহের জাতির ওপর তুফান এলো সেদিনটি তাদের জন্য ছিল 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদয়ানবাসী ও অন্যান্য সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির জন্য আল্লাহর আযাব নাযিলের দিনটি বন্ধ্যা দিনই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ "সেদিনের" পরে আর তার "পরের দিন" দেখা যায়নি এবং নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১০৩. মূল শব্দ হচ্ছে عَلِيْمٌ অর্থাৎ তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছে এবং সে কোন ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য। মূলে আরো বলা

www.banglabookpdf.blogspot.com



হয়েছে حَلِيْمٌ অর্থাৎ এ ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।

১০৪. প্রথমে এমন মজলুমদের কথা বলা হয়েছিল যারা জুলুমের জবাবে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আর এখানে এমন মজলুমদের কথা বলা হচ্ছে যারা জুলুমের জবাবে শক্তি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফেঈ এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, জুলুমের কিসাস সেভাবেই নেয়া হবে যেভাবে জুলুম করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি একজনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে এ অবস্থায় তাকেও পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। আবার কোনো ব্যক্তি একজনকে পুড়িয়ে মেরেছে জবাবে তাকেও পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু হানাফীয়াদের মতে হত্যাকারী যেভাবেই হত্যা করুক না কেন তার থেকে একই পরিচিত পদ্ধতিতেই কিসাস গ্রহণ করা হবে।

১০৫. এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দুটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, জুলুমের জবাবে যে রক্তপাত করা হবে আল্লাহর কাছে তা ক্ষমাযোগ্য, যদিও রক্তপাত মূলত ভালো জিনিস নয়। দুই, তোমরা যে আল্লাহর বান্দা তিনি ভুল ত্রুটি মার্জনা করেন ও গোনাহ মাফ করে দেন। তাই তোমাদেরও সামর্থ অনুযায়ী মানুষের ভুলত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা উচিত। মুমিনরা ক্ষমাশীল, উদার হৃদয় ও ধৈর্যশীল, এগুলো তাদের চরিত্রের ভূষণ। প্রতিশোধ নেবার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। কিন্তু নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।

১০৬. এ প্যারাটি সম্পর্কে শুধুমাত্র নিকটবর্তী শেষ বাক্যটির সাথে নয় বরং উপরের পুরো প্যারাটির সাথে রয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও জুলুমের পথ অবলম্বনকারীদের ওপর আযাব নাযিল করা, মুমিন সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়া, সত্যপন্থী, মজলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং শক্তি প্রয়োগ করে জুলুমের মোকাবিলাকারী সত্যপন্থীদের সাহায্য করা, এসবের কারণ কি ? এসবের কারণ হচ্ছে আল্লাহর এই গুণাবলী।

১০৭. অর্থাৎ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার শাসনকর্তা এবং দিন রাত্রির আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এই বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের ওপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে। যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যগগনে কিরণ দিচ্ছে তাদের পতন ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার আজ সত্য ও ন্যায়ের প্রভাতের উদয়ের পথ রোধ করে আছে তা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে।

১০৮. অর্থাৎ তিনি অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন বরং এমন আল্লাহ যিনি দেখতে ও শুনতে পান।

১০৯. অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না। আর অন্যান্য সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন।

www.banglabookpdf.blogspot.com



أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

৯ রুকূ'

*তুমি কি দেখো না, তিনি পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌযানকে নিয়মের অধীন করেছেন যার ফলে তাঁর হুকুমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর পতিত হতে পারে না।[১১৩] আসলে আল্লাহ লোকদের জন্য বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান। তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন ; সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।[১১৪]*

তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

১১০. এখানে আবার প্রকাশ্য অর্থের পেছনে একটি সূক্ষ্য ইশারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ তো হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে এ সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার ছিটেফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখো বিশুষ্ক ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আজ যে অহীর শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগগির তোমাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাবে। তোমরা দেখবে আরবের অনুর্বর বিশুষ্ক মরুভূমি জ্ঞান, নৈতিকতা ও সুসংস্কৃতির গুলবাগীচায় পরিণত হয়ে গেছে।

১১১. মূলে لَطِيفٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, অনুভূত পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণকারী। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। লাখো লাখো শিশু দুনিয়ায় জন্মলাভ করে। কে জানতে পারে, তাদের মধ্যে কে হবে ইবরাহীম যিনি নেতা হবে দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের ? আর কে হবে চেংগীজ, যে বিধ্বস্ত করে দেবে এশিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডকে ? দূরবীন যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন কে ধারণা করতে পেরেছিলে যে, এর ফলে এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত মানুষ পৌঁছে যাবে ? কলম্বাস যখন সফরে বের হচ্ছিল তখন কে জানতো এর মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের

www.banglabookpdf.blogspot.com



*প্রত্যেক[১১৫] উম্মতের জন্য আমি একটি ইবাদাতের পদ্ধতি[১১৬] নির্দিষ্ট করেছি, যা তারা অনুসরণ করে ; কাজেই হে মুহাম্মাদ! এ ব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে ঝগড়া না করে।[১১৭] তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। অবশ্যই তুমি সঠিক সরল পথে আছো।[১১৮] আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে বলে দাও, "যাকিছু তোমরা করছো আল্লাহ তা খুব ভালোই জানেন। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।" তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন ? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।[১১৯]*

ভিত গড়া হচ্ছে ? মোটকথা আল্লাহর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্মতর ও অজ্ঞাত পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় যে, যতক্ষণ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে না যায় ততক্ষণ কিসের জন্য কাজ চলছে তা কেউ জানতেও পারে না।

মূলে আরো বলা হয়েছে خَبِيْرٌ অর্থাৎ তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত। নিজের প্রভুত্বের কাজ কিভাবে করতে হয় তিনি জানেন।

১১২. তিনি "অমুখাপেক্ষী" অর্থাৎ একমাত্র তাঁর সত্তাই কারো মুখাপেক্ষী নয়। আর তিনিই "প্রশংসার্হ" অর্থাৎ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য এবং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক নিজের সত্তার মধ্যে তিনি নিজেই প্রশংসিত।

১১৩. আকাশ বলতে এখানে সমগ্র উর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রত্যেকটি জিনিস নিজ নিজ জায়গায় আটকে আছে।

১১৪. অর্থাৎ এসব কিছু দেখেও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে সত্য পেশ করেছেন তা অস্বীকার করে যেতে থাকে।

১১৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মত।

www.banglabookpdf.blogspot.com



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

*তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করে যাদের জন্য না তিনি কোনো প্রমাণ পত্র অবতীর্ণ করেছেন আর না তারা নিজেরাই তাদের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে।[১২০] এ যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।[১২১] আর যখন তাদেরকে আমার পরিষ্কার আয়াত শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তোমরা দেখো সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে এবং মনে হতে থাকে এ-ই বুঝি যারা তাদেরকে আমার আয়াত শুনায় তাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, "আমি কি তোমাদের বলবো, এর চেয়ে খারাপ জিনিস কি ?[১২২] আগুন। আল্লাহ এরই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন, যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তা বড়ই খারাপ আবাস।"*

১১৬. এখানে 'মানসাক' শব্দটি কুরবানী অর্থে নয় বরং সমগ্র ইবাদাত ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছিল "কুরবানীর নিয়ম" কারণ সেখানে "যাতে লোকেরা ঐ পশুগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন" এ পরবর্তী বাক্যটি তার ব্যাপক অর্থের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কুরবানীকেই চিহ্নিত করছিল। কিন্তু এখানে একে নিছক "কুরবানী" অর্থে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং ইবাদাতকে যদি পূজা অর্চনার পরিবর্তে "বন্দেগীর" ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা মূল উদ্দেশ্যের বেশী নিকটবর্তী হবে। এভাবে শরীয়াত ও মিনহাজের যে অর্থ হয় মান্‌সাকেরও (বন্দেগীর পদ্ধতি) সে একই অর্থ হবে। এটি সূরা মায়েদার বিষয়বস্তুর পুনরাবর্তন হবে, যেখানে বলা হয়েছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি।" (৪৮ আয়াত)

www.banglabookpdf.blogspot.com



১১৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন নিজের যুগের উম্মতের জন্য একটি পদ্ধতি (মান্‌সাক) এনেছিলেন তেমনি এ যুগের উম্মতের জন্যে তুমি একটি পদ্ধতি এনেছো। এখন এ ব্যাপারে তোমার পথে কারোর ঝগড়া করার অধিকার নেই। কারণ এ যুগের জন্য এ পদ্ধতিই সত্য। সূরা জাসীয়ায় এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

"তারপর (বনী ইসরাঈলের নবীদের পরে) হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে দীনের ব্যাপারে একটি শরীয়াতের (পদ্ধতি) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই তার অনুসরণ করো এবং যারা জ্ঞান রাখে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"(১৮ আয়াত)

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শূরা ২০ টীকা)

১১৮. পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মাত্র আমি যে অর্থ বর্ণনা করে এসেছি এ বাক্যটি সে অর্থই পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

১১৯. বর্ণনা পরম্পরার সাথে এ প্যারার সম্পর্ক বুঝতে হলে এ সূরার ৫৫ থেকে ৫৭ আয়াত পর্যন্ত দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে।

১২০. অর্থাৎ আল্লাহর কোনো কিতাবে বলা হয়নি, "আমি অমুক অমুককে আমার সাথে প্রভুত্বের কর্তৃত্বে শরীক করেছি। কাজেই আমার সাথে তোমরা তাদেরকেও ইবাদাতে শরীক করো।" আর কোনো জ্ঞান মাধ্যমেও তারা একথা জানেনি যে, এরা অবশ্যই প্রভুত্বের কর্তৃত্বে অংশীদার এবং এজন্য এরা ইবাদাত লাভের হকদার। এখন এ যেসব বিভিন্ন ধরনের উপাস্য তৈরি করে এদের গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরি করে নেয়া হয়েছে এবং এদের আস্তানায় কপাল ঠেকানো হচ্ছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এদের বেদীতে ভেট ও নযরানা চড়ানো হচ্ছে, আস্তানা প্রদক্ষিণ করা হচ্ছে এবং সেখানে উপাসনার জন্য নির্জনবাস করা হচ্ছে—এসব কিছু জাহেলী ধারণার অনুসরণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

১২১. অর্থাৎ এ নির্বোধরা মনে করছে, এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই, এ উপস্যরাতো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। কারণ তারা তো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।

১২২. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শুনে তোমাদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস অথবা তাঁর আয়াত যারা শুনায় তাদের সাথে যে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তোমরা করতে পারো তার চেয়েও খারাপ জিনিসের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com



১০ রুকূ'

হে লোকেরা! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল।[১২৩] তারা আল্লাহর কদরই বুঝলো না যেমন তা বুঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আসলে আল্লাহ (নিজের ফরমান পাঠাবার জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও।[১২৪] তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে তাও তিনি জানেন[১২৫] এবং যাবতীয় বিষয় তাঁরই দিকে ফিরে আসে।[১২৬]

১২৩. অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী তো দুর্বল হবার কারণেই তার চাইতে উচ্চতর কোনো শক্তির কাছে সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বলতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা একটি মাছির কাছেও হার মানে। এখন তাদের দুর্বলতার অবস্থা চিন্তা করো যারা নিজেরাও দুর্বল এবং যাদের ওপর নির্ভর করে তাদের আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও দুর্বল।

www.banglabookpdf.blogspot.com



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

*হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সিজদা করো, নিজের রবের বন্দেগী করো এবং নেক কাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে।[১২৭] আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়।[১২৮] তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন[১২৯] এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।[১৩০] তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।[১৩১] আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই)[১৩২] যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর।[১৩৩] কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও।[১৩৪] তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।*

১২৪. এর অর্থ হচ্ছে, মুশরিকরা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশতা বা নবী। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেবার মাধ্যম। এর বেশী তাদের অন্য কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহ তাদেরকে শুধুমাত্র এ কাজের জন্যই বাছাই করে নিয়েছেন। নিছক এতটুকুন মর্যাদা তাদেরকে প্রভু বা প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরীকে পরিণত করে না।

১২৫. কুরআন মাজীদে এ বাক্যটি সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থানে একে পেছনের বাক্যের পরে বলার এ অর্থ দাঁড়ায়

www.banglabookpdf.blogspot.com



যে, ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে অভাবপূরণকারী ও কার্য উদ্ধারকারী মনে না করেও যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করেও তোমরা পূজা-অর্চনা করো তাহলে তাও ঠিক নয়। কারণ একমাত্র আল্লাহই সবকিছু দেখেন ও শোনেন। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য ও গোপন কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়াবলী একমাত্র তিনিই জানেন। ফেরেশতা ও নবীসহ কোনো সৃষ্টিও ঠিকভাবে জানেনা কোন্ সময় কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে, সে তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সুপারিশ করে বসবে এবং তার সুপারিশ গৃহিত হয়ে যাবে।

১২৬. অর্থাৎ বিষয়াবলীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণরূপে তাঁর ক্ষমতাধীন। বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক অন্য কেউ নয়। কাজেই নিজের আবেদন নিবেদন নিয়ে অন্য কারো কাছে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেকটি বিষয় ফায়সালার জন্য আল্লাহর সামনেই উপস্থাপিত হয়। কাজেই কোনো কিছুর জন্য আবেদন করতে হলে তাঁর কাছেই করো। যেসব সত্তা নিজেদেরই অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না তাদের মতো ক্ষমতাহীনদের কাছে কি চাও ?

১২৭. অর্থাৎ এ নীতি অবলম্বন করলে সফলতার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করবে তার নিজের কার্যক্রমের ব্যাপারে এমন অহংকার থাকা উচিত নয় যে, সে যখন এত বেশী ইবাদাতগুজার ও নেক্কার তখন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। বরং তার আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়া এবং তাঁরই রহমতের সাথে সমস্ত আশা আকাংখা বিজড়িত করা উচিত। তিনি সফলতা দান করলেই কোনো ব্যক্তি সফলতা পেতে পারে। নিজে নিজেই সফলতা লাভ করার সামর্থ কারো নেই।

"হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে"—এ বাক্যটি বলার অর্থ এ নয় যে, এ ধরনের সফলতা লাভ করার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনা পদ্ধতি। বাদশাহ যদি তাঁর কোনো কর্মচারীকে বলেন, অমুক কাজটি করো, হয়তো তুমি অমুক পদটি পেয়ে যাবে, তখন কর্মচারীর গৃহে খুশীর বাদ্য বাজতে থাকে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে আসলে একটি প্রতিশ্রুতির ইংগিত। কোনো সদাশয় প্রভুর কাছ থেকে কখনো এটি আশা করা যেতে পারে না যে, কোনো কাজের পুরস্কার স্বরূপ কাউকে তিনি নিজেই কিছু দান করার আশা দেবেন এবং তারপর নিজের বিশ্বস্ত সেবককে হতাশ করবেন।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ—এর মতে সূরা হজ্জের এ আয়াতটিও সিজদার আয়াত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখ্ঈ ও সুফিয়ান সওরী এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদার প্রবক্তা নন। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ আমি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

প্রথম দলটির প্রথম যুক্তিটির ভিত্তি হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। যাতে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে উকবাহ ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

www.banglabookpdf.blogspot.com



قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ عَلٰى سَائِرِ الْقُرْاٰنِ بِسَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সূরা হজ্জ কি সমগ্র কুরআনের ওপর এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যে, তার মধ্যে দু'টি সিজদা আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; কাজেই যে সেখানে সিজদা করবে না সে যেন তা না পড়ে।"

তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজার হাদীস, যাতে আমর ইবনুল আস (রা) বলছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সূরা হজ্জের দু'টি সিজদা শিখিয়েছিলেন। চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে, হযরত উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবুদ দারদা (রা), আবু মূসা আশআরী (রা) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা আছে।

দ্বিতীয় দলের যুক্তি হচ্ছে আয়াতে নিছক সিজদার হুকুম নেই বরং একসাথে রুকূ' ও সিজদা করার হুকুম আছে আর কুরআনে যখনই রুকূ' ও সিজদা মিলিয়ে বলা হয়, তখনই এর অর্থ হয় নামায। তাছাড়া রুকূ' ও সিজদার সম্মিলিত রূপ একমাত্র নামাযের মধ্যেই পাওয়া যায়। উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত সম্পর্কে তারা বলেন, এর সনদ দুর্বল। একে ইবনে লাহীআহ বর্ণনা করেছেন আবুল মাস'আব বাসরী থেকে এবং এরা দু'জনই যঈফ তথা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। বিশেষ করে আবু মাস'আব তো এমন এক ব্যক্তি যিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকেও তাঁরা নির্ভরযোগ্য নয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ এটি সাঈদুল আতীক রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুনাইন আল কিলাবী থেকে। এরা দু'জনই অপরিচিত। কেউ জানে না এরা কারা এবং কোন্ পর্যায়ের লোক ছিল। সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে তারা বলেন, ইবনে আব্বাস সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা হবার এই পরিষ্কার অর্থ বলেছেন যে, الاولى عزمة والاخرة تعليم অর্থাৎ প্রথম সিজদা অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষামূলক।

১২৮. জিহাদ মানে নিছক রক্তপাত বা যুদ্ধ নয় বরং এ শব্দটি প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার জিহাদ ও মুজাহিদের মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, বাধা দেবার মতো কিছু শক্তি আছে যেগুলোর মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম কাম্য। এই সংগে "ফিল্লাহ" (আল্লাহর পথে) শব্দ এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয় যে, বাধাদানকারী শক্তিগুলো হচ্ছে এমনসব শক্তি যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য হয় তাদের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে মানুষ নিজেও আল্লাহর যথাযথ বন্দেগী করবে এবং দুনিয়াতেও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের কালেমাকে নিম্নগামী করার জন্য প্রাণপাত করবে। মানুষের নিজের "নফসে আম্মারা" তথা বৈষয়িক ভোগলিপ্সু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে এ মুজাহাদা ও প্রচেষ্টার প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ নফসে আম্মারা সবসময় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে

www.banglabookpdf.blogspot.com



থাকে এবং মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিজিত না করা পর্যন্ত বাইরে কোনো প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। তাই এক যুদ্ধ ফেরত গাজীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الاَكْبَرِ

"তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসে গেছো।"

আরো বলেন, مجاهدة العبد هواه "মানুষের নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।" এরপর সারা দুনিয়াই হচ্ছে জিহাদের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। সেখানে কর্মরত সকল প্রকার বিদ্রোহাত্মক, বিদ্রোহোদ্দীপক ও বিদ্রোহোৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে মন, মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি সহকারে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে জিহাদের হক আদায় করা, যার দাবী এখানে করা হচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ উপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (১৪৩ আয়াত) এবং সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (১১০ আয়াত) এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া সংগত মনে করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তরভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্য লোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাঁদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

১৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ফকীহ, ফরিশী ও পাদরীরা তাদের ওপর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নীতি-নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে চিন্তা-গবেষণার ওপর এমন কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তব কর্মজীবনেও এমন বিধি নিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একটি সহজ সরল বিশ্বাস ও আইন। এ নিয়ে তোমরা যতদূর এগিয়ে যেতে চাও এগিয়ে যেতে পারো। এখানে যে বিষয়বস্তুটিকে ইতিবাচক ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আবার অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচক ভংগীতে। যেমন—

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"এ রসূল তাদেরকে পরিচিত সৎকাজের হুকুম দেয় এবং এমন সব অসৎ কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন যেগুলো করতে মানবিক প্রকৃতি অস্বীকার করে আর এমন

www.banglabookpdf.blogspot.com



সব জিনিস তাদের জন্য হালাল করে যেগুলো পাক পবিত্র এবং এমন সব জিনিস হারাম করে যেগুলো নাপাক ও অপবিত্র। আর তাদের ওপর থেকে এমন ভারী বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং এমন সব শৃংখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যেগুলোয় তারা আটকে ছিল।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

১৩১. যদিও ইসলামকে ইবরাহীমের মিল্লাতের ন্যায় নূহের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত ও ঈসার মিল্লাত বলা যেতে পারে কিন্তু কুরআন মজীদে বার বার একে ইবরাহীমের মিল্লাত বলে তিনটি কারণে এর অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এক, কুরআনের বক্তব্যের প্রথম লক্ষ ছিল আরবরা, আর তারা ইবরাহীমের সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল তেমনটি আর কারো সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাসে যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দুই, হযরত ইবরাহীমই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান, আরবীয় মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবেয়ী তথা নক্ষত্র পূজারীরা সবাই একমত ছিল। নবীদের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং নেই যার ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারে। তিন, হযরত ইবরাহীম এসব মিল্লাতের জন্মের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও সাবেয়ীবাদ সম্পর্কে তো সবাই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করতো যে, তাদের সমাজে মূর্তিপূজা শুরু হয় আমর ইবনে লুহাই থেকে। সে ছিল বনী কুযা'আর সরদার। মা'আব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হুবুল' নামক মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল বড় জোর ঈসা আলাইহিস সালামের পাঁচ-ছ-শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহীমের শত শত বছর পরে তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলে এ মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করো তখন সে আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দেয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন এবং মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনটিরই অনুসারী না থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মিল্লাতেই প্রকৃত সত্য মিল্লাত। পরবর্তীকালের মিল্লাতগুলো সত্য নয়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ১৩৪-১৩৫, সূরা আলে ইমরান, ৫৮, ৭৯ এবং সূরা আন নহল, ১২০ টীকা।

১৩২. "তোমাদের সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় যেসব লোক ঈমান এনেছিল অথবা তারপর ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই যারা তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দলভুক্ত থেকেছে তাদের সবাইকেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ সত্য মিল্লাতের অনুসারীদেরকে কোনোদিন "নূহী" "ইবরাহিমী", 'মূসাভী" বা "মসীহী" ইত্যাদি বলা হয়নি বরং তাদের নাম "মুসলিম" (আল্লাহর ফরমানের অনুগত) ছিল এবং আজো তারা "মুহাম্মাদী" নয় বরং মুসলিম। একথাটি না বুঝার কারণে লোকদের জন্য এ প্রশ্নটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন্ কিতাবে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ?

www.banglabookpdf.blogspot.com



১৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১৪৪ টীকা। এর চাইতেও বিস্তারিত আকারে এ বিষয়টি আমার "সত্যের সাক্ষ" বইতে আলোচনা করেছি।

১৩৪. অথবা অন্য কথায় মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।

---

www.banglabookpdf.blogspot.com